প্রাগৈতিহাসিক মোহেন্-জো-দড়ো

শ্রীকুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, এম্. এ.
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার

দ্বিতীয় সংস্করণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৬১

মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

স্বর্গত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

প্রথম সংস্করণের

ভূমিকা

পাঞ্জাবের মণ্টগোমারী জেলার অন্তর্গত হরপ্পায় এবং সিন্ধু-প্রদেশের লার্কানা জেলায় মোহেন্-জো-দড়ো নামক স্থানে, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের খননের ফলে ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব-সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বতন ধারণা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্রাগ্‌বৈদিক যুগের সভ্যতার নিদর্শন—তাম্র ও প্রস্তর-নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র—ভারতের নানা স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু এই সকল বিক্ষিপ্ত সামগ্রী হইতে তত্তৎসভ্যতা-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর ছিল না; প্রাগ্‌বৈদিক যুগ আমাদের নিকট কুহেলিকার ন্যায় প্রতীয়মান হইত। মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পায় যে আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাতে এই কুহেলিকা অন্তর্হিত হইয়া ভারতের একটী প্রাচীনতম ও গৌরবময় সভ্যতার স্বরূপ উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এই আবিষ্কার বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাসে একটী স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া উল্লিখিত হইবার যোগ্য।

অধুনা 'সিন্ধু-সভ্যতা' এই আখ্যায় মোহেন্-জো-দড়ো-হরপ্পার সভ্যতা বর্ণিত হইতেছে। ইহার বিভিন্ন নিদর্শন সিন্ধুপ্রদেশের ও পাঞ্জাব প্রদেশের অন্যান্য বহুস্থানে এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল আবিষ্কারের কাহিনী প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ-কর্ত্তৃক ইংরাজীভাষায় বিস্তারিত গ্রন্থাকারে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের পক্ষে এই সকল গ্রন্থ অনায়াস-লভ্য নহে। এই কারণে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় সিন্ধু-সভ্যতা-বিষয়ক পুস্তক রচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার ইতিহাস-সঙ্কলনে ও বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে অবহিত থাকিয়া এতাবৎ-

কাল দেশের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া আসিতেছেন। স্বর্গগত প্রাতঃস্মরণীয় স্যর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সকল বিষয়ে আলোচনার ভিত্তিস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। অধুনা ভাইস্‌চ্যান্‌সেলর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পিতৃদেবের সেই পবিত্রব্রতে ব্রতী হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে নিত্য নব অলঙ্কারে সুশোভিত করিতেছেন। বাঙ্গালা দেশের পক্ষে এবং বাঙ্গালী জাতির পক্ষে ইহা কম আশা ও গৌরবের কথা নহে। তাঁহারই উপদেশানুসারে শ্রীযুক্ত কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, এম্. এ. প্রাগৈতিহাসিক মোহেন্-জো-দড়ো সম্বন্ধে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় যে জনশিক্ষার পথ ক্রমশঃ সুগম করিয়া দিতেছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম
কলিকাতা
২৮এ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬

শ্রীননীগোপাল মজুমদার

বিজ্ঞপ্তি

"প্রাগৈতিহাসিক মোহেন্-জো-দড়ো"র প্রথম সংস্করণ বহুদিন পূর্ব্বেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। যুদ্ধোত্তর কালে নানা প্রকার অসুবিধাজনক পরিস্থিতির জন্য দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইয়া গেল।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সিন্ধুনদের তীরে মোহেন্-জো-দড়ো নামক স্থানে তাম্র-প্রস্তর যুগের এক অতীব উন্নত সভ্যতার বিবিধ প্রমাণ আবিষ্কার করেন। সিন্ধুতীরে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া পণ্ডিতেরা ইহাকে "সিন্ধু সভ্যতা" আখ্যা দিয়া থাকেন। এই সভ্যতার পরিধি চতুর্দ্দিকে যে কল্পনাতীতভাবে বিস্তৃত ছিল তাহার প্রমাণ দিনদিনই দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এখন পর্য্যন্ত যে তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণেও সিন্ধু সভ্যতা বিস্তৃত ছিল। কিমনদীর তীরে ভগতরাব্ (Bhagatrav) নামক স্থানেও সিন্ধু সভ্যতার একটি কেন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। উত্তর পূর্ব্বে উত্তর প্রদেশস্থিত মিরাট জেলার আলমগীরপুর পর্য্যন্ত এই সভ্যতার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অধুনাতম আবিষ্কার ও গবেষণার ফল যথাসম্ভব এই সংস্করণে সন্নিবেশিত করা হইল। তবে অধিকতর গবেষণার ফলে সিন্ধু সভ্যতার গণ্ডি আরও সুদূরপ্রসারী ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইবে, আশা করা যায়। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, পারস্যোপসাগরে অবস্থিত বহ্‌রাইন্ (Bahrein) দ্বীপে আবিষ্কৃত পাঁচ হাজার বৎসরের পুরাতন এক সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধু-সভ্যতার যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে।

মোহেন্-জো-দড়ো হরপ্পা তথা সিন্ধুসভ্যতার কোন বিবরণ জনশ্রুতি কিংবা প্রাচীন সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এইরূপ একটি উন্নত সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত স্থানসমূহে যে লিপি আবিষ্কৃত

হইয়াছে ইহা এখনও ছুর্ব্বোধ্য। এই লিপির সম্যক্ পাঠোদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সকল স্থানের প্রকৃত ইতিহাস অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে। তবে তত্রত্য অধিবাসীদের উন্নত প্রণালীর গৃহাদি ও তাহাদের পরিত্যক্ত সুরুচি সম্পন্ন দ্রব্যসমূহ ঐ যুগের রহস্য অনেকাংশে উদ্‌ঘাটিত করিতেছে।

মোহেন্-জো-দড়ো, হরপ্পা, রূপার ও লোথাল প্রভৃতি স্থানের সভ্যতা তাম্র-প্রস্তর যুগের। এই সভ্যতায় লৌহের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। ঋগ্‌বেদেও লৌহের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত "অয়স্" শব্দ ঐ যুগে তাম্র ও ব্রোঞ্জ অর্থে ব্যবহৃত হইত বলিয়া অনেকে মনে করেন। কারণ, লৌহের প্রচলনের পর অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থে লৌহ অর্থে কৃষ্ণায়স্ বা কার্ষ্ণায়স্ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। সেইজন্য ঋগ্বেদকে আমরা তাম্র-প্রস্তর যুগের গ্রন্থ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। বৈদিক সভ্যতা সিন্ধু-সভ্যতা অপেক্ষা পরবর্ত্তীকালের এবং পৃথক্ জাতি কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইলেও এই উভয় সভ্যতাই তাম্র-প্রস্তর যুগে উপজাত হইয়াছিল। সেইজন্য স্থানে স্থানে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম গ্রন্থে বর্ণিত সভ্যতার নিদর্শনের সঙ্গে সিন্ধু-উপত্যকায় লব্ধ উপাদানের তুলনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। এই উভয়ের সাদৃশ্য ও পার্থক্য দ্বারা বিষয়বস্তুর উপলব্ধির সহায়তা হইতে পারিবে বলিয়া আশা করি।

ভারত-সরকারের বৃত্তি লাভ করিয়া হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োতে সাক্ষাৎভাবে কাজ করিবার সুযোগ এই পুস্তক প্রণয়নে উদ্যোগী হইতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। তাহা ছাড়া, স্বর্গত স্যর্ জন্ মার্শাল্, ননীগোপাল মজুমদার, ডাঃ ম্যাকে, এম্, এস্, বৎস এবং স্যর্ মর্টিমের্ হুইলার, অধ্যাপক পিগোট্ ও শ্রীঅমলানন্দ ঘোষ এবং অন্যান্য লেখকদের গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ হইতে এই পুস্তকের প্রচুর উপাদান আহরণ করা হইয়াছে। তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

যাঁহার প্রেরণায় "প্রাগৈতিহাসিক মোহেন্-জো-দড়ো" পুস্তক

প্রণয়নে প্রথমে ব্রতী হইয়াছিলাম সেই উদারহৃদয় মহাপুরুষ ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা সহকারে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। আর একজন প্রত্নজগতের কৃতী কর্ম্মী স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার, যিনি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা করিতে গিয়া ভারত-বেলুচিস্তান সীমান্তে দস্যুর হাতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। "প্রাগৈতিহাসিক মোহেন্-জো-দড়ো" পুস্তকের প্রথম সংস্করণের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া তিনি আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছিলেন। আজ তাঁহাকেও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি।

এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ এই সময়ে প্রকাশিত হইতে পারিল শুধু অধ্যাপক ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের সাহায্য ও সহানুভূতির ফলে। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা গ্রন্থ প্রকাশ-সমিতির পক্ষ হইতে ইহা প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ায় তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। পুস্তকের প্রেস কপি প্রস্তুত করার কাজে আমার আত্মীয় শ্রীদুর্গানাথ ভট্টাচার্য্য বি. এ. ও কন্যা শ্রীমতী সায়ন্তনী গঙ্গোপাধ্যায় এম্. এ. এর নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছি। বিবিধ উন্নতি বিধায়ক উপদেশ দান ও একটি প্রুফ সংশোধনের জন্য অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এম. এ. মহাশয়ের নিকটও আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। পুস্তকে প্রকাশিত চিত্রগুলি ভারতের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে প্রকাশিত বিভিন্ন বিবরণীগ্রন্থ ও স্যর্ মর্টিমের হুইলার প্রকাশিত "The Indus Civilization" গ্রন্থ হইতে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১

শ্রীকুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী

প্রমাণ-পঞ্জী

Annual Reports of the Archæological Survey of India.

Chatterji, Dr. S. K., "Dravidian Origins and the Beginnings of Indian Civilization," The Modern Review for December, 1924.

Chaudhury, N. C., "Mohenjodaro and the Civilization of ancient India with references to agriculture."

Childe, V. G., "The Bronze Age." 1930.

Childe, V. G., "Notes on Some Indian and East Iranian Pottery." Ancient Egypt and the East, Parts I and II. 1933.

Childe, V, G., "New Light on the Most Ancient East." 1934.

Dikshit, K. N., Prehistoric Civilization of the Indus Valley.

Frankfort, H., "The Indus Civilization and the Near East," Annual Bibliography of Indian Archæology, 1932.

Frankfort, H , "Tell Asmar, Khafaje and Khorsabad," Oriental Institute Communications, Chicago, No. 16. 1933.

Gadd, C. J., "Seals of Ancient Indian Style found at Ur," Proceedings of the British Academy, Vol. XVIII, 1933.

Ghosh, A, Bulletion of the National Institute of Sciençes in India Vol. I.

Hargreaves, H., "Excavations in Baluchistan," Memoir No. 35 of the Archæological Survey of India, 1929.

Hrozny Bedrich, Ancient History of Western Asia, India and Crete.

Hunter, G. R., "The Script of Harappa and Mohenjodaro," 1934.

Illustrated London News, May 20th and 27th, June 3rd, 1950, January 4th and 11th, 1958.

Indian Archæology—A. Review.

Law, N. N., "Mohenjodaro and the Indus Valley Civilization." The Indian Historical Quarterly, Vol. VIII, No. 1. 1932.

Mackay, E., "The Indus Civilization," 1935.

Mackay, E. "Further Excavations at Mohenjodaro," Vol I, II, 1938. (F. E. M.)

Majumdar, N. G., "Explorations in Sind," Memoir No. 48 of the Archæological Survey of India, 1934.

Marshall, Sir J., "Mohenjodaro and the Indus Civilization." (M. I C.) Vols I-III, 1931.

Meriggi, von P., "Zur Indus Schrift," Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft (Z. D. M G.), 1934.

Piccoli, Dr. Giuseppe, A comparison between signs of the Indus script and signs in the Corpus Ins. Etruscanum ; Ind. Ant. 1933.

Piggott, Stuart, Prehistoric India, 1950.

Ross Alan S. C., "The Numeral signs of the Mohenjo-daro script." Memoir No. 57 of the Arch. Sur. of India.

Stein, Sir A., "An Archæological Tour in Waziristan and Northern Baluchistan," Memoir No. 37 of the Archæological Survey of India, 1929.

Stein, Sir A., "An Archæological Tour in Gedrosia," Memoir No. 43 of the Archæological Survey of India, 1931.

Wheeler, Sir Mortimer, The Indus Civlization, 1953.

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

প্রাগৈতিহাসিক মোহেন্-জো-দড়ো

প্রথম পরিচ্ছেদ

অবতরণিকা

অতীতের গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া ভারতের পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার বিশাল সভ্যতার আলোকরশ্মি যে স্থানের ধ্বংসস্তূপ হইতে বিকীর্ণ হইতেছে, সেই মোহেন্-জো-দড়োর[১] নাম আজকাল না জানেন এরূপ শিক্ষিত ভারতবাসী খুব কমই আছেন। বিভক্ত ভারতের অধুনা গঠিত পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্গত সিন্ধুদেশের লারকানা জেলা ঐ বিভাগের অন্যান্য জেলা অপেক্ষা অধিকতর উর্ব্বর। ধান্য এস্থানের অন্যতম প্রধান শস্য। রেলগাড়ীতে যাওয়ার সময় রাস্তার দুই পার্শ্বে হেমন্তের মনোরম পীতবর্ণ ধান্যক্ষেত্র পথিকের মনে অলক্ষিতে বাংলাদেশের কথা জাগাইয়া দেয়। মরুভূমিতে মরূদ্যানের মত লারকানাকেও "সিন্ধুদ্যান" বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই জেলারই একখণ্ড ঊষর ভূমিতে মোহেন্-জো-দড়ো নগর অবস্থিত। এক দিকে সিন্ধুনদের বিশাল বক্ষ এবং অন্যদিকে পশ্চিম নারখাত, এই উভয়ের মধ্যে প্রায় ২৪০ একর ভূমি ব্যাপিয়া এক দ্বীপতুল্য ভূখণ্ডে মস্তক উন্নত করিয়া মোহেন্-জো-দড়োর অসংখ্য ধ্বংসস্তূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই বিশাল বিধ্বস্ত নগরীতে ২০ ফুট হইতে আরম্ভ করিয়া ৭০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ স্তূপ আছে। এই লুপ্ত নগরীর পরিধি প্রায় ৩ মাইল।

ইহা নর্থ্ওয়েষ্টার্ণ্ রেলওয়ে লাইনের ডোক্রী ষ্টেশন হইতে প্রায়

১ সিন্ধি ভাষায় 'মোহেন্-জো-দড়ো' শব্দের অর্থ "মৃতের স্তূপ" (Mound of the Dead)।

৭ মাইল এবং লারকানা সহর হইতে প্রায় ২৫ মাইল দূরে (২৭°১৯ উঃ, ৬৮°৮´ পূঃ) অবস্থিত। এই স্থানের আবহাওয়া অত্যন্ত রুক্ষ। আজকাল বৎসরে মোটামুটি ৬ ইঞ্চির বেশী বারিপাত হয় না। শীতকালে রাত্রে অত্যধিক ঠাণ্ডায় মাঝে মাঝে জল জমাট বাঁধিয়া যায় এবং গাছপালা শাকসব্জি মরিয়া যায় ; আবার গ্রীষ্মকালে অসহ্য গরমে (প্রায় ১২০°) মশামাছির উপদ্রবে জীবনধারণ ক্লেশকর হইয়া উঠে।

পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে মোহেন্-জো-দড়ো জগতের এক প্রাচীনতম সভ্যতার গৌরব-মুকুট মাথায় পরিয়া ভারতের পণ্যদ্রব্য দেশ-বিদেশে রপ্তানি করিত, ভারতের ধ্যান-ধারণা ও শিল্প-বাণিজ্যের বাণী জগতে প্রচার করিত—সভ্য জগতের ঈর্ষার নগরী—সেই মোহেন্-জো দড়ো আজ প্রকৃতির অভিশাপগ্রস্ত মরুভূমিতুল্য।

বর্ত্তমান মোহেন্-জো-দড়ো নৈসর্গিক সকল বিষয়ে পুর্ব্ববৎ আছে কি না, ঠিক করিয়া বলা যায় না। হয়ত প্রাচীন কালে এ স্থানের জলবায়ু অন্যরূপ ছিল ; কারণ, যদিও মোহেন্-জো-দড়োর মিস্ত্রীরা কাঁচা ইট এবং পোড়া ইট এই উভয়েরই ব্যবহার জানিত তথাপি বাসগৃহের জন্য পোড়া ইটেরই ব্যবহার বহুল পরিমাণে দেখা যায়। শুধু ভিত্তিস্থাপন এবং শূন্য স্থান পূরণের জন্যই সাধারণতঃ কাঁচা ইটের ব্যবহার হইত। ইহা হইতে মনে হয় যে তৎকালে অধিকমাত্রায় বারিপাত হইত। এই অনুমানের পক্ষে আরও যুক্তি আছে। এখানে অসংখ্য সারি সারি পয়ঃপ্রণালী (drain) খননযন্ত্রের আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিয়া দিতেছে যে ইহারা তৎকালের মোহেন্-জো-দড়োর বর্ষার জলনিকাশের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। এ স্থানে প্রাপ্ত মাটীর খেলনা এবং শীলমোহরে ক্ষোদিত বাঘ, হাতী ও গণ্ডার প্রভৃতি আর্দ্রভূমিবাসী জীবজন্তু হইতেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে এখানে বৃষ্টিপাতের মাত্রা নিতান্ত কম ছিল না।

মোহেন্-জো-দড়োতে লব্ধ উপাদানের সাহায্যে সেখানে

প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে প্রচুর পরিমাণে বারিপাত হইত এবং সে স্থানের আবহাওয়া যে আর্দ্র ছিল, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। কেহ কেহ মনে করেন সিন্ধুদেশে পুরাকালে দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে মৌসুমী বায়ু (Monsoon) প্রবাহিত হইয়া প্রচুর বারিপাতের সূচনা করিত। অধুনা ঐ বায়ুর গতি-পরিবর্ত্তন হেতু সিন্ধুদেশ বর্ষাঋতুর বহির্ভূত হইয়াছে এবং তজ্জন্য সেখানে রুক্ষ আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। মুলতান প্রভৃতি স্থানে যে পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বেও যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হইত, তাহার উল্লেখ মুসলমান ঐতিহাসিকদের পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং মনে হয় মোহেন্-জো-দড়োতে তাম্র-প্রস্তর যুগে (Chalcolithic age) মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হইয়া তত্রত্য বারিপাত নিয়ন্ত্রিত করিত, এই যুক্তি নিতান্ত অমূলক নহে।

মেসোপটেমিয়াতে মোহেন্-জো-দড়োর সমসাময়িক যুগে মানুষের বাসোপযোগী কাঁচা ইটের গৃহ তৈরী হইত। সেখানে তাম্রপ্রস্তর যুগের তুলনায় বর্ত্তমান যুগের আবহাওয়া ও বারিপাতের বিশেষ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ঐ দেশে আবিষ্কৃত কাঁচা ইটের বহু গৃহ এবং অন্যান্য প্রমাণ হইতে উল্লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। মোহেন্-জো-দড়োর বিষয়েও কেহ কেহ বলিতে চাহেন যে একই আবহাওয়া সেখানেও চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। ব্যষ্টিগত প্রমাণের অবতারণা করিয়া এই যুক্তি হয়ত তাঁহারা সমর্থন করিতে পারেন; কিন্তু সমষ্টিগত উপাদান গ্রহণ করিলে অতি পুরাকালে সিন্ধুতীরে যে অধিক মাত্রায় বারিপাত হইত সেই বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

বেলুচিস্তানের ভারত-সীমান্তবর্ত্তী জেলাগুলিতেও ঐ যুগ হইতে জলবায়ুর যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে তাহাও সিন্ধুপ্রদেশের পক্ষে প্রযোজ্য হইতে পারে। বেলুচিস্তানের জনহীন ঊষর ভূমির স্থানে স্থানে স্যর্ অরেল্ ষ্টাইন্ (Sir Aurel Stein) প্রাগৈতিহাসিক যুগের সমৃদ্ধিশালী বসতির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইয়াছেন। এসব স্থানের

কোথাও কোথাও সারা বৎসরের উপযোগী জল জমা রাখিবার জন্য বাঁধ (স্থানীয় ভাষায় ঐগুলিকে "গবর্ বাঁধ" বলে) দেখিতে পাওয়া যায়। যদি সমস্ত বৎসর ব্যাপিয়া উপযুক্ত পরিমাণে বারিপাত হইত তাহা হইলে ঐসব বাঁধের কোনই আবশ্যকতা থাকিত না। তৃতীয়তঃ বেলুচিস্তানের এই উষরভাব তাম্রপ্রস্তর যুগের পরে এবং খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর অর্থাৎ গ্রাক্‌বীর আলেক্সান্দরের আক্রমণের পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়া থাকিবে ; কারণ আলেক্সান্দরের ইতিহাস লেখকেরা বলেন যে গেড্রোসিয়া (Gedrosia) বা বেলুচিস্তান তখন মরুভূমির মত এবং সৈন্যদের পক্ষে অনতিক্রমণীয় ছিল। সে যাহা হউক, বেলুচিস্তান সম্বন্ধে এই বলা যাইতে পারে যে সেখানে তাম্রপ্রস্তর যুগে (Chalcolithic age) বৎসরে ১৫-২০ ইঞ্চি বারিপাত হইত এবং সিন্ধুদেশের পক্ষেও এইরূপ বৃষ্টিপাত ধরিয়া লইলে মোহেন্-জো-দড়ো হইতে সংগৃহীত প্রমাণের সঙ্গে সুন্দর সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। কিন্তু এই উভয় স্থানে একই নৈসর্গিক অবস্থা বিদ্যমান ছিল কি না এবং পরবর্ত্তী কালে উভয়ের এই শুষ্ক আবহাওয়া একই কারণজাত কি না, এই প্রশ্নের কোন সুসমাধান এখনও হয় নাই।

কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে এক সময়ে সাহারা ও মিসর প্রভৃতি স্থানে প্রচুর বারিপাত হইত এবং আরবদেশ, মেসোপটেমিয়া, পারস্য, বেলুচিস্তান ও সিন্ধুদেশে সমস্ত বৎসর ব্যাপিয়া ন্যূনাধিক বৃষ্টিপাত হইত ; কিন্তু ঝড়বৃষ্টির গতি-পরিবর্ত্তন হওয়াতে এইসব দেশ এখন প্রায় মরুভূমির মত হইয়া পড়িয়াছে। এই মতটি যদিও চিত্তাকর্ষক, তথাপি সিন্ধুদেশের পক্ষে হয়ত এই যুক্তি ঠিক খাটিবে না, কারণ সিন্ধুদেশ এই বেষ্টনীর অন্তর্গত ছিল না বলিয়াও অনেকে মনে করেন।

মোহেন্-জো-দড়োর মাটী এত লোনা এবং জলবায়ু এত নীরস যে স্তূপগুলির ভিতরে ক্ষয় হইয়া বড় বড় গর্ত্ত দেখা দিয়াছে, এবং মাঝে মাঝে খালের মত হইয়া সমগ্র স্থানটিকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। একটি ঢালু জায়গা সরলভাবে পূর্ব্ব-পশ্চিমে ঐ স্থানের

ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহার উভয় পার্শ্বে রাশি রাশি ধ্বংসস্তূপ; ইহা প্রাচীনকালে সহর-বাসীর একটা সদর রাস্তা ছিল বলিয়া খননের পর আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ রাজপথকে ছেদ করিয়া উত্তর-দক্ষিণে আর একটি বড় রাস্তা বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে; ইহা এতদিন ধ্বংসস্তূপের অন্তরালেই ছিল। আর্কিওলজিকেল বিভাগের তদানীন্তন ডিরেক্টর-জেনারেল্ স্যর্ জন্ মার্শাল্ এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীদের খননের ফলে এই রাস্তা বহুদূর পর্য্যন্ত পরিষ্কৃত হইয়াছে এবং ইহার উভয় পার্শ্বে অসংখ্য বিপণি, পয়ঃপ্রণালী, জল-কূপ এবং আবর্জ্জনা-কূপ দেখা দিয়াছে। ছোট বড় আরও অনেক রাস্তাও এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই সকল রাস্তার প্রায় সবই পূর্ব্ব-পশ্চিমে কিংবা উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। এখানে একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে রাজপথগুলি পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ এবং সরু রাস্তা বা গলি হইতে অপেক্ষাকৃত নীচু; ইহার কারণ এই যে বন্যার জলে সমস্ত সহর প্লাবিত হইয়া গেলে পর পুনরায় গৃহ নির্ম্মাণের সময় আবার যাহাতে বন্যায় ভাসাইয়া না লইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে ঐ স্থানটা উঁচু করিয়া নির্ম্মাণ-কার্য্য করা হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে চলাচলের সুবিধার জন্য সম্মুখবর্ত্তী ছোট রাস্তাও উঁচু করিতে হইত; কিন্তু সদর রাস্তার প্রতি কেহই মনোযোগ দিত না, সেজন্য ইহার উচ্চতা আর বাড়ে নাই। ঐ ছোট গলিরাস্তাগুলির উপরে আবার ড্রেন তৈরী করা হইত এবং পুনঃপুনঃ বাস্তুভিটার উচ্চতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তৎসংলগ্ন ড্রেনগুলিও উঁচু করিতে হইত; এবং ঐগুলিকে সদর রাস্তার প্রধান ড্রেনের সঙ্গে উপর দিক্ হইতে খাড়াভাবে অপর একটি ড্রেনের দ্বারা মিলাইয়া দিতে হইত।

প্রাচীন মোহেন্-জো-দড়ো নগর বর্ত্তমান স্তূপাচ্ছাদিত স্থান অপেক্ষা বহু বিস্তীর্ণ ছিল। স্তূপের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ প্রাচীন সহরের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বন্যা ও কালের কঠোর প্রকোপে ইহার বাহিরের চিহ্ন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বহুদূর (প্রায় অর্দ্ধমাইল) পর্য্যন্ত

স্থানে স্থানে শুধু মৃৎপাত্রের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত খণ্ড দেখিয়া মনে হয় পুরাতন সহর ততদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। নগরের বহিঃস্থিত প্রাচীরও সময়ের আবর্ত্তনে খুব সম্ভব পড়িয়া গিয়া ধ্বংসস্তূপে মিশিয়া গিয়াছে। ইহার কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত এখন আর নাই। ডাঃ ম্যাকে অনুমান করেন, এই নগরের চতুর্দ্দিকে কোন প্রাচীর ছিল না। কিন্তু স্যর্ জন্ মার্শাল এই অনুমানের মূলে কোন সত্য আছে বলিয়া মনে করেন না। তিনি অনুমান করিয়াছিলেন, এই নগরের সমৃদ্ধির সময় আদি ও মধ্য যুগেই ছিল। সেই সময় যে সকল দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল ঐগুলি হয়ত এখনও কোন কোন স্থানে ভূগর্ভের ২৫।৩০ ফুট নীচে নিহিত আছে। প্রকৃতপক্ষে হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়ো এই উভয় স্থানেই নগর রক্ষার দুর্গ সহরের পশ্চিম সীমান্তে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া কিছুকাল পূর্ব্বে ডাঃ হুইলারের খননে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।[১] উপরের অর্থাৎ পরবর্ত্তী কালের তিন স্তরে প্রাপ্ত দ্রব্য-সামগ্রী ও ইমারত প্রভৃতিতে সিন্ধু-সভ্যতার অতীব শোচনীয় চিত্র পাওয়া যায়। নিম্নস্তরে আদি ও মধ্য যুগের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুরাবস্তু (antiquities) ও গৃহাদি দেখিতে পাওয়া যায়। উপরে শুধু সেই প্রাচীন সভ্যতার রক্তমাংস-বিবর্জ্জিত কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। এই তৃতীয় যুগে গৃহ-প্রাচীর এবং আসবাবপত্র ক্রমশঃ অবনতির দিকে গিয়াছে। আদি যুগের ইমারত-গুলি জলের বহু উপরে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এখন জল ভূপৃষ্ঠ হইতে ৩০।৩৫ ফুটের মধ্যে চলিয়া আসায় ঐগুলি খনন করা কষ্টসাধ্য। সেইজন্য মাত্র সাতটি নগরের বিষয় আজ পর্য্যন্ত জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। তৃতীয় যুগের তিনটি, দ্বিতীয় বা মধ্য যুগের তিনটি এবং আদি যুগের একটি। প্রথম যুগের দুইটি নগর জলগর্ভে নিহিত রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

১ হুইলার—"The Indus Civilisation" (1953) p. 16, Plan—page 17

গ্রীষ্মকালে জল ভূপৃষ্ঠ হইতে ২৫।৩০ ফুটের মধ্যে থাকে, এবং বর্ষাকালে ১০।১৫ ফুটের মধ্যে আসিয়া পড়ে; অর্থাৎ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে জল যে স্থানে ছিল এখন সে স্থান হইতে প্রায় ১০।১৫ ফুট উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী কালের নাগরিকদের কারু-কার্য্যের মধ্যে এই পার্থক্য লক্ষিত হয় যে পুরাতন আসবাবপত্র, খেলনা, গহনা, মৃৎপাত্র, ইমারত ও মৃন্মূর্ত্তি প্রভৃতি পরবর্ত্তী কালের অপেক্ষা অতিশয় মনোরম। কিন্তু মৃৎপাত্র-রঞ্জন বিষয়ে পরবর্ত্তী কালের লোকেরা সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ বহু রঙ্‌বিশিষ্ট মৃৎপাত্র এই তৃতীয় যুগেই দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মোহেন্-জো-দড়োর আবিষ্কার ও খনন

যে সব আবিষ্কার সৃষ্টির আদি হইতে মহামানবের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমবর্দ্ধমান ভাণ্ডারে এক একটি ধ্রুবতারার মত এক একটি দিক্ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, দেশ-কাল-পাত্রের কোন অপেক্ষা রাখে না ; সর্ব্বদা স্বচ্ছ অনাবিল ও নূতন ; কালের কলুষ হস্ত যাহাতে কদাপি স্পর্শ করিয়া ওলট্-পালট্ করিয়া দিতে পারে না ; যাহা যাতুকরের মায়াময়-যষ্টি-স্পর্শের মত বহু দিনের সুপ্ত মানবজাতিকে জাগ্রত করিয়া নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করিতে এবং তাহাদের দৃষ্টির গণ্ডী প্রসারিত করিয়া দিতে পারে, সেই সব আবিষ্কার প্রতিদিন হয় না। শতাব্দীর মধ্যে তুই একটি হয় কি না সন্দেহ। এইজাতীয় চিরস্মরণীয় ঘটনা সহস্র সহস্র বৎসর পরেও মিসরের পিরামিডের মত মস্তক উন্নত করিয়া স্রষ্টার অজেয় অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করে। যিনি এরূপ ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকেন তিনি দৈবপ্রেরিত, এবং নিজেও জানেন না কি করিতে তিনি আসিয়াছেন। জগতে যত স্মরণীয় আবিষ্কার হইয়াছে, ইহাদের শতকরা নিরানব্বইটিই ভারত-প্রত্যাশী কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের মত দৈবাৎ সংঘটিত হইয়াছে।

আলেক্সান্দরের ইতিহাস লেখক কর্ত্তৃক বর্ণিত কাহিনী পড়িয়া পশ্চিম-ভারতের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের তদানীন্তন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মনে প্রশ্ন জাগে, শতদ্রু নদীর কোন্ স্থান হইতে সেই বিশ্ববিজয়ী গ্রীক্‌বীর পাটলিপুত্রের অজেয় সেনাবাহিনীর শৌর্য্যবীর্য্যের বার্ত্তা শুনিয়া সসৈন্য প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং নিজের বিজয়বার্ত্তা কোন্ কোন্ স্থানে গ্রীক ও ভারতীয় ভাষাযুক্ত দ্বাদশটি শিলামঞ্চ উত্তোলন দ্বারা ঘোষণা করিয়া গিয়াছিলেন।

এই মঞ্চগুলি আবিষ্কার করার উদ্দেশ্যে ১৯১৭-১৮ হইতে ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত পাঁচটি শীতঋতুতে তিনি সিন্ধু ও শতদ্রুর শুষ্ক খাত স্থানে স্থানে পরীক্ষা-কল্পে দক্ষিণ-পাঞ্জাব, বিকানীর, বাহাওয়ালপুর, সিন্ধুদেশ প্রভৃতি স্থানে পর্য্যটন করেন। তিনি অধুনালুপ্ত হাক্রো নদীর (Hakro river) শুষ্ক ধারার অনুসরণ করিয়া বাহাওয়ালপুর রাজ্য হইয়া সিন্ধুদেশের সাক্কর জেলায় সিন্ধুনদের কাছে উপস্থিত হন। সিন্ধুর শুষ্ক ধারার পাশে পাশে তিনি বহু প্রাচীন বসতির চিহ্ন দেখিতে পান। অবশেষে তিনি সেখান হইতে লারকানা জেলায় উপস্থিত হন এবং প্রাচীন স্তূপের সন্ধানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া মোহেন্-জো-দড়োর বৌদ্ধস্তূপযুক্ত স্থানটি খননকার্য্যের জন্য মনোনীত করেন। কারণ ইতিপূর্ব্বে ১৯১৭ সালের শেষভাগে তিনি একদিন হরিণ-শিকারে গিয়া জঙ্গলের মধ্যে পথভ্রান্ত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ মোহেন্-জো-দড়োতে উপস্থিত হন; তখন সেখানে চক্‌মকি পাথরের একটি ছুরিকা দেখিয়া স্থানটি অতি প্রাচীন বলিয়া তাঁহার মোটামুটি বিশ্বাস জন্মিয়াছিল।

অতঃপর ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মোহেন্-জো-দড়ো নগরের খনন-কার্য্য আরম্ভ করিয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু নিদর্শন প্রাপ্ত হন। তাঁহার পূর্ব্বে বহু প্রত্নতাত্ত্বিক এই স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু উপরের বৌদ্ধস্তূপ এবং আধুনিক যুগের ইটের মত ইট দেখিয়া এই নগরের প্রাগৈতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা সন্দিহান হন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল বৌদ্ধস্তূপ ও চৈত্যবিহার উদ্ধার করা। এখানে যে এত প্রাচীনকালের কোন চিহ্ন পাওয়া যাইবে তাহা তিনি কল্পনাও করেন নাই। খননের ফলে অজ্ঞাত অক্ষরযুক্ত কয়েকটি নরম পাথরের শীলমোহর তাঁহার হস্তগত হয়। এইগুলি স্যর্ আলেক্‌জেণ্ডার্ কানিংহাম্ কর্ত্তৃক বহু বৎসর পূর্ব্বে পাঞ্জাবের অন্তর্গত হরপ্পা নগরে প্রাপ্ত শীলমোহরের মত। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দেই রায়বাহাদুর দয়ারাম সাহনীও হরপ্পায় খননকার্য্য আরম্ভ করিয়া আবার তাম্রপ্রস্তর যুগের

শীলমোহর ও বহু পুরাতন জিনিষ-পত্র প্রাপ্ত হন। এইগুলি রাখালবাবু কর্ত্তৃক প্রাপ্ত জিনিষের সঙ্গে অবিকল মিলিয়া যায়। কাজেই মোহেন্‌-জো-দড়োর সঙ্গে হরপ্পার সভ্যতা বিষয়ে সামঞ্জস্য সহজেই প্রমাণিত হইয়া যায়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্তূপের নিকটে এবং দূরে তিন চারি স্থানে একটু গভীর দেশ পর্য্যন্ত খনন করেন। কিন্তু গ্রীষ্মঋতুর আগমনের ফলে কাজ অধিক দূর অগ্রসর না হইতেই তাঁহাকে বিরত হইতে হয়। তিনি তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টির বলে ঠিক করেন যে যদিও বৌদ্ধস্তূপ ও বিহারের ইট এবং নীচের প্রাসাদের ইট একই মাপের, এবং স্তূপ ও বিহার হইতে উক্ত প্রাসাদ মাত্র ১।২ ফুট নীচে অবস্থিত, তথাপি ইহা অন্ততঃ ২।৩ হাজার বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী কালের হইবে। এরূপ স্বল্প প্রমাণের বলে এত বড় বিস্ময়কর কথা উচ্চারণ করা অসীম অভিজ্ঞতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচায়ক। পরবর্ত্তী কালে খননের এবং গবেষণার ফলে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমান স্থানে স্থানে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ১৯২৩-২৪ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ এম্‌. এস্‌. বৎস খননকার্য্য গ্রহণ করেন; এবং তিনিও তাম্রপ্রস্তর যুগের বহু দ্রব্য এবং সুন্দর বড় বড় ইমারত আবিষ্কার করেন। ঐ সকল গৃহে সঙ্গতিসম্পন্ন লোকের বসতি ছিল বলিয়া মনে হয়।

১৯২৪-২৫ সালে মিঃ কে. এন্‌. দীক্ষিত অপেক্ষাকৃত অধিক টাকা লইয়া খননকার্য্য আরম্ভ করেন; এবং A. B. C. D. E. নামক স্তূপে খাত খনন করেন। তিনিও বহু ইমারত আবিষ্কার করেন এবং ছোটখাটো অনেক সুন্দর জিনিষ প্রাপ্ত হন। এই বৎসর তিনি এক প্রস্থ (set) বহুমূল্য অলঙ্কারও (jewellery) প্রাপ্ত হন। ইতিপূর্ব্বে এরূপ মূল্যবান্‌ জিনিষ আর এই নগরে আবিষ্কৃত হয় নাই। এই সব পরীক্ষামূলক খাত দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে এই মোহেন্‌-জো-দড়ো নগর বাস্তবিকই তাম্রপ্রস্তর যুগের কোন একটি সমৃদ্ধিশালী জাতির বাসস্থান ছিল। ইহাতে আন্তর্জ্জাতিক পণ্ডিতমণ্ডলী এবং

ভারতীয় জনসাধারণ এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করেন যে তদানীন্তন বিভাগীয় ডিরেক্টার জেনারেল স্যর্ জন্ মার্শাল্ অল্প প্রয়াসেই ভারত গভর্নমেণ্টকে এই স্থানে খননের সার্থকতা বুঝাইয়া প্রচুর অর্থ মঞ্জুরের ব্যবস্থা করেন। তদনুসারে ভারত সরকার ১৯২৫-২৬ খ্রীষ্টাব্দে মোহেন্-জো-দড়োতে খননের জন্য তাঁহার হস্তে বহু অর্থ প্রদান করেন ; এবং তিনি উত্তর ও পশ্চিম-ভারতের আর্কিওলজিকেল্ বিভাগের সমস্ত কেন্দ্র হইতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগকে আহ্বান করিয়া বিশেষভাবে খননের ব্যবস্থা করেন। নির্জ্জন অরণ্যে পরিষ্কার রাস্তা, তাঁবু, নলকূপের ব্যবস্থা হইল এবং ক্রমে আফিস ঘর, বাংলো, যাদুঘর (museum), কর্ম্মিনিবাস, বাগান প্রভৃতি দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে দোকানপাট বসিয়া গেল। "প্রেত-পুরী" এখন শত শত কর্ম্মী ও শ্রমিকের দ্বারা সজীব ও মুখরিত হইরা উঠিল। ডোক্‌রী ও লার্‌কানায় যাহাতে সহজে যাতায়াত করা যাইতে পারে তজ্জন্য রাস্তা-নির্ম্মাণ ও অন্যান্য ব্যবস্থা করা হইল। এইবারের খনন যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই পরম ভাগ্যবান্ এবং একটা অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া থাকিবেন। এই খননের ফলে বহু ঘরবাড়ী, ড্রেন, পায়খানা, স্নানাগার (bathroom) কূয়া, রাস্তা ও অসংখ্য পুরাবস্তু (antiquities) আবিষ্কৃত হয়। মোহেন্-জো-দড়োর খনন-ব্যাপার এত বৃহৎ ও প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে যে ওয়েষ্টার্ণ্ সার্কেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পক্ষে তাঁহার অন্যান্য কর্ত্তব্যের উপর ইহার খননকার্য্য গুরুভারপূর্ণ হইয়া উঠে। সেজন্য মার্শাল্ মহাশয়ের চেষ্টায় ভারত গভর্নমেণ্ট শুধু ঐ খনন-ব্যাপারের জন্যই একজন বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে স্বীকৃত হন এবং প্রথমতঃ মিঃ (পরে ডাঃ) ই. ম্যাকে নামক বিশেষজ্ঞকে এসিষ্টাণ্ট্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ নিযুক্ত করা হয় ; পরে তাঁহাকে "স্পেসিয়াল অফিসার" বা বিশেষ কর্ম্মচারী আখ্যা দেওয়া হয়। প্রথমতঃ ১৯২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে রায়বাহাদুর দয়ারাম সাহনীর অধীনে কাজ করিতে দেওয়া হয়। উক্ত রায়বাহাদুর বিভাগীয় অন্যতম কর্ম্মচারী হার্‌গ্রিভস্

মহাশয় পূর্ব্ববৎসরে যে ভূখণ্ডে খনন করিয়াছিলেন তাহারই অসম্পূর্ণ কার্য্য আরম্ভ করেন ; এবং ম্যাকে মহাশয় স্তূপের নিকট 'L' নামক খণ্ডে খনন করেন। তাঁহারা উভয়েই প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার অনেক মূল্যবান্ দ্রব্য আবিষ্কার করেন এবং মিঃ সাহনী বহুমূল্য গহনাপত্র উদ্ধার করেন।

অতঃপর ম্যাকে-এর তত্ত্বাবধানে কয়েক বৎসর ধরিয়া মোহেন্-জো-দড়োর খননকার্য্য চলিতে থাকে। তাঁহার খনন ও আবিষ্কারের বিবরণ তৎকর্ত্তৃক লিখিত Further Excavations at Mohenjodaro (two volumes, New Delhi, 1937-38) নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে ভারত সরকারের আর্থিক অভাবের জন্য প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের কার্য্যকলাপ কয়েক বৎসর অত্যন্ত হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সেই সময় এখানে উল্লেখযোগ্য কোন খনন এবং আবিষ্কার হয় নাই। কিন্তু ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-বিভাগের ফলে মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পা পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। তারপর ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর জেনারেল ডাঃ মর্টিমের হুইলার অবসর গ্রহণ করতঃ পাকিস্তান সরকারের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের কার্য্যে যোগদান করিয়া ১৯৫০ সালে মোহেন্-জো-দড়োতে খননকার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহার খননের ফলে একটি রাজকীয় বিশাল শস্য-ভাণ্ডার (granary) এবং নগর-রক্ষার উপযোগী দুর্গ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে হরপ্পা নগরীতেও খননের পর অনুরূপ জিনিষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। একটি বিশিষ্ট শস্যাগার বহুদিন পূর্ব্বেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এবং নগর-রক্ষার দুর্গও ১৯৪৬ সালে হুইলারের খননের ফলে ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নগর ও নাগরিক জীবন

তাম্রপ্রস্তর যুগের প্রত্যেক বিশিষ্ট সভ্যতাই কোন-না-কোন সুবৃহৎ নদীর তীরে জাত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল। নীল নদের তীরে প্রাচীন মিশরের সভ্যতা, টাইগ্রীস্ (Tigris) ও ইউফ্রেটিস্ (Euphrates) তীরে মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা এবং সিন্ধুতীরে মোহেন্-জো-দড়োর অপ্রতিদ্বন্দ্বী সভ্যতা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এইজন্য এই যুগের সভ্যতাকে আমরা নদীমাতৃক সভ্যতা বলিয়াও আখ্যা দিতে পারি।

এই নদীমাতৃক সভ্যতার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে ভারতবর্ষে প্রাচ্য সভ্যতার আদি জননী মোহেন্-জো-দড়ো নগরী সিন্ধুতীরে ষোলকলায় পরিপূর্ণ হইয়া শোভা পাইতেছিল। এই নগরের পরিকল্পনা, স্থাপত্য ও পূর্ত্ত-রহস্য প্রভৃতি দেখিলেও চমৎকৃত হইতে হয়। কোন সুদক্ষ শিল্পী নাগরিক স্বাস্থ্য ও সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই নগরের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। সমস্ত নগরটি বড় বড় রাস্তা বা রাজপথ-দ্বারা বিভিন্ন পল্লীতে বিভক্ত। পল্লীগুলি আবার সুবৃহৎ ইমারতে, এবং ইমারতগুলি ছোট ছোট প্রকোষ্ঠে বিভক্ত থাকিত। পল্লী ও ইমারতের পরিকল্পনা সুন্দর চক-মিলান ভাবে হইত। ইমারতের পার্শ্বদেশ দিয়া গলি-রাস্তা যাইত। এক গলি হইতে অন্য গলি বা রাজপথে যাতায়াত করা যাইত; কোন কোন স্থানে কাণা গলি (blind lane)-ও ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজপথের উপরের ইমারতগুলির সম্মুখের নীচের তলায় দোকান থাকিত এবং বাড়ীর ভিতরের ঘরে গৃহস্থেরা বাস করিত। পার্শ্ববর্ত্তী গলি হইতে ঐ সকল ঘরে প্রবেশের পথ ছিল। কোন কোন ইমারতের সংলগ্ন প্রাঙ্গণও (quadrangle) দেখিতে পাওয়া যায়।

মোহেন্-জো-দড়োর ইমারতগুলিতে বিশেষ কোন কারুকার্য্য নাই। ঐগুলির ধ্বংসস্তূপ দেখিলে আধুনিক একটা সহরের কথাই প্রথমে মনে পড়ে। এখানে ব্যবহৃত ইটের মাপ অনেকাংশে বর্ত্তমান কালের ইটের মতই।[১] ইহা দেখিয়া এই নগরের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে একটা সন্দেহ হওয়া খুব স্বাভাবিক। এইরূপ ইট ইতিহাসের যুগে ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রাসাদে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় নাই। ইট, পাথর ও কাঠের উপর কারুকার্য্যের জন্য প্রাচীন ভারত বিখ্যাত ছিল। কিন্তু এখানে ইটে বা পাথরেও কারুকার্য্যের সেরূপ কোন চিহ্ন নাই। কারুকার্য্যপূর্ণ কাঠ হয়ত ছিল, কিন্তু থাকিলেও সেগুলির কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না, হয়ত পচিয়া মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে।

মিসর এবং মেসোপটেমিয়ার মত কাঁচা ইটের ব্যবহার এখানকার মিস্ত্রীরাও জানিত; কিন্তু এই ইট মোহেন্-জো-দড়োতে শুধু শূন্য-স্থান-পূরণ কিংবা ভিত্তি-নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যেই ব্যবহৃত হইত। ইহা কখনও বহির্দ্দেশে অর্থাৎ লোকের দৃষ্টিগোচর হওয়ার মত স্থানে ব্যবহৃত হইত না। কর্দ্দম ও খড়িমাটী (gypsum) প্রভৃতির সাহায্যে প্রাচীরে পোড়া ইটের গাঁথনি দেওয়া হইত। সময় সময় পয়ঃপ্রণালীর ভিতরের

১। মোহেন্-জো-দড়োতে সাধারণতঃ ১০½″ বা ১১″ × ৫½″ × ২¾″ মাপের ইট দেখিতে পাওয়া যায়। মিঃ কে. এন্. দীক্ষিত কাশ্যপ-সংহিতায় (শিল্পে) ১০½ বা ১১ × ৫½ × ২¾ অঙ্গুলি মাপের ইটের উল্লেখ আছে বলিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ১৮।৭।১৯৩৫ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকার ৩য় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এখানে স্থান ও কার্য্যবিশেষে কখনো কখনো কাঁচা ও পোড়া ইটের মাপ ১০¼″ × ৫″ × ২¼″ হইতে ২০⅓″ × ৮¼″ × ২¼″ পর্য্যন্ত দেখা যায়।

১০½″ × ৫¼″ × ২½″ মাপের ইট মানসার-শিল্পশাস্ত্রেও আছে। ১২ অঃ, ১৮৯-১৯২ পঙ্‌ক্তি।

দিকেও চুণ এবং খড়িমাটী-বিশেষের একত্র সমাবেশে ইটের গাঁথনি হইত।[১] কর্দ্দম ও খড়িমাটী দ্বারা দেয়ালের বহির্দ্দেশে অস্তর (plaster) দেওয়া হইত। ছোট ছোট ইটের বাড়ীর বাহিরের দেয়াল সোজাভাবে খাড়া থাকিত; কিন্তু বড়গুলির ভিতরের দিক্ সোজা এবং বাহিরের দিক্ একটু টেরচাভাবে তৈরী হইত। কোন কোন অট্টালিকা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায় বিশাল। অনবরত বন্যার ভয়েই বোধ হয় ঐগুলি এরূপ সুবৃহৎ ও চিরস্থায়ী করা হইত।

ভিত্তি—

জলের স্তরের নীচে পড়িয়া যাওয়ায় আদি যুগের ভিত্তির সন্ধান লাভ করা এখনও সম্ভব হয় নাই।

মধ্যযুগের (Intermediate period) প্রাসাদের ভিত্তি খুব সুন্দর। ইহা ভগ্ন প্রস্তরখণ্ডের পরিবর্ত্তে পোড়া মাটীর গুটিকার (nodules) উপর নির্ম্মিত হইত। নগররক্ষার প্রাচীরের উচ্চ ভিত্তি সাধারণতঃ পলিমাটী ও অসমান ইটের দ্বারা তৈরী হইত। তৃতীয় যুগের প্রাসাদের ভিত্তি পূর্ব্ববর্ত্তী কালের ধ্বংসস্তূপের উপরেই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। সেজন্য এইগুলি অতি সহজেই ধ্বসিয়া পড়িয়া যায়।

মেজে—

স্নানাগারের মেজে সাধারণতঃ ইট খাড়াভাবে দিয়া এবং অন্যান্য মেজে ইট চেপটাভাবে বিছাইয়া তৈরী করা হইত। স্নানাগারের মেজেতে ইট করাত দিয়া কাটিয়া কিংবা ঘষিয়া মসৃণ করিয়া ব্যবহার করা হইত। সেজন্য স্নানাগারের মেজে দেখিতে খুব সুন্দর।

১ ফ্রাঙ্কফোর্ট (Frankfort) উল্লেখ করিয়াছেন যে, মেসোপটেমিয়ার খাফাজে (Khafaje) নামক স্থানে চুণ পোড়াইবার ভাঁটা আবিষ্কৃত হইয়াছে। Tell Asmar and Khafaje, 1930-31, p. 90

দরজা-জানালা—

গৃহগুলির একতলাতে দরজা দিয়া আলো ও বাতাস যাইত। স্থানে স্থানে জানালারও অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। দরজাগুলি প্রায় ৩" ৪" চওড়া ছিল।

দরজা, জানালা ও চৌকাঠ কাঠের হইত। পাথরে কিংবা ইটে গর্ত্ত করিয়া দরজার নীচের পার্শ্ববর্ত্তী কোণা বসান হইত। এইরূপ গর্ত্তবিশিষ্ট পাথর ও ইট আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রকৃত খিলান তখনও জানা ছিল না। তখনকার লোকেরা ইট উপর্য্যুপরি সাজাইয়া করণ্ডাকার বা ধাপী খিলান (corbelled arches) তৈরী করিত। কিন্তু সুমের দেশে ঐ সময়ে প্রকৃত খিলান জানা ছিল।

কোন কোন গৃহের প্রাচীরগাত্রে কুলুঙ্গী (niche) দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্ত্তি প্রভৃতি স্থাপনের জন্য সম্ভবতঃ ইহা ব্যবহৃত হইত।

সিঁড়ি—

উপরের তলায় ও ছাদে যাতায়াতের সিঁড়ি থাকিত; কিন্তু স্থানে স্থানে ঐগুলি খুব সরু ও খাড়া হইত।

কূপ—

জলের জন্য কূপ খনন করা হইত। ঐগুলি গোল কিংবা ডিম্বাকার। প্রায় প্রতি গৃহেই পোড়া ইটের তৈরী কূপ ছিল। সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য বড় রাস্তা হইতে অনতিদূরে দুই গৃহের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কূপ থাকিত। এইরূপ কূপের উপরে জলটানার দড়ির চিহ্ন এবং অদূর মেজেতে কলসী রাখার বহু গর্ত্ত এখনও বিদ্যমান আছে। অনেক পল্লীবধূ একসঙ্গে জল লইতে আসিত। পর্য্যায়ক্রমে এক এক জন করিয়া জল তুলিত। সেইজন্য সকলকেই বহু সময় অপেক্ষা করিতে হইত। দীর্ঘকাল দাঁড়াইয়া থাকা অসুবিধাজনক বলিয়া তাহাদের

বসিবার জন্য কূপের অল্প দূরে দেয়ালের গায়ে ইটের রোয়াক বা বসিবার স্থান থাকিত। এরূপ রোয়াকও স্থানে স্থানে কূপের কাছে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কুম্ভকারের ভাঁটি (পোয়ান বা পোন)

এই সমৃদ্ধিশালী নগরে অসংখ্য মৃৎপাত্র ও লক্ষ লক্ষ ইটের প্রয়োজন হইত। ঐসব মৃৎপাত্র ও ইট পোড়াইবার জন্য স্থানে স্থানে কুম্ভকারের ভাঁটি ছিল। এইগুলির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। নগরের সমৃদ্ধির সময়ে অর্থাৎ আদি ও মধ্যযুগে ঐগুলি সম্ভবতঃ নাগরিক স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কোনও দূরবর্ত্তী স্থানে নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল; কিন্তু তৃতীয় যুগে অর্থাৎ অবনতির সময় সহরের ভিতরেই এমন কি কোন কোন স্থানে রাজপথের উপরেই ঐগুলির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

স্নানাগার ও পয়ঃপ্রণালী—

স্নানাগার ও পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণে মোহেন্-জো-দড়োর অধিবাসীরা যে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

লম্বা নর্দ্দমাগুলি ইষ্টক-নির্ম্মিত। কিন্তু খাড়া নর্দ্দমাগুলি সাধারণতঃ পোড়া মাটীর বড় নল দিয়া তৈরী হইত।

পায়খানা—

মোহেন্-জো-দড়োর লোকেরা পাকা পায়খানার ব্যবহারও জানিত। সহরের এক স্থানে (H. R. Area) গৃহের প্রকোষ্ঠে ছোট ছোট দুইটি পাকা পায়খানা আবিষ্কৃত হইয়াছে; উভয়ের সাম্‌নে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে সমান ছোট ছোট পাকা মেজে রহিয়াছে। ঐ পায়খানাগুলির নীচে পুরীষাধার থাকিত এবং পশ্চাৎ দিকের ছিদ্র-পথ দিয়া বাহির হইতে মেথর ময়লা

পরিষ্কার করিয়া দিত। এইরূপ 'খাটা পায়খানা' এখনও আমাদের দেশে বিদ্যমান আছে।

আহম্মদাবাদ জেলার লোথালে পাকা মেজের মধ্যস্থলে গর্ত্তের মধ্যে সুবৃহৎ মৃদ্‌ভাণ্ড পুরীষাধার-রূপে ব্যবহৃত হইত।[১]

জলনিকাশ, জলনিকাশের নল ও ময়লা জলের কুণ্ড—

জলনিকাশের জন্য গৃহের ছাদ হইতে বড় নল এবং নীচে ময়লা জলের কুণ্ড থাকিত। সদর রাস্তা হইতে মেথরেরা আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া লইয়া যাইত। এই ব্যক্তিগত বিধান ছাড়া সাধারণ নাগরিকদের ব্যবহৃত ময়লা জল গলির নর্দ্দামা হইতে সদর রাস্তার নর্দ্দামা দিয়া বড় আবর্জ্জনা-কুণ্ডে পড়িত। ইহাও মেথরেরা পরিষ্কার করিত। সদর রাস্তার স্থানে স্থানে আবার গোলাকার বা চতুষ্কোণ কুণ্ড (soak pit) থাকিত। ঐগুলি হইতে জল শুকাইয়া গেলে আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া দেওয়ার বন্দোবস্ত ছিল। পরবর্ত্তী কালে (খ্রীষ্টীয় ১ম ও ২য় শতকে) তক্ষশিলা প্রভৃতি স্থানে যে আবর্জ্জনা-কুণ্ড নির্ম্মিত হইত তাহার জল সহজে শুকাইতে পারিত না ; কাজেই কিছুদিন পরে একটা কুণ্ড ভরিয়া গেলে ইহা পরিত্যাগ করিয়া নূতনভাবে আর একটা নির্ম্মাণ করিতে হইত। কিন্তু মোহেন্-জো-দড়োর কুণ্ডের একটা সুবিধা ছিল এই যে ইহাতে মেথরেরা অনায়াসে প্রবেশ করিয়া পরিষ্কার করিতে পারিত।

কাঠ, তক্তা ও মাটীর উপর ইট, চেটাই প্রভৃতি পাতিয়া ঘরের ছাদ দেওয়া হইত। টালি বা কোনও ধাতু ছাদের কার্য্যে ব্যবহার করা হইত বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কোন কোন প্রাসাদের অত্যন্ত পুরু দেয়াল দেখিয়া মনে হয় ঐগুলি খুব উঁচু ছিল। স্যর্ জন্

১ **Indian Arch. 1957-58, A Review, p. 12. PL. XIII. B**

মার্শাল অনুমান করেন, মোহেন্-জো-দড়োর মিস্ত্রীরা দ্বিতল বা ত্রিতল অট্টালিকা নির্ম্মাণেও সমর্থ ছিল।

' আর্দ্রভাব দূর করার জন্য দেয়ালের গায়ে শিলাজতু ব্যবহৃত হইত। বৃহৎ স্নানাগারের চতুর্দ্দিকে দেয়ালের মধ্যে শিলাজতুর পুরু অস্তর এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।'

গৃহ-বর্ণনা—

মোহেন-জো-দড়োতে প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার ইমারত দেখা যায়। (১) বাসগৃহ, (২) দেবালয় বা ভজনালয়, (৩) সাধারণের স্নানাগার, (৪) শস্যাগার ও (৫) দুর্গ। বাসগৃহের আকার-প্রকার গৃহস্বামীর সাংসারিক ও সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করিত। এই সহরের দক্ষিণাংশে একস্থানে[১] গৃহগুলি আয়তনে খুব ছোট ; এক একখানা গৃহে দুইটি মাত্র কক্ষ। সম্ভবতঃ ঐগুলি গরীব লোকদের বাসগৃহ ছিল। আবার কোন কোন স্থানে[২] গৃহগুলি সুবৃহৎ এবং প্রাসাদ-তুল্য। ঐসব ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের আবাসভবন ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কোন কোন গৃহ ৮৫ ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ এবং ৪।৫ ফুট পুরু দেয়ালবিশিষ্ট ছিল। এই সকল সুবৃহৎ গৃহের সঙ্গে দারোয়ানের ঘর, স্নানাগার, কূপ, প্রাঙ্গণ, পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি থাকিত। ভৃত্যনিবাস, অতিথিশালা এবং পাকশালাও বড়লোকের বাড়ীর নীচের তলায় থাকিত। তাঁহারা নিজেরা দোতলাতেই থাকিতেন বলিয়া মনে হয়। দোতলায় এরূপ নিরেট (solid) একখানা ঘর আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার নীচের দিকে একতলায় কোন ফাঁক নাই। বন্যার ভয়েই বোধ হয় নিরেট পাকা ভিত্তির উপর ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। বিপদের সময় অন্ততঃ একখানা কুঠুরীতে ধনজন লইয়া প্রাণরক্ষাই বোধ হয় এরূপ গৃহনির্ম্মাণের উদ্দেশ্য ছিল।

১ M.I.C. HR area, Block 5 Nos. XXXIII to XLVII
২ M. I. C. HR. Block 2 XVIII এবং Block 4

ঐসব ঘরে হিমালয়জাত দেবদারু এবং স্থানীয় 'সীসম্' বা শিশু-কাঠের তক্তা ও বরগা প্রভৃতি ব্যবহার করা হইত।[১] এই সহরের কেন্দ্র-স্থানে (?)[২] একটি গৃহের নক্সা (plan) চমৎকার। ইহার নীচের তলায় চারিটি আঙ্গিনা, দশখানা ছোট কুঠুরী, তিনটি সিঁড়ি ও একখানা দারোয়ানের ঘর। এই গৃহে প্রবেশের তিনটি রাস্তা, এবং মধ্যবর্ত্তীটি সদর দরজা। ইহার সম্মুখ ১ সংখ্যক রাজপথের দিকে। কূপ-গৃহের একখানা দরজা ছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্যান্য গৃহসমূহের মধ্যে সহরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটি গৃহ[৩] সুবৃহৎ। ইহা মোহেন-জো-দড়োর সমৃদ্ধির সময়ে অর্থাৎ মধ্যযুগে (Intermediate period) নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই নগরের দক্ষিণাংশেও[৪] এরূপ বড়বড় গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সব সুবৃহৎ গৃহ কি উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা ঠিক বুঝা যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন, এইগুলি দেবমন্দির ছিল। মেসোপটেমিয়াতে প্রাচীনকালে দেবালয়গুলি রাজপ্রাসাদের অনুকরণেই নির্ম্মিত হইত। মোহেন্-জো-দড়োর এই বৃহৎ গৃহ-সমূহের আশেপাশে প্রস্তর-নির্ম্মিত বড় বড় বলয়াকার দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। অনেকের মতে এগুলি এই যুগের লিঙ্গমূর্ত্তির অধঃস্থ গৌরীপট্ট। তাহা হইলে গৃহগুলিকে দেবালয় বলিয়া অনুমান করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইহা অপেক্ষা আরও ছোটোখাটো দেবমন্দির ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। কিন্তু দেবমূর্ত্তি কিংবা পূজোপকরণ আশানুরূপ পাওয়া না যাওয়ায়, এই ধারণা সত্য কি না বলা খুব কঠিন। এক স্থানে চারি সারিতে (৪ × ৫) ইটের[৫] কুড়িটি থামওয়ালা মধ্যযুগের (Intermediate period) এক

১ একস্থানে দেয়ালে ঐসব কাঠের অঙ্গার পাওয়া গিয়াছে।
২ M. I. C. VS. area House XIII
৩ M. I. C. VS. area Section A, No. XXVII
৪ M. I. C. HR. area
৫ M. I. C. L. area

সুবৃহৎ ইমারত আবিষ্কৃত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে ইহাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়। ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপারে দর্শক কিংবা শ্রোতাদের উপবেশনের নিমিত্ত এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। মোহেন-জো-দড়োতে 'HR'-চিহ্নিত খণ্ডে দৈর্ঘ্যে ৫২ ফুট এবং প্রস্থে ৪০ ফুট এবং ৪ ফুট পুরু প্রাচীর বিশিষ্ট এক ইষ্টকালয় আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্মুখ ভাগের সঙ্গে সমান্তরাল দুইটি সোপানশ্রেণী দ্বারা দক্ষিণদিক্ দিয়া অগ্রসর হইলে দুইটি প্রাসাদাবলীর মধ্য দিয়া ইহাতে প্রবেশ করা যায়। এই পথের অন্তর্দ্দেশে ৪ ফুট ব্যাসযুক্ত এক বৃত্তাকার মঞ্চের চতুর্দ্দিক্ ইষ্টকাবরণী দ্বারা ঢাকা থাকিত বলিয়া হুইলার অনুমান করেন। এবং ঐ মঞ্চের মধ্যস্থলে কোন পবিত্র বৃক্ষ অথবা কোন দেবমূর্ত্তি রাখা হইত বলিয়াও তিনি মনে করেন। এবং এই অনুমানের বলে এই ইষ্টকালয় কোন দেবমন্দিরের প্রতীক বলিয়া মত প্রকাশ করেন।[১] এই গৃহের সন্নিকটে চূণা পাথরের তৈরী ৬.৯ ইঞ্চি উচ্চ শ্মশ্রুযুক্ত একটি ভগ্নমূর্ত্তি এবং এই অঞ্চলের অনতিদূরে ১৬½ ইঞ্চি উচ্চ আর একটি উপবিষ্ট ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তি এবং ইহার বিভিন্ন খণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত গৃহের নির্ম্মাণ-প্রণালী ও উল্লিখিত মূর্ত্তিদ্বয়ের ইহার সঙ্গে যোগাযোগ এবং মধ্যবর্ত্তী মঞ্চ ইত্যাদির একত্র সমন্বয় প্রভৃতিদ্বারা ইহা যে মোহেন-জো-দড়ো সভ্যতার কোন দেবমন্দিরের প্রতীক এই কল্পনা করা একেবারে অবাস্তব নাও হইতে পারে।

মোহেন্-জো-দড়োর অন্যতম আশ্চর্য্য জিনিষ, একটি বৃহৎ স্নানাগার। স্নানাগারটা এত সুবৃহৎ ও সুগঠিত যে এই যুগের পক্ষে ইহার চেয়ে ভাল আমরা কল্পনা করিতে পারি না। ইহা উত্তর-দক্ষিণে ১৮০ ফুট দীর্ঘ ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে ১০৮ ফুট প্রস্থ। ইহা চতুর্দ্দিকে ৭।৮ ফুট পুরু প্রাচীর-দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই স্নানাগারের মধ্যভাগে

১ Wheeler—Ind. Civil., pp. 38-39

একটি প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণে দৈর্ঘ্যে ৩৯ ফুট, প্রস্থে ২৩ ফুট, এবং গভীরতায় ৮ ফুট, একটি সন্তরণবাপী আছে। ইহা সম্ভবতঃ জলক্রীড়ার জন্য ব্যবহৃত হইত। যদিও ভারতবর্ষের বহু তীর্থক্ষেত্রে এখনও যাত্রীদের স্নানাদির জন্য দেবমন্দিরের সন্নিকটে স্নানবাপী দেখিতে পাওয়া যায়, এবং মোহেন্-জো-দড়োর এই জলাশয়-সম্পর্কেও কেহ কেহ ধর্ম্ম-সংক্রান্ত প্রশ্নেরই অবতারণা করিতে পারেন, তথাপি আমাদের মনে হয় সিন্ধু-সভ্যতার অভিজাত-সম্প্রদায়ের জলকেলির জন্যই ইহা ব্যবহৃত হইত। কারণ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার যে মোহেন-জো-দড়োবাসীর নাগরিক-জাবন ও জ্ঞানবিজ্ঞানের নিৰ্জ্জীব প্রতিভূ বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাস্ফীত নরনারীর মনে বিস্ময় উৎপাদন করিতে পারে— সেই সুশিক্ষিত জাতি জলকেলির মত সাধারণ আমোদপ্রমোদের জন্য যে একটি জলাশয় রাখিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছুই নাই। পরবর্ত্তী যুগে ভারতবর্ষে জলকেলির জন্য অভিজাত-সম্প্রদায়ের বাপী থাকিত বলিয়া সংস্কৃত কাব্যে যথেষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। সিন্ধুতীরে যে একটি উন্নত ও সৌখিন জাতির বাস ছিল, এইসব ছোটোখাটো বিষয় হইতেও তাহার খুব পরিচয় পাওয়া যায়।

এই সন্তরণবাপীটির নির্ম্মাণকৌশল খুব চমৎকার। বিংশ শতাব্দীর সুদক্ষ স্থাপত্যবিশেষজ্ঞও ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পড়িবেন। এই বাপীর উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ে সিঁড়ি এবং সিঁড়ির নীচে স্নানার্থীদের জলে নামিবার জন্য অনুচ্চ মঞ্চ ছিল। অদূরবর্ত্তী কূপ হইতে জল আনিবার ব্যবস্থা করিয়া বাপীটি জলপূর্ণ করা হইত এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত জলনিকাশের জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সাড়ে ছয় ফুট গভীর প্রণালী ছিল।। এই জলাশয়ের চতুর্দ্দিকে ৩।৪ ফুট পুরু করিয়া সুন্দর ও মসৃণ ইটের গাঁথনি দেওয়া হইয়াছিল, এবং তৎসঙ্গেই স্যাঁৎসেঁতে ভাব দূর করার জন্য এক ইঞ্চি পুরু শিলাজতুর (bitumen) প্রলেপ দিয়া, যাহাতে ইহা গড়াইয়া না পড়িতে পারে তজ্জন্য এক সারি মসৃণ পাতলা ইট দিয়া চাপিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহার

বাহিরে অল্প দূরে চতুর্দ্দিক্ ঘেরিয়া আর একটি পাকা দেয়াল আছে। এই দেয়াল এবং শিলাজতুর পাতলা দেয়ালের মধ্যে খালি জায়গাটি কর্দ্দম দিয়া পূর্ণ করা হইয়াছিল। এই মাটীর দেয়ালের মধ্যে জলাশয়ের চারি কোণে শিল্প বা ভাস্কর্য্যের জন্য পোড়া ইটের চারিটি সমান আয়তনের চতুষ্কোণ মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এইগুলির অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান আছে। উল্লিখিত পাকা দেয়ালের সমান্তরাল ভাবে চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া বহু বাতায়ন-বিশিষ্ট একটি দেয়াল এবং তাহার বাহিরে বারান্দা এবং তৎপরে আর একটি সমান্তরাল ইষ্টক-প্রাচীর চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই সুগঠিত নির্ম্মাণ-কর্ম্মটিকে সুরক্ষিত করিবার জন্য বাতায়ন-বিশিষ্ট প্রাচীরের গায়ে জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী প্রাচীর হইতে কয়েকটি ছোট ছোট দেয়াল আড়াআড়ি ভাবে আসিয়া মিলিয়াছে।

এই স্নানাগারে প্রবেশের জন্য বাহিরের প্রাচীরের উত্তর দিকে একটি, দক্ষিণ দিকে দুইটি ও পূর্ব্বে অন্ততঃ একটি দ্বার ছিল। পশ্চিম দিকেও হয়ত প্রবেশ-পথ ছিল, কিন্তু ঐ দিকের প্রাচীরের অস্তিত্ব লোপ পাওয়ায় এবিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা কঠিন।

সিন্ধু-সভ্যতার তৃতীয় যুগে এই পল্লীতে নানারূপ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন দেখা যায়। বন্যার ভয়ে শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়া ভিত্তি শক্ত ও পাকা করা হয়। উত্তর দিকে এক বৃহৎ মোটা দেয়াল তোলা হয়, এবং দোতলায় যাওয়ার জন্য সিঁড়ি তৈরী হয়। বন্যার প্রতিষেধক উপায়-স্বরূপ এইসব ব্যবস্থা করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

এই স্নানাগারে অন্ততঃ একটা উপরতলা ছিল, কারণ উপর হইতে একটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে সিঁড়ি এবং এক প্রান্তে নর্দ্দমা নামিয়া আসিয়াছে। উপরে ঘর না থাকিলে ঐগুলির কোন সার্থকতা দেখা যায় না। এই চত্বরের বাহিরের দেয়ালগুলি উপরতলা পর্য্যন্ত গিয়াছিল এবং উপরেও নীচের ঘরগুলির অনুকরণে ঘর তৈরী করা হইয়াছিল বলিয়া স্যর্ জন্ মার্শাল অনুমান করেন। খননের সময় কাঠকয়লা

ও ভস্ম পাওয়াতে তিনি মনে করেন যে উপরতলায় কাঠের আসবাবপত্র প্রচুর পরিমাণে ছিল।

এই জলাশয়ের উত্তর দিকে একটি গলির উভয় পার্শ্বে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (৯½′ × ৬′) দুই সারি স্নানাগার রহিয়াছে ; ঐ ঘরগুলির প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া দ্বার এবং পয়ঃপ্রণালী আছে, প্রতি ঘরে উপরে যাওয়ার সিঁড়িও রহিয়াছে। ইহা হইতে ডাক্তার ম্যাকে অনুমান করেন যে এই সকল স্নানগৃহ এখানকার পুরোহিতদের জন্য ছিল। তাঁহারা উপরতলার প্রকোষ্ঠে বাস করিতেন এবং সেখান হইতে স্নানাগারে আসার জন্য সিঁড়ি তৈরী করা হইয়াছিল।[১]

এই শ্রেণীবদ্ধ স্নানাগারগুলি রাস্তার উভয় দিকে এরূপভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে একটি স্নানগৃহের দরজা অন্য স্নানগৃহের দরজার ঠিক সাম্‌না-সাম্‌নি নয়। কাজেই এইগুলিতে স্নানার্থীদের প্রত্যেকেরই একান্তভাব রক্ষা পাইত। বৃহৎ স্নানাগারের নিকটে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আর একটি গৃহ আবিষ্কৃত হইয়াছে ; আংশিক খননের পর ইহাতে ৫ ফুট উচ্চ কয়েকটি চতুষ্কোণ ইষ্টকমঞ্চ দেখিতে পাওয়া যায় ; ঐগুলিতে মাঝে মাঝে খাঁজ কাটা এবং মঞ্চদ্বয়ের মধ্যে আড়া-আড়ি-ভাবে ছোট রাস্তা আছে। ঐ ঘরের মেজের মধ্যে ধাতুমল, কাঠ-কয়লা প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী খনন-বিশারদরা অনুমান করিয়াছিলেন যে এই গৃহে চুল্লীর সাহায্যে স্নানাদির জন্য উত্তাপ-সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু এই ধারণা পরে ডাঃ হুইলারের খননের ফলে ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি বিশাল শস্যাগার ছিল।

এই নগরের অন্য এক স্থানে একটি গৃহ-প্রকোষ্ঠে প্রায় ৬½ ইঞ্চি চওড়া এবং ৫ ফুট ২ ইঞ্চি লম্বা ও ১০ ইঞ্চি উঁচু একটু দূরে দূরে সমান্তরালভাবে সাজান ছয়টি ইষ্টকনির্ম্মিত দেয়াল আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১ **Arch. Sur. Rep. 1927-28, p. 70**

ডাঃ ম্যাকে অনুমান করেন এই স্থানটি রন্ধনশালা ছিল।[১] কিন্তু আমাদের মনে হয় ইহা শস্যভাণ্ডার ছিল। শস্যভাণ্ডারে যাহাতে স্যাঁত্‌সেঁতে ভাব না হইতে পারে সেজন্য মধ্যে ফাঁক রাখিয়া সমান্তরাল দেয়াল দিয়া তদুপরি শস্যাগার নির্ম্মাণ করা হইত এবং তাহাতে শস্যাদি রাখা হইত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। হরপ্পাতেও এইরূপ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তী কালে অর্থাৎ ঐতিহাসিক যুগে পাহাড়পুর (রাজসাহী জেলা) ও বাণগড় (দিনাজপুর জেলা) প্রভৃতি স্থানেও এইজাতীয় নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোন কোন স্থানে বর্ত্তমান কালেও শস্যাদি রাখিবার জন্য ইট কিংবা মাটী দিয়া এই প্রকার শস্যাগার নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

তাম্রপ্রস্তর যুগে বিভিন্ন সভ্যদেশে রাজকীয় শস্যাগার একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্য ছিল। মেসোপটেমিয়া ও মিশরের সুপ্রাচীন কালের বিভিন্ন লেখা হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে রাজকীয় বিশাল শস্যাগারই দেশের আধুনিক কোষাগার বা ধনভাণ্ডারের (State Bank) কাজ চালাইত। কারণ ঐ যুগে আজকালকার মত ধাতু-মুদ্রার প্রচলন ছিল না বলিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন। উরদেশের একটি লেখা হইতে জানা যায় সেখানে এক শস্যাগারে শ্রমিকদের ৪০২০ দিনের বেতনের পরিমিত যব (barley) মজুত থাকিত। ঐ দেশেরই আর একটি লেখায় উল্লেখ আছে কোন এক শস্যভাণ্ডারের অধ্যক্ষের উপর বিভিন্নজাতীয় শ্রমিক, যথা—লেখজীবী, কর্ম্মপর্য্যবেক্ষক (overseer), মেষপালক এবং সেচকর্ম্মী (irrigator) প্রভৃতির ১০৯৩০ দিনের মাহিনা দেওয়ার ভার ছিল। রাজকীয় শস্যাগার হইতে শস্য ধার নিয়া তাহা সুদসহ আদায় করিবার উল্লেখও উর-এর এক প্রাচীন দলিলে দেখিতে পাওয়া যায়। মিশরেও এই প্রথাই বিদ্যমান ছিল বলিয়া মনে হয়। সেখানেও রাজকীয় কর আদায়ের জন্য

১ Mackay F. E. M. Vol I. p. 105 ; Vol II. PL.XLV. f.

শস্যাগার কোষাগারের এক বিশিষ্ট বিভাগ ছিল। ঐখানে শারীরিক শ্রম কিংবা শস্য-দ্বারা কর আদায়ের ব্যবস্থা ছিল।[১] কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে মেসোপটেমিয়া কিংবা মিশরে ঐ যুগে নির্ম্মিত শস্যভাণ্ডারের কোন চিহ্ন আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং ঐগুলির আকৃতি ও আয়তন সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। কিন্তু হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োতে খননের ফলে তাম্রপ্রস্তর যুগের বিশাল তুইটি শস্যভাণ্ডার ভূগর্ভ হইতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সমসাময়িক মিশর ও মেসোপটেমিয়ার লিখিত দলিল হইতে এবং ঐ শস্যাগারগুলির অবস্থান হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ইহারাও তৎকালীন ভারতের রাজকীয় কোষাগারের কাজ করিত। অর্থাৎ প্রজারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্য (গম ও যব) দ্বারাই রাজকীয় কর আদায় করিত। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত রাজকীয় কৃষিবিভাগও ছিল এবং সেখানে উৎপন্ন শস্য দ্বারা রাজভাণ্ডার পূর্ণ করা হইত। হরপ্পায় শস্যাগারের আয়তন প্রায় নয় হাজার বর্গ ফুট এবং মোহেন্-জো-দড়োতেও প্রায় ১১ হাজার বর্গফুট।

১৯৫০ সালে পাকিস্তানের আর্কিওলজিকেল এড্‌ভাইসার ডাঃ (অধুনা স্যার) মর্টিমের হুইলারের (Dr. R. E. Mortimer Wheeler) খননের ফলে মোহেন্-জো-দড়োতে তুইটি খুব বিস্ময়কর জিনিষ আবিষ্কৃত হয়। ইহার মধ্যে একটি নগর-রক্ষার উপযোগী তুর্গ (citadel) এবং অপরটি সুবৃহৎ শস্যভাণ্ডার (granary); এই উভয়টিই এতদিন ধ্বংসস্তূপের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া ছিল। এই সকল অভিনব আবিষ্কার দিন দিনই মোহেন্-জো-দড়োর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতেছে। ডাঃ হুইলার মনে করেন মোহেন্-জো-দড়ো সহর তুইভাগে বিভক্ত ছিল। নগরের পশ্চিম প্রান্তটি কৃত্রিম উপায়ে মাটি ভরাট করিয়া এবং কাঁচা ইট দিয়া স্থানটি পার্শ্ববর্ত্তী

১ Wheeler—Indus Civilisation (1953)—pp. 23-24

সমতলভূমি হইতে ২০ হইতে ৪০ ফুট উন্নত (বপ্রাকার) করা হইয়াছিল এবং তাহাতে নগর-রক্ষার দুর্গ (citadel) নির্ম্মিত হয়। এই দুর্গ-পরিধিরই উত্তর প্রান্তে বহু শতাব্দী পরবর্ত্তী কালের কুশান-যুগের বৌদ্ধস্তূপ মোহেন-জো-দড়োর মুকুটমণির মত শোভা পাইতেছে। এই দুর্গ-বেষ্টনীর পাদদেশে সুবিস্তীর্ণ নগরের পরিকল্পনা করা হয়। এই নগরের স্থানে স্থানে ৩০ ফুট কিংবা ততোধিক প্রশস্ত রাজপথও আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে বড় বড় চকমিলান বাড়ী রহিয়াছে। কিন্তু উন্নত দেশে দুর্গ-অঞ্চলের বাড়ীগুলি খুব ঘনসন্নিবিষ্টভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সৌধমালার মধ্যে নগরের প্রধান ধর্ম্মস্থান এবং শাসনাধিষ্ঠান ছিল বলিয়াও ডাঃ হুইলার মনে করেন। তিনি আরও মনে করেন যে মোহেন্-জো-দড়োর সমসাময়িক অন্যান্য দেশের সভ্যতার অনুরূপ এখানেও দুর্গটি কোন ধর্ম্মযাজক শাসকের রাজপ্রাসাদ ছিল। তাঁহার মতে ঐ এলাকায় স্তম্ভবিশিষ্ট পাঁচটি প্রকোষ্ঠযুক্ত প্রাসাদ ও সুপ্রশস্ত স্নানাগারটিই এখানকার শাসনযন্ত্রকে ধর্ম্মের সহিত যুক্ত করিবার সহায়তা করে। অধিকন্তু এই বৎসরের খননের ফলে দুর্গের পশ্চিমপ্রান্তে লব্ধ সুবিশাল শস্যভাণ্ডারটি এই দুর্গই যে শাসনকর্তার আবাসস্থান ছিল, এই মতের পোষকতা করে। সেইজন্যই তিনি দুর্গ, স্নানাগার এবং শস্যভাণ্ডার এই তিনটির সমন্বয় করিয়া তাঁহার এই মত লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। শস্যভাণ্ডারের কথা লিখিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন যে ইহার প্রাচীর দেখিয়া প্রথমে দুর্গপ্রাচীর বলিয়া মনে হইয়াছিল এবং প্রকৃতপক্ষে নগরের রক্ষাকার্য্যে হয়ত বা ইহা হইতে এইপ্রকার সাহায্যও পাওয়া যাইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ১৫০ ফুট লম্বা ও ৭৫ ফুট চওড়া এক বিশাল শস্যভাণ্ডারের ভিত্তি। ইহা উচ্চতায় ২৫ ফুট। উপরে বায়ু-চলাচলের রাস্তা ছিল। এই ভিত্তির উপরে মূল শস্যভাণ্ডার কাষ্ঠনির্ম্মিত ছিল। প্রসিদ্ধ স্নানাগারের সন্নিকটেই এই শস্যভাণ্ডার আবিষ্কৃত হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী সমতলভূমি হইতে প্রায় ৩০ ফুট উচ্চে ইহার ভিত্তি স্থাপন করা হয়। ইহার পার্শ্বগুলি ঢালু (sloping) ; বাহির

হইতে দেখিলে অনেকটা দুর্গের মতই মনে হয়। নগরের সমৃদ্ধির সঙ্গে এই শস্যাগারের দৈর্ঘ্য পরে বাড়াইয়া দ্বিগুণ করিতে হইয়াছিল। এই প্রশস্ত উচ্চ ভিত্তির উপরে কাষ্ঠনির্ম্মিত শস্যাগার বা গোলাঘর খুবই আশ্চর্য্যজনক জিনিষ। এই গোলাঘরের (granary) কাঠের থামের জন্য নির্ম্মিত গর্ত্তসমূহ অধুনা লুপ্ত কাঠের কাঠামোর অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করিয়া আনিয়াছে। হরপ্পার দুর্গ-সন্নিকটেও বারটি শস্যাগার আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলির মোট আয়তন মোহেন্-জো-দড়োর একটি শস্যভাণ্ডারেরই আয়তনের প্রায় সমান। সমসাময়িক এবং একজাতীয় সভ্যতার একই প্রকার প্রমাণ উভয়স্থানে আবিষ্কৃত হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নিতান্তই স্বাভাবিক যে সুপ্রাচীনকালে নাগরিক অর্থনীতির উপর এই সকল শস্যভাণ্ডারের প্রভূত প্রভাব ছিল। তৎকালে এই ভাণ্ডারগুলি রাজকোষ (State Bank) ও রাজস্ববিভাগ (Revenue Authority)-এর ন্যায় কাজ করিত বলিয়া ডাঃ হুইলার মনে করেন। মোহেন্-জো-দড়োর শস্যাগারে বাহির হইতে গরুর গাড়ী বোঝাই হইয়া শস্য আসিলে তাহা ভাণ্ডারের সন্নিকটে নামাইয়া একটা পোড়া ইটের বাঁধানো ভিত্তির উপর রাখা হইত। এবং পার্শ্বের দেয়ালের মধ্যে শস্যাগারে শস্য রাখিবার জন্য যে ছিদ্র থাকিত তাহা দিয়া কাষ্ঠনির্ম্মিত ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা হইত।

হরপ্পাতে সারি-সারি-ভাবে বারটি শস্যভাণ্ডার আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলির সম্মিলিত আয়তন (ক্ষেত্রফল) ৯০০০ বর্গফুটের উপর হইবে। মোহেন্-জো-দড়োর সুবৃহৎ শস্যাগারের ক্ষেত্রফলও প্রায় ইহাদের সমানই হইবে।

শাসন-ব্যবস্থা—তাম্রপ্রস্তর যুগে সিন্ধুতীরে যে এক বিশিষ্ট শাসন-ব্যবস্থা ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। শাসন-কার্য্য ধর্ম্ম-গুরুদের দ্বারা অথবা রাজবংশ দ্বারা পরিচালিত হইত এই বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। তবে যেরূপই হউক না কেন রাষ্ট্র যে একজন অধিনায়কের অধীনে ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রাজ্য ও নগর রক্ষার জন্য

সুবৃহৎ দুর্গ যে ছিল তাহারও অস্তিত্বের প্রমাণ হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়ো এই উভয় স্থানেই পাওয়া গিয়াছে। [১] হরপ্পাতে আদি সমতল ভূমি হইতে প্রায় ২০।২৫ ফুট উচ্চ কর্দ্দম ও কাঁচা ইটের তৈরী বপ্রাকার ভূখণ্ডের উপর উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৪৬০ গজ লম্বা এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় ২১৫ গজ চওড়া এক সমান্তরাল ক্ষেত্রে এক দুর্গের চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ৪৫ ফুট প্রশস্ত কাঁচা ইটের তৈরী এক সুরক্ষিত প্রাচীর দ্বারা ইহা বেষ্টিত ছিল। আদি যুগের স্থানীয় অধিবাসীদের প্রাচীন বসতির উপর হরপ্পায় নবাগত এক সুসভ্য জাতির দ্বারা নগর-রক্ষার জন্য ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। এই প্রাচীরকে সুদৃঢ় করিবার জন্য বহির্দ্দেশে পোড়া ইটের গাঁথনি দেওয়া হইয়াছিল। স্থানে স্থানে ৪ ফুট চওড়া এই পাকা ইটের প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। মোহেন্-জো-দড়োতেও প্রায় ২০ ফুট হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ৪০ ফুট উঁচু এক কৃত্রিম মঞ্চের উপর, তাম্রপ্রস্তর যুগের এই দুর্গ অবস্থিত। ইহার উপরে খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে নির্ম্মিত বৌদ্ধস্তূপ ও বিহারের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। এই দুর্গ মোহেন্-জো-দড়োর পরম সমৃদ্ধির সময়ে (বা মধ্যযুগে) নির্ম্মিত বিশাল শস্য ভাণ্ডার ও স্নানাগারের সমসাময়িক বলিয়া ১৯৫০ সালের খননে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ঐগুলির নীচে পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের অনেক ঘরবাড়ী ও আসবাব-পত্র ভূগর্ভে আত্মগোপন করিয়া আছে। প্রাকৃতিক কারণে জল-সম (water level) অনেক উপরে উঠিয়া আসায় ঐগুলি বর্ত্তমানে জলের নীচে পড়িয়া আছে। ইহাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করা এখনও সম্ভব হয় নাই। মোহেন্-জো-দড়োতে ১৯৫০ সালে খননের পর হুইলার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে দুর্গ-নির্ম্মাণ-প্রণালী ও তৎসংলগ্ন গৃহাবলীর আনুপূর্ব্বিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে এখানে কোন কৃষ্টি-পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় না। সম্ভবতঃ কোন শাসক-সম্প্রদায়ের অনবচ্ছিন্ন শাসন এখানে বিদ্যমান ছিল।[১]

১ Wheeler—Ind. Civil.—p. 26

সিন্ধু-সভ্যতায় উদ্ভাসিত যে সব স্থানের চিহ্ন আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োর স্থান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কারণ প্রায় ৩৫০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত এই দুইটি নগরী একই সভ্যতা-জননীর যমজ দুহিতা রূপে দুই অঙ্কে শোভা পাইত। শিক্ষা, দীক্ষা, সমৃদ্ধি এবং নাগরিক জীবনের আভিজাত্যে তৎকালীন সভ্যজগতে এই উভয় নগরী এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছিল। নগর-পরিকল্পনা, দুর্গ-বিধান, শস্যাগার-নির্ম্মাণ, জল-সরবরাহ, যানবাহন ও পৌর প্রতিষ্ঠানের বিবিধ সুব্যবস্থা ইত্যাদিতে উভয় নগরীই সম্পূর্ণ অভিন্ন ও সমকক্ষ। একই সময়ে একজাতীয় সভ্যতায় সমৃদ্ধ না হইলে এই উভয় নগরীকে শত্রু-ভাবাপন্ন বলিয়া মনে করা যাইতে পারিত, কিন্তু সমস্ত বিষয়ে সমতুল্য বলিয়া সেই ধারণা অমূলক প্রতিপন্ন হইবে, এবং কোন বিশাল রাজ্যের শাসন-কার্য্যের সুবিধার জন্য দুইটি রাজধানী নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল বলিয়া হুইলার এবং পিগোট্ (Piggott) মনে করেন। দুই কেন্দ্র হইতে দুইজন শাসনকর্ত্তা একই প্রকার শাসন-কার্য্য পরিচালনা করিতেন বলিয়া মনে হয়। রাজ্যটি সম্ভবতঃ দুইটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল এবং একই কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রের অধীনে দুই রাজধানী হইতে শাসন চালাইবার ব্যবস্থা ছিল। অথবা উভয়েই সমসংস্কৃতি ও আদর্শ-সম্পন্ন রাজ্যগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া একই পরিকল্পনায় দুইটি কেন্দ্র হইতে স্বতন্ত্র ও স্বচ্ছন্দভাবে শাসন-কার্য্যের পরিচালনা ও রাজ্যের শান্তি রক্ষা করিত। এই উভয় রাজ্যে সংযোগ রক্ষা হইত বোধ হয় নদীপথে জলযানের সাহায্যে। আহম্মদাবাদ জেলার লোথাল নামক স্থানও যে এইজাতীয় সভ্যতার আর একটি বিশেষ কেন্দ্র ছিল, তাহা সম্প্রতি খননের ফলে উত্তমরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। সেখানেও যে নাগরিক শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাহা তত্রত্য প্রশস্ত রাজপথ ও পার্শ্ববর্ত্তী শ্রেণীবদ্ধ অট্টালিকা ও তৎসংলগ্ন স্নানাগার, অপরিস্রুত জলবাহী অসংখ্য পয়ঃপ্রণালী এবং পানীয়-জল-সরবরাহকারী জলকূপ ইত্যাদি দ্বারাই প্রমাণিত হয়। দৈনন্দিন ব্যবহারের গৃহের

আসবাবপত্র এবং সিন্ধু-সভ্যতার চিত্রাক্ষর-যুক্ত শীলমোহর প্রভৃতিও ঐ স্থানের নাগরিক সভ্যতার স্মৃতি বহন করিয়া আনিয়াছে। পাঞ্জাবের অন্তর্গত আম্বালা সহর হইতে প্রায় ৬০ মাইল উত্তরে রূপার নামক স্থানেও সিন্ধু-সভ্যতার বিবিধ চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তবে এখানে শাসনকার্য্যের প্রধান নগর ছিল কি না নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন ; কিন্তু লোথালে যে শাসন-কেন্দ্র ছিল তাহা নগর পরিকল্পনা এবং পুরাবস্তু পরীক্ষা দ্বারা সম্যক্ রূপে উপলব্ধি হইবে।

মোহেন্-জো-দড়োর সুবৃহৎ স্নানাগারের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে দৈর্ঘ্যে ২৩০ ফুট এবং প্রস্থে ৭৮ ফুট এক বিশাল প্রাসাদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা কোন উর্দ্ধতন রাজপুরুষ অথবা প্রধান ধর্ম্মযাজক কিংবা ধর্ম্মযাজক-সম্প্রদায়ের বাসস্থান (College of priests) ছিল বলিয়া ডাঃ ম্যাকে অনুমান করেন।[১] কিন্তু ইহার স্থাপত্য প্রভৃতির সম্পূর্ণ বিবরণ এখনও অবগত হওয়া সম্ভবপর হয় নাই। ইহার মধ্যে ৩৩ ফুট বর্গের একটি আঙ্গিনা আছে। এই প্রাসাদের তিনটি বারান্দা এই আঙ্গিনার দিকে খোলা। ইহার "ব্যারাক" (barrack)-এর মত আকার দেখিয়া, এই প্রাসাদ সাধারণভাবের বাসগৃহ ছিল বলিয়া মনে হয় না। কেহ কেহ মনে করেন যে বৌদ্ধস্তূপের নীচে হয়ত সিন্ধু-সভ্যতার কোন দেবমন্দিরের চিহ্ন আবিষ্কৃত হইতে পারে। কারণ পীঠস্থানের মাহাত্ম্যের কথা যুগ-যুগান্ত পর্য্যন্ত লোকেরা ভুলিতে পারে না, এবং সেইজন্যই এখানেও প্রায় দুই হাজার বৎসরের পুরাতন স্মৃতির ম্লান ক্ষীণ আলোক-রেখার উপর হয়ত নির্ভর করিয়া খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দীতে এই বৌদ্ধ-স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সুদীর্ঘ ব্যবধানের ফলে মানুষের স্মৃতির আঙ্গিনায় কালের পলিমাটি সঞ্চিত হইয়া কি যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর সৃষ্টি করিয়াছে তাহার সংবাদ কি কেহ জানে? জনশ্রুতি মহাকালের কবলে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সুপ্রাচীন কালের জীর্ণ মন্দিরের

১ Mackay. F. E. M. vol. I, p. 10

ভগ্নাবশেষ হয়ত এখানে বা অন্য কোথাও ধ্বংসস্তূপের অন্তরালে খনিত্রের আঘাতের অপেক্ষায় আত্মগোপন করিয়া পড়িয়া আছে। কতকালে সেই সুষুপ্তির অবসান ঘটিবে কে বলিতে পারে ?

ব্যবসায়-বাণিজ্য-বিষয়েও সুপ্রাচীন সিন্ধুতীরবাসীরা কোন অংশে পশ্চাৎপদ ছিল না। হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত শীলমোহর ও চিত্রে দাঁড়ি, মাঝি, পাল ও মাস্তুলযুক্ত জলযানের (নৌকার) প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। এইজাতীয় জলযানের দৃষ্টান্ত প্রাগৈতিহাসিক মেসোপটেমিয়াতেও দেখিতে পাওয়া যায়।[১] এইরূপ জলযানের সাহায্যে সিন্ধুতীরবাসীরা পণ্যদ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি এবং দেশবিদেশে যাতায়াত বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছিল বলিয়া নিঃসন্দেহে মনে করা যাইতে পারে। সৌরাষ্ট্র, গুজরাট, বিকানীর পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানে যাহাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সভ্যতার সাম্রাজ্য বিস্তারলাভ করিয়াছিল, তাহাদের যানবাহন ও ব্যবসায়-বাণিজ্য উন্নত শ্রেণীর না থাকিলে এই সংস্কৃতি ও শিক্ষা এত সুদূরপ্রসারী হইতে কখনই সমর্থ হইত না। স্থলযান-বিষয়েও তাহারা পরাঙ্মুখ ছিল বলিয়া মনে হয় না। উষ্ট্র, অশ্ব ও গর্দভ দ্বারা বাহনের কাজ চালান হইত বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।[২] শকট চালাইবার জন্য গরু ও মহিষ ব্যবহার করা হইত। দেশবিদেশে স্থলপথে বাণিজ্য করিবার জন্য সার্থবাহ-পথ ব্যবহৃত হইত। যে জাতির ওজনের এতরূপ বিভাগ ছিল তাহারা ব্যবসায়-বাণিজ্যে যে কত পারদর্শী ছিল ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ব্যবসায়-বাণিজ্যে মুদ্রার পরিবর্তে বিনিময়-প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন।

১ Piggott—Prehis. India, p. 176
২ Wheeler—Ind. Civil, p, 60

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পুরাবস্তু (Antiquities)

খাদ্য

মোহেন্-জো-দড়োর পুরাদ্রব্যের মধ্যে ভূগর্ভে নিহিত প্রায় পাঁচ হাজার বৎসরের পুরাতন খাদ্য—যব ও গম—বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। যব পুরাতন মিশরের কবরে পাওয়া গিয়াছে। যব ও গম ছাড়া খেজুরের বীচিও অতি প্রাচীনকালের দ্রব্যের সঙ্গে ভূগর্ভ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, আমিষ খাদ্যের মধ্যে মেষ, শূকর ও কুক্কুট প্রভৃতির মাংস সেখানকার অধিবাসীদের খাদ্য ছিল বলিয়া স্যর্ জন্ মার্শাল অনুমান করেন। ঘড়িয়াল কুমীর, কচ্ছপ, টাট্কা ও শুঁট্কী মাছ, সমুদ্রের শামুক প্রভৃতিও বোধ হয় খাদ্যদ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হইত। এই সকলের হাড় ও খোলা প্রভৃতি অর্দ্ধ-দগ্ধ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। দুধও সেকালের জনসাধারণের ব্যবহার্য্য ছিল বলিয়া নিঃসন্দেহ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। খেজুর এবং অন্যান্য ফল-মূলও তৎকালের লোকদের খাদ্য ছিল।

অন্যান্য শস্যের মধ্যে তিল, মটর, রাই প্রভৃতিও উৎপন্ন হইত বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।[১]

তুলা

এখানে কার্পাসের চাষ করিয়া তুলা উৎপন্ন করা হইত বলিয়া মনে হয়। কার্পাসসূতা-নির্ম্মিত বস্ত্র এখানে পুরাবস্তুর সঙ্গে আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্টুয়ার্ট পিগোট্ মনে করেন যে সিন্ধুতীরবাসীরা প্রাচীন

১ Stuart Piggott—Prehistoric India, p. 155

মেসোপটেমিয়াবাসীদের সঙ্গে এদেশে জাত কার্পাস-নির্ম্মিত দ্রব্যের ব্যবসায় করিত। পরবর্ত্তীকালেও মেসোপটেমিয়ায় ভারতীয় তুলাকে সিন্ধু বলা হইত এবং ইহাই গ্রীসদেশে সিন্দোন্ (sindon) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[১]

গৃহপালিত জীবজন্তু

গৃহপালিত পশুর মধ্যে ভারতীয় বিশাল ককুদ্বান্ (humped bull), গরু, মহিষ, মেষ, হস্তী, উষ্ট্র, শূকর, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, কুক্কুট[২] প্রভৃতি প্রাচীন মোহেন্-জো-দড়োতে ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। কুকুর এবং অশ্বের কঙ্কালও এখানে রহিয়াছে, কিন্তু উপরের স্তরে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ সুপ্রাচীনকালে ইহাদের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু কুকুরের প্রাচীনত্বের বিষয় কঙ্কাল ছাড়া পোড়া মাটীর এবং পাথরের কুকুরমূর্ত্তি দ্বারা প্রমাণ করার সুযোগ মোহেন্-জো-দড়োতেই আছে। অশ্ব সম্বন্ধে এরূপ কোন প্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। কিন্তু বেলুচিস্তানের "রণ ঘুণ্ডৈ" (Rana Ghundai) নামক স্থানে খননের ফলে প্রাক্-

১ Ibid, p. 155

২ গৃহপালিত কুক্কুটের ব্যবহার সম্ভবতঃ ব্রহ্মদেশ বা চট্টগ্রাম হইতে সমগ্র জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহাই ডারুউইনের অভিমত এবং সর্ব্ববাদিসম্মত। যাবতীয় গৃহপালিত কুক্কুটই শিখাবিশিষ্ট কুক্কুটের বংশধর। গৃহপালিত শূকর নবপ্রস্তর যুগে (Neolithic age) সুইজার্‌লণ্ডে হ্রদবাসীদের (Lake-dweller) গৃহে বিদ্যমান ছিল। পরবর্ত্তী কালে তাম্রপ্রস্তর যুগে এশিয়ার মোহেন্-জো-দড়োর সমসাময়িক সুসা, আনাও প্রভৃতি স্থানেও ইহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। নবপ্রস্তর অস্ত্র-ব্যবহারী পলিনেসিয়ার (Polynesia) অধিবাসীদের শূকর ও কুক্কুট এই দুইটি মাত্র গৃহপালিত প্রাণী ছিল। সুতরাং মনে হয় এশিয়াতে গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে কুকুরের পরেই শূকর ও কুক্কুটই প্রাচীনতম।

সিন্ধু-সভ্যতার যুগের অশ্ব এবং গর্দ্দভের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।[১]

বন্য জন্তু

হরিণ, বন্য গরু, গণ্ডার, ব্যাঘ্র, বানর, ভল্লুক, নকুল, ছুঁচা, ইঁদুর, কাঠবিড়াল ও খরগোস প্রভৃতির আকৃতি পোড়া মাটী, ফায়েন্স (faience)[২], ব্রোঞ্জ এবং নরম পাথরের শীলমোহর প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। চারি প্রকারের হরিণের (১। কাশ্মীরী হরিণ, ২। শম্বর, ৩। চিত্রিত হরিণ, ৪। সাধারণ হরিণ) শিং উদ্ধার করা হইয়াছে। ঐগুলি হয়ত কোন ঔষধে ব্যবহারের জন্য দূর স্থান হইতে আমদানী করা হইয়াছিল বলিয়া কর্নেল স্যুয়েল অনুমান করেন।

শিলাজতু

ঔষধে ব্যবহারোপযোগী শিলাজতুও এখানে পাওয়া গিয়াছে; ইহা সচরাচর হিমালয় অঞ্চলে দেখা যায়। ঐ সময়ে আর্দ্রতা দূরীকরণের জন্যও ইহার ব্যবহার হইত। জলের আর্দ্রতা যাহাতে দূরে প্রসারলাভ করিতে না পারে তজ্জন্য সন্তরণবাপীর দেয়ালের গায়ে শিলাজতুর এক ইঞ্চি পুরু প্রলেপ দেওয়া হইয়াছিল। ইহা এখনও বিদ্যমান আছে।

১ E. J. Ross—"A Chalcolithic site in Northern Beluchistan", Journal of Near Eastern Studies, V. No. 4 (Chicago, 1946), page 296

২ এক প্রকার নরম পাথর গুঁড়া করিয়া তাহাতে কাচ-জাতীয় চক্‌চকে দ্রব্যের প্রলেপ-সহ আগুনে পুড়াইলে নীলাভ অথবা সবুজ রং-এর ফায়েন্স তৈরী হয়।

ধাতু

ধাতুদ্রব্যের মধ্যে মোহেন্-জো-দড়োতে সোনা, রূপা, তামা, টিন, সীসা ও ব্রোঞ্জ দেখা যায়। ঐগুলি ভারতীয়, কিংবা পারস্য, আফগানিস্তান, আরব অথবা তিব্বত দেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছিল, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। স্যর্ এড্উইন্ পাস্কো অনুমান করেন যে সোনা দক্ষিণ-ভারত (হায়দ্রাবাদ, মহীশূর অথবা মাদ্রাজ প্রদেশ) হইতে আনা হইয়াছিল। মহীশূরের অন্তর্গত কোলার-খনির ও মাদ্রাজের অন্তর্গত অনন্তপুরের সোনার সঙ্গে মোহেন্-জো-দড়োর সোনার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। এই অনুমান সত্য বলিয়া মনে হয় ; কারণ নীলগিরির সবুজ 'আমাজন' নামক পাথরও এখানে দেখা যায় ; কাজেই দক্ষিণের সঙ্গে সিন্ধুতীরবাসীদের একটা আদান-প্রদানের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল বলিয়া মনে করা খুবই স্বাভাবিক। সোনা দিয়া মালা, টোপ (boss) ইত্যাদি তৈরী হইত। মোহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত সোনার পরিমাণ খুবই কম।

রূপা

রূপা সোনার চেয়ে অপেক্ষাকৃত প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। গহনা-পত্র রাখার জন্য রূপার পাত্র ব্যবহৃত হইত। বড়লোকদের গহনার জন্যও রূপার চল ছিল।

সীসা

ইহা এখানে তেমন প্রচুর মাত্রায় দেখা যায় না। সময় সময় সীসার টুকরা পাওয়া যায়, ঐগুলি হয়ত জাল ডুবাইবার জন্য খণ্ড খণ্ড ভাবে ব্যবহৃত হইত। আজমীর, দক্ষিণ-ভারত, আফগানিস্তান অথবা পারস্য দেশ হইতে সীসা আমদানী করা হইত বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

তামা

তাম্রনির্ম্মিত দ্রব্য এখানে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। রাজপুতানা, বেলুচিস্তান, কাশ্মীর, আফগানিস্তান, পারস্য অথবা মাদ্রাজ হইতে বোধ হয় তামা আমদানী করা হইত। প্রত্নবিভাগের রাসায়নিক পরীক্ষক মহাশয় অনুমান করেন, ইহা হয়ত রাজপুতানা, বেলুচিস্তান অথবা পারস্য দেশ হইতে আনীত হইয়াছিল। মোহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত তামার গুণ বিশিষ্ট তামা আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, রাজপুতানা এবং হাজারিবাগেও দেখিতে পাওয়া যায়। তামা দিয়া যুদ্ধপ্রহরণ, যথা বর্শা, ছুরি, খড়্গ, কুঠার এবং নানা প্রকারের গৃহস্থালীর দ্রব্য ও অলঙ্কার, যথা বাসন-কোসন, বাটালি, পাত্র, বলয়, কানবালা, আংটি, মেখলা প্রভৃতি তৈরী হইত।

টিন

পৃথক্ ভাবে টিন মোহেন্-জো-দড়োতে পাওয়া যায় নাই। ইহা তামার সঙ্গে মিশ্রিতভাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

তামা ও টিনের সংমিশ্রণে ব্রোঞ্জ্ নামক নূতন ধাতুর সৃষ্টি হয়। ইহা তামার চেয়ে বেশী শক্ত। মোহেন্-জো-দড়োর ব্রোঞ্জে টিনের পরিমাণ শতকরা ৬ হইতে ১৩ ভাগ। তামা দিয়া পূর্ব্বে যে-সব জিনিষ প্রস্তুত হইত সেই সব—এমন কি ধারাল অস্ত্রশস্ত্রও—পরে এই ব্রোঞ্জ্ দিয়া নির্ম্মিত হইতে লাগিল।

কিন্তু টিন সহজলভ্য নয় বলিয়া ব্রোঞ্জ্ মোহেন্-জো-দড়ো এবং হরপ্পাতে বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। খাঁটী তামার দ্রব্যাদিই পরবর্ত্তী কালেও বহুল পরিমাণে চলিয়াছিল। ব্রোঞ্জ্ ছাড়া তামা ও আর্সেনিকের সংমিশ্রণে ব্রোঞ্জ্ অপেক্ষা একটু নরম অন্যতম মিশ্রিত ধাতুর ব্যবহারও মোহেন্-জো-দড়োতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মিশ্রধাতুতে আর্সেনিকের পরিমাণ শতকরা ৩ হইতে ৪½ ভাগ।

মোহেন্-জো-দড়োতে প্রস্তর অত্যন্ত বিরল। এ স্থানের সন্নিকটে কোথাও প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায় না। গৃহাদি-নির্ম্মাণ এবং আসবাবপত্রের জন্য পাথর অন্য স্থান হইতে আমদানী করা হইত। সিন্ধুতীরবর্ত্তী সাক্কর (Sukkur), কির্থার-পর্ব্বতমালা, কাঠিয়াওয়াড় ও রাজপুতানা প্রভৃতি স্থান হইতে সময়ে সময়ে নানা প্রকার পাথর সংগৃহীত হইত। পাথর যে দুষ্প্রাপ্য ছিল ইহা প্রাচীন কালের একটি যোড়া-দেওয়া পাত্র হইতেই সম্যক্ উপলব্ধি করা যায়। সাধারণ পাথর দিয়া শিল-নোড়া, পাশা, ওজন, দ্বার-কোঠর (door-socket); চকমকি পাথর (chert) দিয়া ওজন, পালিশের যন্ত্র, ছুরি; সোপস্টোন (soap-stone) বা নরম পাথর দিয়া মূর্ত্তি ও শীলমোহর ইত্যাদি; পীতবর্ণ জৈসলমীর পাথর দিয়া মূর্ত্তি, পূজার লিঙ্গ ও পট্ট প্রস্তুত হইত। চূণা পাথর ও স্লেট পাথর নানারূপ পাত্র, মুষল. ও লম্বা ওজনের (cylindrical weight) জন্য ব্যবহৃত হইত। নরম শ্বেত পাথর (alabaster) দিয়া জাফরির কাজ, নানারূপ পাত্র ও ছোটখাটো মূর্ত্তি প্রভৃতি তৈরী হইত। অপেক্ষাকৃত মূল্যবান্ পাথর যেমন স্ফটিক, আকীক (agate), ক্যাল্সিডনি (chalcedony), লাল আকীক (carnelian), জ্যাস্পার (jasper) ইত্যাদি দিয়া মালার দানা ও অন্যান্য অলঙ্কার-পত্র প্রস্তুত হইত। অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের মধ্যে গেরিমাটী, সবুজমাটী প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়।

অন্যান্য জিনিষের মধ্যে অস্থি, হস্তিদন্ত, ঝিনুক, ফায়েন্স (faience) বা চীনামাটীর অনুরূপ পোড়ামাটী, এবং কাচজাতীয় বস্তু (vitrified paste) প্রচলিত ছিল।

মোহেন্-জো-দড়োতে সূতাকাটার যে বিশেষ প্রচলন ছিল, তাহা মাটী, শঙ্খ কিংবা ফায়েন্স-নির্ম্মিত নানা প্রকারের অসংখ্য টেকো এবং ভূগর্ভ হইতে লব্ধ পাঁচ হাজার বৎসরের পুরাতন কার্পাস-সূতা হইতে সহজেই অনুমিত হয়।

পোষাক-পরিচ্ছদ ও সাজ-সজ্জা

এখানে নানাজাতীয় লোক বাস করিত। তাহাদের অস্থিকঙ্কাল প্রভৃতির দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদও যে বিভিন্ন ছিল, এই বিষয়ে সন্দেহ করার কারণ নাই। ইহা প্রমাণ করার পক্ষে বর্ত্তমানে আমাদের হাতে যথেষ্ট উপাদান নাই; তবে দুইটি প্রাপ্ত মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই পুরুষেরা বামস্কন্ধের উপর বেষ্টন করিয়া ডান হাতের নীচে দিয়া উত্তরীয় বা শাল ব্যবহার করিত। পরবর্ত্তী কালের বৌদ্ধযুগের মূর্ত্তিতে এই প্রণালীতে উত্তরীয় পরিধানের প্রথা দেখা যায়। মোহেন্-জো-দড়োতে কাপড় পরার নমুনা ভাল করিয়া বুঝা যায় না। পোড়া মাটীর পুরুষ মূর্ত্তিগুলিকে মস্তকাভরণ ও অন্য সামান্য অলঙ্কার ছাড়া প্রায় নগ্ন অবস্থায় দেখা যায়। তবে এইগুলি দেখিয়া মোহেন-জো-দড়োর জনসাধারণও নগ্ন অবস্থায় থাকিত বলিয়া ধারণা করা ভ্রান্তিপূর্ণ হইবে। যে জাতি সভ্যতার এত উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারিয়াছিল এবং সূতা-কাটা ও কাপড়-বোনা জানিত তাহাদের নিজেদের বিষয়ে এরূপ ধারণা করা ভ্রমাত্মক হইবে। পোড়া মাটীর স্ত্রীমূর্ত্তি মাতৃকামূর্ত্তি কিংবা শক্তিময়ী মাতৃদেবীর (Mother Goddess) প্রতীক বলিয়া মনে হয়। ইহাদের কটিবন্ধে এক টুকরা বস্ত্র প্রদর্শিত রহিয়াছে। ব্রোঞ্জ্-নির্ম্মিত নানা আভরণ-সজ্জিত নর্ত্তকীমূর্ত্তিটি নগ্ন অবস্থাতেই পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, নর্ত্তকীরা নাচের সময়ে গহনাপত্র ছাড়া অন্য কোন পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিত না। তবে বাহিরে যাওয়ার সময়ে হয়ত তাহারা নগ্ন অবস্থায় বাহির হইত না। এই অনুমানের উপর এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, এই ব্রোঞ্জ্ নর্ত্তকী যদিও আমরা নগ্ন অবস্থায় দেখি, তথাপি ইহা যে তখনকার দিনের নর্ত্তকীদের অবিকল প্রতীক সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। নগ্ন মূর্ত্তি ও চিত্র সভ্যজগতের বহু স্থানে পুরাতনকাল হইতে আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত শিল্পীর হাত দিয়া রূপ পাইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে ও বর্ত্তমান কালে ইউরোপেও ভাস্কর্য্য

ও চিত্রকলায় বহু শ্রেষ্ঠ শিল্পীর তৈরী অনেক নগ্নমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সব দেখিয়াই সামাজিক বস্ত্র-ব্যবহারের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না। এই সম্পর্কে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে অধুনা রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি যে সব দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি কিংবা অন্য মূর্ত্তি পূজা বা অলঙ্করণের জন্য প্রস্তুত হয় সেগুলিতে শিল্পীরা বস্ত্রপরিহিত অবস্থা প্রদর্শন করেন না। তারপর গৃহস্বামীরা ঐসব মূর্ত্তিকে কাপড়চোপড় গহনাপত্র পরাইয়া সাজাইয়া রাখেন। ঐ মূর্ত্তিগুলি যদি মাটীর নীচে হইতে পাঁচ শত বৎসর পরে উঠাইয়া নগ্ন অবস্থায় পাওয়া যায় তবে বর্ত্তমান যুগের জনসাধারণ কিংবা ইহার এক শ্রেণীর উপর নগ্নতার অপবাদ দেওয়া সমীচীন হইবে না।

পুরুষদের মধ্যে কেহ কেহ দাড়ি-গোঁফ রাখিত, আবার কেহ কেহ প্রাচীন আক্কাদ-(মেসোপটেমিয়া)বাসী শেমীয়জাতির মত উপরের ওষ্ঠ কামাইয়া ফেলিত। মাথার চুল লম্বা করার নিয়ম ছিল। ঐগুলি পশ্চাদ্দিকে সুন্দর খোঁপায় বিন্যস্ত করা হইত।[১]

মস্তকের সম্মুখদিকে চুলের উপর সোনার কিংবা সূতার ফিতা বা বেষ্টনী থাকিত। এইরূপ স্বর্ণ-বেষ্টনী মোহেন্-জো-দড়োতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। চুলগুলিকে টুপীর মত সাজাইয়া পশ্চাদ্দিকে খোঁপায় বিন্যস্ত করার নিয়মও পোড়ামাটীর পুতুলে দেখিতে পাওয়া যায়।

চুলের বেণী বাঁধিয়া শিথিল ভাবে কবরী-বিন্যাসের প্রমাণও নর্ত্তকী মূর্ত্তি হইতে পাওয়া যায়। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কিংবা উষ্ণীষতুল্য বা বাটীর মত খোঁপাও সিন্ধুতীরবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। মুক্তকেশে কিংবা বেণীবিন্যাস করিয়া থাকার রীতিও নারীজাতির মধ্যে বর্ত্তমান ছিল।

১ মোহেন্-জো-দড়োর সুপ্রাচীন অধিবাসীদের ন্যায় লম্বা চুল রাখার প্রথা এখনও সিন্ধুপ্রদেশের বর্ত্তমান অধিবাসীদের অনেকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

গহনাপত্র

কালানুযায়ী মূল্যবান্ গহনাপত্র সকলেরই খুব আদরের সামগ্রী, বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির।

মোহেন্-জো-দড়ো-বাসীদের নিকট গহনাপত্র বিশেষ আদরের সামগ্রী ছিল। হার, চুলের ফিতা, বলয় ও আংটি স্ত্রীপুরুষ উভয় জাতিই ব্যবহার করিত। মেখলা, কানের দুল বা কানবালা, পায়ের মল ইত্যাদি স্ত্রীলোকদের ব্যবহার্য্য ছিল। ধনী লোকদের গহনা সাধারণতঃ সোনা, রূপা, ফায়েন্স, গজদন্ত ও মূল্যবান্ পাথর দিয়া তৈরী হইত। দরিদ্রের গহনাপত্র শাঁখা, হাড়, তামা, ব্রোঞ্জ্ এবং পোড়ামাটী দিয়া প্রস্তুত হইত। মেখলাগুলিতে লম্বা নলের মত মালার লহর থাকিত। ঐ লহরগুলি তামা কিংবা ব্রোঞ্জের ফাঁড়ির (spacer) ভিতর দিয়া প্রবেশ করাইতে হইত এবং উভয় সীমান্তে দুইটি মুখসাজ (terminal) থাকিত।)

কণ্ঠহারের অসংখ্য ছিন্ন অংশ পাওয়া গিয়াছে। এইগুলির মধ্যে নানাপ্রকারের লম্বা ও গোল দানা দেখিতে পাওয়া যায়। এইখানে সচরাচর যে সব মালা দেখা যায় তন্মধ্যে লম্বা নলাকৃতি (barrel-shaped), গোলাকার, দন্তরচক্র (cog-wheel) ইত্যাদি নমুনাই প্রধান ভাবে উল্লেখযোগ্য। এইগুলি সোনা, রূপা, তামা, ব্রোঞ্জ্, শাঁখা, হাড়, পালিস পাথর, কাচজাতীয় মণ্ড (paste) এবং পোড়ামাটী প্রভৃতি দ্বারা তৈরী হইত। উজ্জ্বল মূল্যবান্ পাথর দিয়া সময় সময় যে মালা প্রস্তুত হইত তাহার দৃষ্টান্তও ভূরি ভূরি আছে।

বলয় সাধারণতঃ তামা, ব্রোঞ্জ্, শাঁখা, ফায়েন্স ও পোড়ামাটী দিয়া তৈরী হইত। বলয় বোধ হয় এক হাতে (বাম হাতে) বাহু হইতে কব্জি পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইত। এখানে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জ্-নির্ম্মিত নর্ত্তকীমূর্ত্তি হইতেই ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায়। এখনও ভারতবর্ষে গুজরাট ও রাজপুতানার কোন কোন স্থানে স্ত্রীলোকদিগকে এরূপ ভাবে বলয় কিংবা চুড়ি পরিতে দেখা যায়।

শৈশবে কোন কোন পল্লীগ্রামে চামার জাতীয় স্ত্রীলোকদের হাতে বহুসংখ্যক চুড়ি দেখিতাম। ইহারা বিহার কিংবা উত্তর প্রদেশ হইতে আগত। হাতের কব্জি হইতে কনুই পর্য্যন্ত ইহারা চুড়ি পরিয়া থাকিত, বগল পর্য্যন্ত নয়।

আংটিগুলি খুব সাধারণ রকমের ছিল। তামা, রূপা প্রভৃতি আংটি-তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হইত।

যান-বাহন

মোহেন্-জো-দড়োর দ্বিচক্র-বিশিষ্ট ক্ষুদ্র "মৃচ্ছকটিকা" (মাটীর গাড়ী) ও হরপ্পার তাম্র শকটিকা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে এখানে বর্ত্তমান যুগে প্রচলিত দুই চাকার গরুর গাড়ী ও এক্কা গাড়ীর মত যানই সুপ্রাচীনকালেও প্রচলিত ছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাল আমদানী-রপ্তানির জন্য সিন্ধুতীরবাসীরা উট, ঘোড়া ও গাধার সাহায্য লইত বলিয়া ডাঃ হুইলার মনে করেন।[১] যদিও সুদূর অতীতে অশ্বের অস্তিত্বের প্রমাণ এখানে পাওয়া যায় নাই, তথাপি বেলুচিস্তান প্রভৃতি দেশে ঐ যুগেও অশ্বের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় বলিয়া তিনি অনুমান করেন যে এখানেও অশ্ব বিদ্যমান ছিল। জলপথেও যাতায়াত এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য চলিত। তাহা নৌকার সাহায্যে সম্পন্ন হইত।

অস্ত্রশস্ত্র

অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে কুঠার, বর্শা, খড়্গ, তীর, ধনুক, মুষল ও বাঁটুল (sling) দেখিতে পাওয়া যায়। তরবারি তখন এদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া কোন প্রমাণ প্রথমে পাওয়া যায় নাই। আত্মরক্ষার জন্য কবচ, শিরস্ত্রাণ ও জঙ্ঘাত্রাণ কিংবা অন্য কিছুর চিহ্ন বর্ত্তমান নাই। দন্তুর বর্শা (টেঁটা), লম্বা কুঠার ও তরবারি গঙ্গাযমুনা-উপত্যকায় ও

১ Wheeler—Indus Civilisation, page 60

মধ্যপ্রদেশের গাঙ্গেরিয়া প্রভৃতি স্থানে খুব প্রসার লাভ করিয়াছিল। সিন্ধু-সভ্যতার যুগে এইপ্রকার দস্তুর বর্শার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় না, কিন্তু তরবারি যে ব্যবহৃত হইত তাহার প্রমাণ এখানে কয়েক বৎসর খননের পর আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১] সিন্ধু-উপত্যকায় সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর কুঠার দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার দেখিতে খর্ব্বাকৃতি কিন্তু খুব পুরু ও চওড়া। দ্বিতীয় প্রকার কুঠার দেখিতে লম্বা ও অপেক্ষাকৃত সরু।

বর্শাগুলি আদিম যুগের মত পাতলা এবং চওড়া। এইগুলির মধ্যভাগে কোনও শিরা (midrib) নাই। গর্ত্তের পরিবর্ত্তে ইহাতে হাতল লাগাইবার লম্বা লেজ ছিল। ডাঃ ম্যাকে দেখাইয়াছেন ইজিপ্ট ও সুমেরে খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ অব্দের পূর্ব্বেই বল্লমে মধ্য শিরা ও গর্ত্তের উদ্ভাবন হইয়াছিল।

তামা কিংবা ব্রোঞ্জ্ দিয়া সূক্ষ্ম তীরের ফলা প্রস্তুত করা হইত।

এখানে তিন প্রকারের মুষল দেখিতে পাওয়া যায়। পাথর কিংবা তামা দিয়া ঐগুলি নির্ম্মিত হইত। এই তিন প্রকারের মধ্যে নাশপাতির আকৃতি-বিশিষ্ট মুষলই বহুল পরিমাণে দেখা যায়।

বাঁটুল বা ফিঙ্গার গুলি বা গুটিকা গোল কিংবা ডিম্বাকার হইত।

গৃহের দ্রব্য-সম্ভার ও তৈজসপত্র

নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যসম্ভারের মধ্যে পাথর, ধাতু ও মাটীর জিনিষই প্রধান। চক্‌মকি পাথরের ছুরি, পাথরের কুঠার ও পাথরের হলমুখ (plough share) দেখা যায়। থালা, বাটী, পাত্র, প্রসাধন-পেটিকা, পালিস যন্ত্র, রংদানি (palette) এবং ওজন প্রভৃতি পাথর দিয়া তৈরী হইত। এইসব সাধারণতঃ নরম মর্ম্মর (alabaster), চূণা পাথর কিংবা শ্লেট পাথর দিয়া প্রস্তুত হইত।

১ Mackay—Futher Excavations at Mohenjodaro (F. E. M.) vol. II pls. cxiii, 3; cxviii, 9; cxx. 17.

ওজন

এখানকার ওজন সাধারণতঃ চক্‌মকি পাথরের। এইগুলি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায় প্রায় সমান। চক্‌মকি পাথর খুব শক্ত ও সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না বলিয়া ওজন প্রস্তুত করার পক্ষে উপযুক্ত। কাল ধূসর শ্লেট পাথরের লম্বা (barrel-shaped) ওজন এলাম-দেশের (Elam) ও মেসোপটেমিয়ার (Mesopotamia) মত এখানেও পাওয়া যায়। বড় বড় ওজনগুলি মন্দিরাকৃতি এবং এইগুলির নেমিতে রজ্জু দিয়া ঝুলাইবার জন্য ছিদ্র থাকিত। মিঃ হেমি-র (Mr. Hemmy) মতে এই ওজনগুলি এলাম ও মেসোপটেমিয়ার ওজন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও নির্ভুল। এইগুলির পরিমাণ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় সুসার (Susa) ওজনের মত প্রথমতঃ দ্বিগুণিত—যথা ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ৬৪, কিন্তু তৎপরে দশগুণোত্তর—যথা ১৬০, ২০০, ৩২০, ৬৪০, ১৬০০ ইত্যাদি। সর্ব্বসাধারণ পরিমাণ ১৬=১৩·৭১ গ্রাম কিংবা ২১১·৫ গ্রেনের সমান।

মাপকাঠি

এখানে দৈর্ঘ্য মাপিবার জন্য বোধ হয় দুই প্রকার কাঠি ব্যবহার করা হইত। একপ্রকার ছিল বর্ত্তমান ফুটের মত। প্রায় ১৩·২ ইঞ্চি লম্বা ; অন্য প্রকার ছিল হাতের মত প্রায় ২০·৫ ইঞ্চি। এই মাপের একক আবার দশমিকে বিভক্ত ছিল বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। ফুটের মত মাপ প্রাচীন মিশরে এবং ইংলণ্ডে মধ্যযুগে প্রচলিত ছিল। পক্ষান্তরে হাতের মাপ বেবিলোন, এশিয়া মাইনর এবং মিশর প্রভৃতি স্থানে ব্যবহৃত হইত।[১]

ধাতু, ফায়েন্স ও মৃৎ-পাত্র

ধাতুপাত্র মোহেন্-জো-দড়োতে সংখ্যায় খুব কম। অঙ্গরাগ-দ্রব্য

১ Wheeler—Ind. Civil., pp 61-62

রাখার জন্য ছোটখাটো পাত্র তৈরী করিতে ফায়েন্স ব্যবহার করা হইত। অবশিষ্ট দ্রব্যের শতকরা নিরানব্বইটি মৃন্ময়। মৃন্ময় পাত্রের মধ্যে নৈবেদ্য-পাত্র (offering stand), গেলাস, মালসা, ডাবর, পেয়ালা, বাটী, থালা, গামলা, কড়া, রেকাবি, শরা, ছোট ভাঁড়, হাতা, পাত্রাধার, উত্তাপক যন্ত্র (চুল্লী) (heater), মট্‌কী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

উৎসর্গ-পাত্র বা নৈবেদ্য-পাত্র হয়ত দেবতার কিংবা মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে বলি বা উপহারের জন্য ব্যবহৃত হইত। মেসোপটেমিয়াতেও এই উদ্দেশ্যেই ইহা ব্যবহৃত হইত। মোহেন্‌-জো-দড়ো ও হরপ্পাতে বড় পেয়ালাগুলির সংখ্যা হাজার হাজার; কূপ কিংবা ঢাকা নর্দ্দামা অথবা রাস্তার পাশে এইগুলি স্তূপাকারে পড়িয়া আছে। ইহাতে মনে হয় এইগুলি পানপাত্ররূপে ব্যবহৃত হইত, এবং আজকালও যেমন মাটীর পাত্র হিন্দুরা একবারের বেশী পানাহারের জন্য ব্যবহার করেন না, তৎকালেও বোধ হয় এই প্রথাই ছিল। সম্ভবতঃ উৎসবাদি-উপলক্ষে আমন্ত্রিতদের প্রত্যেককে একটি করিয়া পানপাত্র দেওয়া হইত। সেই জন্যই এইগুলি এত অধিক সংখ্যায় স্থানে স্থানে দেখা যায়।

উত্তাপকে বা চুল্লীতে অসংখ্য ছিদ্র রহিয়াছে। স্যর অরেল্‌ স্টাইন বেলুচিস্তানে এরূপ কয়েকটি নমুনা পাইয়াছেন। সেগুলির ভিতরে ছাই লাগিয়া আছে। ইহাতে প্রমাণ হয় ঐগুলি চুল্লী ছিল। কিন্তু ঐগুলি ছাঁক্‌নি বা ঝাঁজর ছিল বলিয়াও অনেকে অনুমান করেন।

বড় বড় মৃদ্‌ভাণ্ডগুলিকে তুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। এক শ্রেণী তৈল, জল ও শস্যাদির ভাঁড়ার বা আধার হিসাবে ব্যবহৃত হইত এবং অন্যশ্রেণী মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রেত-বলির নিমিত্ত প্রদত্ত হইত।

চিত্রকলা

মোহেন্‌-জো-দড়ো ও হরপ্পার মৃৎপাত্র চক্রনির্ম্মিত এবং খুব মসৃণ। কোন কোন পাত্রের গায়ে নানারূপ চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। পোড়া পাত্রের গায়ে গাঢ় লালের উপর কাল রংয়ের জ্যামিতিক চিত্র, যথা—

অন্যোন্যচ্ছেদক বৃত্ত (intersecting circles), ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, পাত্র, বলয়, চিরুনি, মৎস্যশল্ক, বৃক্ষ, লতা, পাতা, কলাগাছ ইত্যাদি আঁকা আছে। বন্যছাগ ব্যতীত জীবজন্তুর ছবি খুব কম ; যাহা আছে, তাহা বেলুচিস্তান হইতে আমদানী হইয়াছে বলিয়া স্যর্ জন্ মার্শাল অনুমান করেন। লালের উপর কাল চিত্র পূর্ব্ব-বেলুচিস্তান ও সিন্ধু-উপত্যকা এই উভয় স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মোহেন্-জো-দড়োর চিত্র স্থূল এবং অপরিপক্ক। পক্ষান্তরে বেলুচিস্তানের চিত্র সূক্ষ্ম ও সুন্দর। মোহেন্-জো-দড়োর মৃৎশিল্প তেমন উন্নত প্রণালীর নয়। এই অপরিপক্ক শিল্প দেখিয়া যদি কেহ ইহা খুব আদিম সভ্যতার সূচক বলিয়া মনে করেন তবে ভুল হইবে। ইহা শিল্পী-বিশেষের অ-পার-দর্শিতা বলিয়াও মনে করা যায় না। কারণ মোহেন্-জো-দড়োর মৃৎপাত্র সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্ব-নিম্ন স্তরে অবিকল এক রকম। ইহাতে বুঝা যায় এখানকার মৃৎশিল্প শত শত বৎসর যাবৎ সমানভাবে চলিতেছিল এবং সেইজন্যই নমুনার কোন পরিবর্ত্তন বা উন্নতি সাধিত হয় নাই। লালের উপর কাল চিত্র ছাড়া (১) কাচের মত উজ্জ্বল, (২) ক্ষোদিত এবং (৩) বহু বর্ণ বিশিষ্ট মৃৎপাত্রও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। মৃৎপাত্রে বহু বর্ণের সমাবেশ-প্রণালী এখানে বড়ই চমৎকার। পীতাভ রংয়ের উপর কাল এবং লাল রং করা হইত। নানারূপ রঞ্জন-প্রণালী বেলুচিস্থান কিংবা মেসোপটেমিয়াতেও ছিল ; কিন্তু এই বর্ণবিন্যাস ঐ সব হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আর মাটী পোড়াইয়া কাচের মত করিয়া বর্ণবিন্যাস-প্রণালী মোহেন্-জো-দড়োর যুগে পৃথিবীর অন্য কোথায়ও জ্ঞাত ছিল না। কাচবৎ মাটীর উপর নিপুণ রঞ্জন-কৌশল ঐ যুগে একমাত্র সুসভ্য সিন্ধুতীর-বাসীদেরই জানা ছিল। সেইজন্য ইহা পৃথিবীর প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মনে বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে।

অন্যান্য গৃহসামগ্রীর মধ্যে টাকুয়া বা টেকো (শঙ্খ, ফায়েন্স ও মৃত্তিকা-নির্ম্মিত), গাত্রমার্জ্জনী (flesh rubber), কুম্ভকারের পিটনী

(dabber), পিঠার ছাঁচ, ঢাকনা ও পুতুল দেখিতে পাওয়া যায়। সূচ, চুলের কাঁটা, চিরুনি, অঞ্জন-শলাকা ও গৃহের সাজসজ্জার উপকরণ প্রভৃতির জন্য হাড়, শাঁখ ও হাতীর দাঁত; এবং মূল্যবান্ বাসন-কোসন, কুঠার, করাত, ছুরি, বাটালি, ক্ষুর, চুলের কাঁটা, সূচ, বেধনী (awl) ও বড়্শি প্রভৃতির জন্য তামা ও ব্রোঞ্জ্ ব্যবহার করা হইত। বড়লোকের বাড়ীতে কাঠের কিংবা বেতের চেয়ার এবং টেবিল ছিল বলিয়া মনে হয়; কারণ সৈন্ধবলিপির মধ্যে শ্রীযুক্ত স্মিথ্ ও গ্যাড্ উক্ত উভয় চিহ্ন আবিষ্কার করিয়াছেন। শিশুদের খেলনার মধ্যে ঝুমঝুমি, বাঁশী, পাখার খাঁচা, স্ত্রী-পুরুষের মূর্ত্তি, পশুপক্ষী ও গাড়ী প্রভৃতি সামগ্রী উল্লেখযোগ্য। ঐগুলি পোড়া মাটীর তৈরী। 'মৃচ্ছকটিকা' বা মাটীর গাড়ী সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে ইহা ভারতীয় চক্রযানের প্রথম নিদর্শন। এইরূপ গাড়ী উর-এর (Ur) (মেসোপটেমিয়া ৩২০০ খ্রীঃ পূঃ) এক প্রস্তরফলকে অঙ্কিত আছে। প্রাচীন আনাউ-এর (Anau) চক্রচতুষ্টয়-যুক্ত এক "মৃচ্ছকটিকায়"ও (wagon) এইরূপ নমুনা দেখা যায়। মোহেন্-জো-দড়োর মাটীর গাড়ীর সঙ্গে আধুনিক সিন্ধুদেশীয় যানের এবং হরপ্পার তাম্রনির্ম্মিত ক্রীড়াশকটিকার সঙ্গে তত্রত্য এক্কার কোন প্রভেদ দেখা যায় না। খেলার জন্য তাহারা শক্ত ও নরম পাথরের ছোট গুলি (মার্বল) এবং পাশা [১] (অক্ষ) ব্যবহার করিত।

১ বেদেও অক্ষ বা দ্যূতক্রীড়ার ভূরি ভূরি উল্লেখ পাওয়া যায়। বেদে বর্ণিত অক্ষ বিভীতক-দ্বারা তৈরী হইত। কিন্তু মোহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত অক্ষ বা পাশা, পাথর কিংবা পোড়া মাটীর তৈরী। ইহারা প্রায়শঃ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায় সমান। 'দান' গণনার জন্য ইহার ছয় দিকে এক হইতে আরম্ভ করিয়া ছয় পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত থাকিত। বৈদিক আর্য্যদের সঙ্গে মোহেন্-জো-দড়োবাসীদের অক্ষক্রীড়া বিষয়ে সাম্য দেখা গেলেও উভয়ের অক্ষের আনুষঙ্গিক উপাদানে এবং ক্রীড়া-প্রণালীতে কোন পার্থক্য ছিল কিনা বলা কঠিন।

আজকাল ভারতবর্ষে লম্বাধরণের যে পাশা দেখিতে পাওয়া যায়, মোহেন্-জো-দড়োর পাশাগুলি ঠিক সেরূপ নয়। ঐগুলি অনেকটা আধুনিক বিলাতী পাশার মত। মাটী, শাঁখ ও পাথরের তৈরী ছোট শিবলিঙ্গের মত অসংখ্য দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়। ঐগুলি পাশা কিংবা দাবা জাতীয় খেলার[১] গুটিকারূপে ব্যবহৃত হইত বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। আবার স্যর্ জন্ মার্শাল্ মনে করেন মূলতঃ ঐগুলি বড় বড় শিবলিঙ্গের ক্ষুদ্র সংস্করণ, এবং শরীরে মাতুলির মত ব্যবহৃত হইত।[২]

শিল্প ও ললিতকলা

শিল্প ও ললিতকলার প্রচুর উপাদান যদিও এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই তথাপি নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ-পত্র এবং খেলনা প্রভৃতি হইতে ইহার একটু আভাস পাওয়া যায়। সিন্ধুতীর-বাসীদের ঘরগুলি খুব সাদা-সিধে ধরণের ছিল। তবে আভিজাত্য-সূচক

১ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে "চতুরঙ্গ" ক্রীড়ার উল্লেখ আছে। ইহা বোধ হয় পাশা-যুক্ত দাবা খেলারই নামান্তর। ইহাতে যুদ্ধের অনুকরণে উভয় পক্ষে গজ, অশ্ব রথ ও পদাতি এই চারি-অঙ্গ-বিশিষ্ট সৈন্য লইয়া খেলা হইত। এই খেলার ছকেব নাম ছিল 'অষ্টাপদ'; কারণ ঐ ছকে প্রতি দিকে আটটি করিয়া সমগ্রে (৮×৮) চৌষট্টিটি ঘর থাকিত। মোহেন্-জো-দড়োতে খেলার ছক আধুনিক দাবা বা শতরঞ্চ খেলার ছকের মত ছিল বলিয়া মনে হয়, কারণ মৃৎপাত্রেব গায়ে দাবাব ছকের অনুকরণে চতুষ্কোণ ঘর অঙ্কিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐগুলির মধ্যে অবিকল আধুনিক ছকের মত পর্য্যায় ক্রমে সাধারণতঃ একটি সাদা ঘরের পর একটি ঘর চিত্রিত রহিয়াছে।

প্রাচীন ভারতের চতুরঙ্গ খেলার বিষয় 'চতুরঙ্গ-দীপিকা' প্রভৃতি সংস্কৃত-গ্রন্থে বর্ণিত আছে। শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী লিখিত **Sanskrit works on the game of chess** (I. H. Q., XIV. 75-9) দ্রষ্টব্য।

২ M. I. C., Vol I, p. 39.

স্নানাগার, পয়ঃপ্রণালী, বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ও সন্তরণবাপী প্রভৃতি ছিল। পোষাক-পরিচ্ছদের জন্য সূতার কাপড়, মাথার ফিতা, গলার হার, গায়ের শাল, হাতের চুড়ি ও আংটি ব্যবহৃত হইত।

নানারূপ কারুকার্য্যপূর্ণ গজদন্ত, অস্থি ও শঙ্খ-নির্ম্মিত চতুষ্কোণ ও নলাকৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক কাঠি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐগুলির কোন কোনটি দেখিতে বর্ত্তমানে বাংলা দেশের পল্লীগ্রামে প্রচলিত অস্থি-নির্ম্মিত পাশার মত। কিন্তু মোহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত কাঠির বিভিন্ন পার্শ্বদেশে ভিন্ন ভিন্ন চিহ্নের পরিবর্ত্তে একই নমুনা থাকায় ঐগুলিকে পাশা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। ঐগুলি বোধ হয় গৃহের সজ্জাদ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হইত।

সিন্দুক, পেটিকা ও অন্যান্য মনোরম কাষ্ঠ-দ্রব্যাদি খচিত করিবার জন্য শঙ্খ, শুক্তি, অস্থি ও গজদন্তের বৃত্ত, অর্দ্ধবৃত্ত, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, আয়ত, তির্য্যগ্-আয়ত, যব এবং পত্রাদির আকৃতি-বিশিষ্ট অনেক মসৃণ ছোটখাটো জিনিষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কেশবিন্যাসের জন্য গজদন্ত-নির্ম্মিত মনোরম চিরুনিও যে এখানকার লোকেরা ব্যবহার করিত তাহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। অলঙ্কার-পত্র জড়োয়া করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নানারূপ সুন্দর সুন্দর জিনিষও পাওয়া গিয়াছে। এই সব দ্রব্যে সিন্ধুতীর-বাসীদের অত্যন্ত মার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

ভাস্কর্য্য

ভাস্কর্য্যেও যে সিন্ধু-উপত্যকাবাসীরা যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিল তাহা ঐখানে লব্ধ চূণা পাথরের ত্রিপত্রযুক্ত উত্তরীয়-ধারী বৃহৎ যোগিমূর্ত্তি, উত্তরীয়-পরিহিত এক ধ্যানিমূর্ত্তি, শ্মশ্রু ও কবরী-বিশিষ্ট এক মস্তক এবং বৃষমূর্ত্তি প্রভৃতি হইতে প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী যুগের ভূমিস্পর্শ-মুদ্রাযুক্ত বুদ্ধমূর্ত্তিতে মোহেন্-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত উক্ত ভঙ্গিবিশিষ্ট উত্তরীয়পরিহিত প্রস্তরমূর্ত্তির প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়।

লিপি

। সিন্ধু উপত্যকার অক্ষর-মালা নানা প্রাণী ও বস্তুচিত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।। শীলমোহরে অক্ষর-পঙ্‌ক্তিতে মনুষ্য (যষ্টিধারী, ভারবাহী, তীর-ধনুকধারী, শৃঙ্খলিত, মল্ল, ক্রীড়ারত, চক্রারোহী প্রভৃতি), মৎস্য, হংস, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, পাতা, যব, চেয়ার, টেবিল, তীর, ধনুক, চক্র, মন্দির প্রভৃতি অঙ্কিত রহিয়াছে।। কোন কোন ক্ষেত্রে লেখার গতি বাস্তব চিত্র হইতে অবাস্তব ও সরল চিহ্নের দিকে অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়।। ঐ সময়কার আদি-এলাম (Proto-Elamitic), প্রাচীন সুমের, ক্রীত্ (Crete) ও মিসরের চিত্রলিপির সঙ্গে এই স্থানের লেখার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।। পোলিনেশিয়ার (Polynesia) ইষ্টার আয়ল্যাণ্ড্ (Easter Island) নামক দ্বীপের লেখার সঙ্গে এখানকার শতাধিক অক্ষরের হুবহু মিল আছে বলিয়া হাঙ্গেরী দেশীয় লেখক শ্রীযুক্ত হেভেশি (Hevesy) মত প্রকাশ করিয়াছেন।[১] ইষ্টার্ আয়ল্যাণ্ড্-(Easter Island)এর অক্ষর কাষ্ঠফলকের উপর ক্ষোদিত রহিয়াছে। কবে কাহার দ্বারা এই সব ক্ষোদিত হইয়াছিল কেহই কিছু বলিতে পারে না।• তত্রত্য আধুনিক অধিবাসীরা ঐ অক্ষরের অণু-মাত্রও বুঝিতে পারে না বলিয়া উক্ত লেখক মহাশয় মত প্রকাশ করিয়াছেন। এত দূরবর্ত্তী স্থানদ্বয়ের লেখার এই অদ্ভুত সাদৃশ্যের কোন সন্তোষজনক কারণ আজ পর্য্যন্ত কেহই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই; তবে ইষ্টার্ আয়ল্যাণ্ড্-(Easter Island)এর কাষ্ঠফলকের লেখা কয়েক শতাব্দীর বেশী প্রাচীন হইবে না। পক্ষান্তরে মোহেন্-জো-দড়োর লেখা প্রায় পাঁচ হাজার বৎসরের পুরাতন।। এত দীর্ঘকাল

১ "Sur une E'criture oce'anique paraissant d' Origine ne'olithique," par M. G de Hevesy. Extrait du Bulletin de "Societe Prehistorique," Francaise, Nos. 7-8, 1933.

পরে ইষ্টার্ আয়ল্যাণ্ডে (Easter Island) সিন্ধুতীরের অক্ষরমালার প্রচলন দেখিতে পাওয়া প্রত্নতাত্ত্বিকদের ভাবিবার বিষয়। মোহেন্-জো-দড়োর লেখা চিত্রমূলক হইলেও ইহাতে প্রকৃত চিত্র খুব অল্পই দেখা যায়; মৎস্য, মনুষ্য ও তার ধনুক, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি ছাড়া অন্য চিত্র বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। লিপিকুশলতা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া সুস্পষ্ট দেখা গেলেও মেসোপটেমিয়ার কীলকাকৃতি লিপির মত একেবারে অচলপ্রতিষ্ঠ (stereotyped) হয় নাই। এখানকার লেখা পাথরের শীল-মোহরে, তামার বা ব্রোঞ্জের ফলকে ও পোড়া মাটীর উপর শীলমোহরের ছাপে এবং মৃন্ময়পাত্রের গায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। হরপ্পাতে এই সকল বস্তু ও শক্ত চক্‌চকে মাটীর (vitrified clay) বলয়ে এই লেখা অঙ্কিত রহিয়াছে।

মেসোপটেমিয়ার মত এখানে মৃৎফলকে চিঠিপত্র ও দলিল লেখা হইত বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এখানে সম্ভবতঃ দৈনন্দিন লেখার জন্য ভোজপাতা (ভূর্জ্জপত্র), তালপাতা অথবা ইষ্টার আয়ল্যাণ্ডের মত কাঠ ব্যবহৃত হইত। এইগুলির প্রচলন থাকিলে সময়ের আবর্ত্তনের ফলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

শ্রীযুক্ত সিড্‌নী স্মিথ্ এবং শ্রীযুক্ত গ্যাড্ মোহেন্ জো-দড়োর অক্ষরমালায় ৩৯৬টি চিহ্ন রহিয়াছে বলিয়া তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা যে সর্ব্বতোভাবে নির্ভুল তাহা বলা যায় না। এই লেখার মধ্যে আমরা দেখিতে পাই একটি মূল চিহ্নকে সামান্য পরিবর্ত্তন-দ্বারা স্থানে স্থানে প্রয়োগ করা হইয়াছে, যথা—এক মৎস্য-চিহ্ন হইতে ইত্যাদি চিহ্নের উৎপত্তি হইয়াছে। এই শীল-মোহরের লেখায় সংযুক্ত বর্ণ আছে বলিয়া মনে হয়, যেমন ইত্যাদি একই নরচিহ্ন হইতে অন্যান্য চিহ্ন বা অক্ষরের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে।

স্থানে স্থানে অক্ষরের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরল রেখা দেখা যায়।

লিপি

। সিন্ধু উপত্যকার অক্ষর-মালা নানা প্রাণী ও বস্তুচিত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।। শীলমোহরে অক্ষর-পঙ্‌ক্তিতে মনুষ্য (যষ্টিধারী, ভারবাহী, তীর-ধনুকধারী, শৃঙ্খলিত, মল্ল, ক্রীড়ারত, চক্রারোহী প্রভৃতি), মৎস্য, হংস, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, পাতা, যব, চেয়ার, টেবিল, তীর, ধনুক, চক্র, মন্দির প্রভৃতি অঙ্কিত রহিয়াছে।। কোন কোন ক্ষেত্রে লেখার গতি বাস্তব চিত্র হইতে অবাস্তব ও সরল চিহ্নের দিকে অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়।। ঐ সময়কার আদি-এলাম (Proto-Elamitic), প্রাচীন সুমের, ক্রীত্ (Crete) ও মিসরের চিত্রলিপির সঙ্গে এই স্থানের লেখার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।। পোলিনেশিয়ার (Polynesia) ইষ্টার্ আয়ল্যাণ্ড্ (Easter Island) নামক দ্বীপের লেখার সঙ্গে এখানকার শতাধিক অক্ষরের হুবহু মিল আছে বলিয়া হাঙ্গেরী দেশীয় লেখক শ্রীযুক্ত হেভেশি (Hevesy) মত প্রকাশ করিয়াছেন।[১] ইষ্টার্ আয়ল্যাণ্ড্-(Easter Island)এর অক্ষর কাষ্ঠফলকের উপর ক্ষোদিত রহিয়াছে। কবে কাহার দ্বারা এই সব ক্ষোদিত হইয়াছিল কেহই কিছু বলিতে পারে না।। তত্রত্য আধুনিক অধিবাসীরা ঐ অক্ষরের অণু-মাত্রও বুঝিতে পারে না বলিয়া উক্ত লেখক মহাশয় মত প্রকাশ করিয়াছেন। এত দূরবর্ত্তী স্থানদ্বয়ের লেখার এই অদ্ভুত সাদৃশ্যের কোন সন্তোষজনক কারণ আজ পর্য্যন্ত কেহই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই; তবে ইষ্টার্ আয়ল্যাণ্ড্-(Easter Island)এর কাষ্ঠফলকের লেখা কয়েক শতাব্দীর বেশী প্রাচীন হইবে না। পক্ষান্তরে মোহেন্-জো-দড়োর লেখা প্রায় পাঁচ হাজার বৎসরের পুরাতন।। এত দীর্ঘকাল

১ "Sur une E´criture oce´anique paraissant d' Origine ne´olithique," par M. G. de Hevesy. Extrait du Bulletin de "Societe Prehistorique," Francaise, Nos. 7-8, 1933.

পরে ইষ্টার্ আয়ল্যাণ্ডে (Easter Island) সিন্ধুতীরের অক্ষরমালার প্রচলন দেখিতে পাওয়া প্রত্নতাত্ত্বিকদের ভাবিবার বিষয়। মোহেন্-জো-দড়োর লেখা চিত্রমূলক হইলেও ইহাতে প্রকৃত চিত্র খুব অল্পই দেখা যায়; মৎস্য, মনুষ্য ও তীর-ধনুক, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি ছাড়া অন্য চিত্র বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। লিপিকুশলতা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া সুস্পষ্ট দেখা গেলেও মেসোপটেমিয়ার কীলকাকৃতি লিপির মত একেবারে অচলপ্রতিষ্ঠ (stereotyped) হয় নাই। এখানকার লেখা পাথরের শীল-মোহরে, তামার বা ব্রোঞ্জের ফলকে ও পোড়া মাটীর উপর শীলমোহরের ছাপে এবং মৃন্ময়পাত্রের গায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। হরপ্পাতে এই সকল বস্তু ও শক্ত চক্‌চকে মাটীর (vitrified clay) বলয়ে এই লেখা অঙ্কিত রহিয়াছে।

মেসোপটেমিয়ার মত এখানে মৃৎফলকে চিঠিপত্র ও দলিল লেখা হইত বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এখানে সম্ভবতঃ দৈনন্দিন লেখার জন্য ভোজপাতা (ভূর্জ্জপত্র), তালপাতা অথবা ইষ্টার আয়ল্যাণ্ডের মত কাঠ ব্যবহৃত হইত। এইগুলির প্রচলন থাকিলে সময়ের আবর্ত্তনের ফলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

শ্রীযুক্ত সিড্‌নী স্মিথ্ এবং শ্রীযুক্ত গ্যাড্ মোহেন্-জো-দড়োর অক্ষরমালায় ৩৯৬টি চিহ্ন রহিয়াছে বলিয়া তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা যে সর্ব্বতোভাবে নির্ভুল তাহা বলা যায় না। এই লেখার মধ্যে আমরা দেখিতে পাই একটি মূল চিহ্নকে সামান্য পরিবর্ত্তন-দ্বারা স্থানে স্থানে প্রয়োগ করা হইয়াছে, যথা—এক মৎস্য-চিহ্ন হইতে ইত্যাদি চিহ্নের উৎপত্তি হইয়াছে। এই শীল-মোহরের লেখায় সংযুক্ত বর্ণ আছে বলিয়া মনে হয়, যেমন ইত্যাদি একই নরচিহ্ন হইতে অন্যান্য চিহ্ন বা অক্ষরের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে।

স্থানে স্থানে অক্ষরের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরল রেখা দেখা যায়।

স্বরবিন্যাস বা উচ্চারণ নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত ঐগুলির প্রয়োগ হইত বলিয়া মনে হয়। এই যুগের অন্যান্য দেশের লেখায়ও এই সংযোগ ও রূপান্তর-বিধান অল্প-বিস্তর দেখা যায়। কোন কোন শীলমোহরে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র রেখা ক্ষোদিত রহিয়াছে। ঐগুলি ঊর্দ্ধসংখ্যায় বারটি পর্য্যন্ত দেখা যায়। কেহ কেহ মনে করেন ঐগুলি সংখ্যাজ্ঞাপক; কিন্তু স্যর্ জন্ মার্শাল্ এই সকলকে সংখ্যা-জ্ঞাপকের পরিবর্ত্তে ধ্বনি-সূচক বলিয়া মনে করেন।[১] এই স্থানের লেখা সাধারণতঃ ডান হইতে বাম দিকে প্রচলিত ছিল; কিন্তু সময়ে সময়ে এক পঙ্‌ক্তি ডান হইতে বামে এবং পর পঙ্‌ক্তি বাম হইতে আরম্ভ করিয়া ডান দিকে লিখিত হইত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।[২] হরপ্পায় কাল মর্ম্মরের একটি শীলমোহরে তিনটি কিনারায় লেখা রহিয়াছে; প্রথমতঃ ঐ শীল-মোহরের উপরের দিকে বাম হইতে ডান সীমার শেষ পর্য্যন্ত এক পঙ্‌ক্তি লিখিত হইয়াছে। তারপর সেই লেখা বাদ দিয়া দ্বিতীয় পার্শ্ব ঘুরাইয়া বাম হইতে ডান দিকে পঙ্‌ক্তি আরম্ভ করিয়া শেষ সীমায় পুনরায় ইহার তৃতীয় পার্শ্ব ঘুরাইয়া বাম হইতে ডান দিকে লেখা হইয়াছে, যথা—
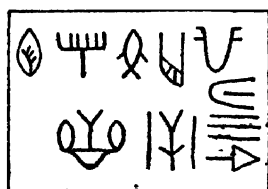
শীলমোহরের লেখা উল্টাভাবে ক্ষোদিত হইয়া থাকে সুতরাং শীলমোহরে বাম হইতে লেখা থাকিলে ছাপ দিলে ইহা ডান হইতে বাম দিকে পড়িতে হইবে। এই লেখায় যে রীতিমত একটা বর্ণমালার

১ M. I. C., Vol. I, p. 40

২ M.I.C., Vol. III, Pl. CIX, Seal No. 247

উদ্ভব হয় নাই ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। বর্ণমালার সৃষ্টি হইয়া থাকিলে এত অসংখ্য চিহ্নের আবশ্যকতা হইত না। এইগুলির মধ্যে কতকগুলি ধ্বনিব্যঞ্জক (phonetic) আর কতকগুলি ভাবব্যঞ্জক (ideogram) বলিয়া অনুমিত হয়।

এখানকার অক্ষরের সঙ্গে প্রাচীন সুমেরীয় (Sumerian), আদিম এলাম-বাসী, প্রাচীন ক্রীত্‌দ্বীপবাসী এবং হিটাইট্‌ (Hittite) জাতির চিত্রাক্ষরের যথেষ্ট সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। পোলিনেশিয়ার অন্তর্গত ইষ্টার্‌ আয়্‌ল্যাণ্ডের কাষ্ঠফলকাঙ্কিত অক্ষর এবং চীন দেশের চিত্রাক্ষরের এবং হাওয়াই (Hawai) দ্বীপের পর্ব্বতে প্রস্তরে ক্ষোদিত কতিপয় চিহ্নের সঙ্গেও মোহেন্‌-জো-দড়োর অক্ষরের মিল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয় উল্লিখিত নানাপ্রকার লেখার এবং মোহেন্‌-জো-দড়োর লেখার মূল হয়ত একই ছিল এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতি ইহা হইতে স্ব স্ব ভাষা প্রকাশের জন্য উপাদান সংগ্রহ করিয়া নিজের আবশ্যকতানুযায়ী পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন দ্বারা স্বীয় বর্ণমালার সৃষ্টি করিয়াছে। অধ্যাপক লাঙ্গ্‌ডন্‌ (Langdon) মনে করেন, মোহন্‌-জো-দড়োর অক্ষর হইতেই ব্রাহ্মী অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং উভয় অক্ষরের মধ্যে কতকটা সাদৃশ্য যে আছে ইহাও তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বহুবৎসর পূর্ব্বে স্যর্‌ আলেক্‌জেণ্ডার্‌ ক্যানিংহাম্‌ এই চিত্রলিখন হইতেই ব্রাহ্মী অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া সর্ব্বপ্রথম অনুমান করেন।[১] সিন্ধুতীরের অক্ষরের মধ্যে সংযুক্ত বর্ণের ব্যবহার ও উচ্চারণ-সৌকর্য্যার্থ চিহ্নাদির প্রয়োগ হইত বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। এইগুলি পরবর্ত্তী কালের ব্রাহ্মী অক্ষরের চিহ্নের মতই; ইহা দেখিয়া অবাক্‌ হইয়া যাইতে হয়। তবে উভয়বিধ অক্ষরের মধ্যে উচ্চারণের কোন সামঞ্জস্য আছে কিনা সিন্ধুলিপি পঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত বলা অসম্ভব। পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন

১ Cunningham, Corp. Ins. Ind., Vol. I, p. 52

প্রাগৈতিহাসিক মোহন-জো-দড়োর ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার কোন সম্পর্ক নাই; কারণ সিন্ধু-সভ্যতা প্রাগ্‌বৈদিক; সুতরাং ভাষাও প্রাগ্‌বৈদিক। এই ভাষা হয়ত প্রাচীন দ্রাবিড়জাতীয়; কারণ কেহ কেহ অনুমান করেন, বৈদিক ঋষিদের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে উত্তর-ভারতে দ্রাবিড়-ভাষা-ভাষী লোক বাস করিত এবং সম্ভবতঃ মোহেন্-জো-দড়োর এই অত্যুন্নত সভ্যতা তাহাদেরই কীর্ত্তিস্তম্ভ। /

দ্বিতীয়তঃ সিন্ধুদেশের অনতিদূরে বেলুচিস্তানে ব্রাহুই (Brahui) জাতির বাস; ইহাদের মধ্যে এখনও দ্রাবিড়ী ভাষার প্রচলন আছে। তাহাতে অনুমান হয় সিন্ধুপ্রদেশের অন্যান্য স্থানের দ্রাবিড়ী ভাষা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং পার্শ্ববর্ত্তী ব্রাহুই-দের মধ্যে ইহা চিহ্ন-স্বরূপ বাঁচিয়া আছে। অধিকন্তু দ্রাবিড়ী ভাষা সংযোগমূলক (agglutinative) এবং সুমের-বাসীদের ভাষাও সংযোগমূলক। কাজেই কেহ কেহ মনে করেন সুমেরের সংযোগমূলক ভাষার সাহায্যে সিন্ধু-সভ্যতার ভাষার রহস্যোদ্ঘাটনের চেষ্টা হয়ত বা ফলবতী হইতে পারে। যেহেতু এই উভয় জাতির মধ্যে অনেক বিষয়েই কৃষ্টিসাম্য বিদ্যমান ছিল, সুতরাং ভাষা-সাম্যের কল্পনা একেবারে অলীক না-ও হইতে পারে। কিন্তু এই সমস্তই অনুমানমাত্র। ইহাতে কোন সত্য নিহিত না-ও থাকিতে পারে। আবার কেহ কেহ সংস্কৃত পুরাণাদিতে বর্ণিত শ্রেষ্ঠ বীর ও দেবগণের নাম বাহির করিয়া শীলমোহরের লিপির ব্রাহ্মী বর্ণমালার সঙ্গে মিল রাখিয়া পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করিতে উপদেশ দিয়াছেন।[১] এই চেষ্টায় এখনও কেহ সফলকাম হইয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। এই চেষ্টা ফলবতী হইলে অক্ষরের ধ্বনি ঠিক হইবে এবং সহজেই ভাষাও ধরা পড়িবে।

চেকোস্লোভিকিয়ার প্রাগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হ্রোজ্‌নি (Hrozny) মনে করেন সিন্ধু-সভ্যতার লিপির অধিকাংশ চিহ্নই

১ Langdon, M. I. C., Vol. II, p. 43।

প্রাচীন হিটাইট (Hittite) জাতির শব্দবাচক হিরোগ্লিফিক্ (Hieroglyphic) লিপিমালার মত। ঐ জাতির কীলকলিপির (Cuniform) সঙ্গে এখানকার কোন কোন অক্ষরের সাদৃশ্য আছে বলিয়া তিনি মনে করেন। সিন্ধু সভ্যতার এই অজ্ঞাত-লিপি-নিহিত অজ্ঞাত ভাষা সম্বন্ধেও তিনি বলেন যে ইহাও ইন্দো-ইউরোপীয় (Indo-European) ভাষা হইতে উদ্ভূত এবং হিটাইট্ গোষ্ঠীর (Hittite Group) সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট।[১] তিনি আরও মনে করেন যে এই সকল শীলমোহরে আদি ভারতীয় (Proto-Indian) জাতির প্রধান প্রধান দেবদেবীর নাম লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ইহাদের নামের নমুনা হইতে তিনি অনুমান করেন যে সংস্কৃত ভাষাভাষী ভারতীয় আর্য্যজাতি অপেক্ষা কোন প্রাচীনতর আর্য্যজাতি দ্বারা এইগুলি নিৰ্ম্মিত এবং ব্যবহৃত হইত। এই সকল শীলমোহরের সাহায্যে খ্রীষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় সহস্রকে প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম্ম বিষয়ক ইতিহাসের উপর আলোকপাত হইবে বলিয়া তাঁহার ধারণা।[২]

আদি ভারতীয় একটি দেবতার নাম কুষি (অথবা কুষী) বলিয়া শীলমোহরে পড়িতে পারিয়াছেন বলিয়া তিনি মনে করেন।[৩]

প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় কূষুহ্, কূষহ্ অথবা কূষু, কুষ্ষি শব্দ চন্দ্র দেবতার জ্ঞাপক ছিল। তাঁহার মতে আদি ভারতীয় কুষি শব্দ বোধ হয় 'চন্দ্র' অর্থেই ব্যবহৃত হইত[৪]।

নর-কঙ্কাল

মোহেন্-জো-দড়োতে খননের পর নানা স্থানে গৃহাভ্যন্তর ও

১ Hrozny—Ancient History of Western Asia, India and Crete, page 73

২ Ibid, page, page 176

৩ Ibid, page 194

৪ Ibid, page 177

রাজপথ হইতে কয়েকটি নরকঙ্কাল ও নরকপাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্যর্ জন্ মার্শাল্-সম্পাদিত সুবৃহৎ পুস্তকে ঐগুলির সংখ্যা সর্ব্বসমেত ছাব্বিশটি বলিয়া ডাঃ গুহ এবং কর্নেল স্যুয়েল্ উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত পুস্তক লেখার পর আরও কয়েকটি নর-কঙ্কাল ও নর-করোটী আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই উভয় সংগ্রহ হইতে জানা যায় যে মোহেন্-জো-দড়োতে চারি জাতীয় লোকের বাস ছিল, যথা—(১) ককেশীয়[১] (Caucasic), (২) ভূমধ্যসাগরীয় (Mediterranean), (৩) আল্পীয় (Alpine) এবং (৪) মোঙ্গোলীয় (Mongolian)। এই বিষয়ে পরে বিশদভাবে আলোচনা করা যাইবে।

জীব-জন্তুর অস্থি

জীবজন্তুর মধ্যে কুকুরের মাথা ও হাড় পাওয়া গিয়াছে। পরীক্ষা-দ্বারা জানা গিয়াছে, মোহেন্-জো-দড়োর কুকুর ও তুর্কীস্তানের অন্তর্গত প্রাচীন আনাউ-নগরের কুকুরের মধ্যে জাতিসাম্য বহুল পরিমাণে বিদ্যমান ছিল।

কাল ইঁদুর, অশ্ব[২] (পরবর্ত্তী কালের) ও হস্তী প্রভৃতির অস্থি ও কঙ্কাল এবং ককুদ্বান্ ও অন্য জাতীয় বৃষের অস্থি, কঙ্কাল ও শৃঙ্গ, চারিজাতীয় হরিণের শৃঙ্গ, উষ্ট্রের ছিন্ন কঙ্কাল, শূকর, গৃহপালিত কুক্কুট, ঘড়িয়াল কুমীর প্রভৃতিরও অস্থি, দন্ত ইত্যাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

১ Census of India, 1931, Part III, pp. lxviii-lxix.—Guha. পূর্ব্বে ডাঃ গুহ এবং কর্নেল্ স্যুয়েল্ এই ককেশীয় জাতিকে আদি-অষ্ট্রেলীয় (Proto-Australoid) আখ্যা দিয়াছিলেন।—M. I. C., Vol. II, pp. 638 f.

২ আনাউ-নগরে প্রাপ্ত অশ্বের সঙ্গে এই অশ্বের সাদৃশ্য আছে বলিয়া ডাঃ গুহ এবং কর্নেল্ স্যুয়েল্ অনুমান করেন।—M. I. C., Vol. II. p. 653.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সময় ও অধিবাসী

আদিম যুগের মানুষ প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র ব্যবহার করিত। এই ব্যবস্থা বহু সহস্র বৎসর চলিল। ক্রমে শিল্প ও সৌন্দর্য্য-জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাথর পালিস করিয়া মানুষ ঐ সব প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে শিখিল। তারপর তামা, ও তামা গলাইয়া দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার প্রণালী আবিষ্কৃত হইল। এই তামা দিয়া যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র, আহারের বাসন-কোসন, প্রসাধনের ও সাজসজ্জার সামগ্রী প্রস্তরনির্ম্মিত দ্রব্যের অনুকরণেই প্রস্তুত হইতে লাগিল। প্রস্তর দৈনন্দিন ব্যবহার হইতে একেবারে লোপ পায় নাই অথচ তামার প্রচলন আস্তে আস্তে বাড়িয়া চলিয়াছে, এইরূপ সময়কে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা "তাম্র-প্রস্তর যুগ" (Chalcolithic Age) আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, ইজিপ্ত, মেসোপটেমিয়া, ক্রীত্, পারস্য প্রভৃতি দেশ প্রাচীনতায় মোহেন্-জো-দড়োর প্রায় সমসাময়িক ও সভ্যতায় সমকক্ষ। উল্লিখিত দেশসমূহও খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ ও তৃতীয় সহস্রকে তাম্রপ্রস্তর যুগের উন্নত প্রণালীর সভ্যতায় উদ্ভাসিত হইয়াছিল। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বেশ একটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। যথা—নাগরিক জীবনের উন্মেষ, অস্ত্রশস্ত্র, বাসন-কোসন ও হাতিয়ার নির্ম্মাণের জন্য তামা ও ব্রোঞ্জের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন যুগের প্রস্তরেরও অল্প-বিস্তর ব্যবহার ; কুম্ভকারের মৃচ্চক্রের আবিষ্কার ও তদ্দ্বারা উন্নত প্রণালীর মৃৎপাত্র-নির্ম্মাণ ; যাতায়াতের জন্য চক্রযানের আবিষ্কার ; পোড়া ইট ও শুষ্ক ইটের দ্বারা বন্যার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত উচ্চ মঞ্চের উপর গৃহনির্ম্মাণ ; লেখা-দ্বারা ভাব-প্রকাশের জন্য চিত্রাক্ষর-প্রয়োগ ; শত্রুকে আক্রমণ করার জন্য শেল (বর্শা), ছোরা, তীর ও ধনুক

প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তর কিংবা ধাতুনির্ম্মিত মুষলের ব্যবহার, ফায়েন্স (faience), শঙ্খ (shell) ও নানারূপ প্রস্তর-দ্বারা গহনা-নির্ম্মাণ; স্বর্ণকার-রৌপ্যকার প্রভৃতি শিল্পীর ব্যবসায়ের উন্নতি ইত্যাদি বিষয় তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতার সাধারণ প্রতীক বলিয়া সর্ব্বত্রই দৃষ্টিগোচর হয়। প্রাচীন দ্রব্য পরীক্ষা করিলেও দেখা যায় যে হরপ্পা ও মোহেন্‌-জো-দড়োর সমৃদ্ধির সময়ে অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ সহস্রকের শেষ ভাগে এলাম (প্রাচীন পারস্য), মেসোপটেমিয়া এবং সিন্ধু-উপত্যকার মধ্যে যেন একটা জীবন্ত আদান-প্রদানের ভাব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এই সামঞ্জস্যের মধ্যেও যেন মোহেন্‌-জো-দড়োর গৌরব ও বিশেষত্বটা ছিল বেশী। এখানকার মত এত চমৎকার গৃহ অন্য কোথাও দেখা যায় না; এখানে যে স্নানাগার আছে এইরূপ স্নানাগারও এত প্রাচীন কালে অন্য কোন স্থানে ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এখানকার শিল্প, সমসাময়িক ইজিপ্ত, সুমের ও এলাম প্রভৃতি দেশের শিল্প-অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। মোহেন-জো-দড়োর মৃৎপাত্র-চিত্রও তুলনাহীন। সাধারণ বয়ন-কার্য্যের জন্য ইজিপ্তে প্রচলিত শণ-জাত সূতার পরিবর্ত্তে এখানে তুলার সূতা ব্যবহৃত হইত। অধিকন্তু এখানকার লেখার সঙ্গে অন্যান্য দেশের প্রাচীন লেখার আপাত-দৃষ্টিতে মোটামুটি সাদৃশ্য থাকিলেও ইহা যে অধিকতর উন্নত প্রণালীর লেখা এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মোহেন্‌-জো-দড়োর ধ্বংসস্তূপ-খননের ফলে একে একে পর পর সাতটি স্তরের চিহ্ন ও দ্রব্যসামগ্রী আবিষ্কৃত হইয়াছে। উপরের তিন স্তর তৃতীয় যুগের (Late period), তন্নিম্নের তিন স্তর মধ্যযুগের (Intermediate period) এবং ইহার নীচের একটি আদি যুগের (Early period) বলিয়া ডাঃ ম্যাকে অনুমান করেন।[১] ইহার নীচে আরও আদিযুগের স্তর আছে বলিয়া তাঁহার ধারণা। কিন্তু

১ Arch. Sur. Rep., 1928-29, pp. 68-69

প্রাগৈতিহাসিক যুগ অপেক্ষা ভূগর্ভস্থ জল (water level) বর্ত্তমানে অনেক উপরে উঠিয়া আসায় সর্ব্বপ্রাচীন স্তরের সন্ধান ও আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। ১৯৫০ সালের খননেও আদিযুগের স্তর দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

অন্য দেশ হইলে এই সাতটি স্তরের বিভিন্ন সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও পরিণতির জন্য অন্ততঃ এক সহস্র বৎসর লাগিত। কিন্তু দীর্ঘ দশ শতাব্দী স্থায়ী সভ্যতা এখানে ছিল বলিয়া অনুমান হয় না। কারণ এখানে ঘন ঘন জলপ্লাবনের জন্য এক যুগের (বা স্তরের) সভ্যতা বহু বৎসর ব্যাপিয়া স্থায়ী হয় নাই। এই নগর বন্যা-দ্বারা প্রায়ই বিধ্বস্ত হইত। স্থানে স্থানে বন্যা-বাহিত নদী-বালুকার দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই অনুমান যে সত্য ইহার প্রমাণ এই যে, প্রাচীন দ্রব্যাদি ভিন্ন ভিন্ন সাতটি স্তরে পাওয়া গেলেও দেখিতে অবিকল একই রকম। ইটের আকার ও মাপ, শীলমোহরের লেখা ও আকৃতি প্রভৃতির মধ্যে উপরের স্তর ও নীচের স্তরের সভ্যতার কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় না।[১] মৃৎপাত্রাদিতেও স্তরের বিভিন্নত্বের জন্য আকৃতি ও চিত্রের বিশেষ কোন প্রভেদ দেখা যায় না।[১]

[১]উপরের এবং নীচের স্তরের সমস্ত জিনিষের মধ্যে এরূপ সাধারণ ঐক্য-দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে মোহেন্-জো-দড়োর পত্তন এবং পতনের মধ্যে মাত্র কয়েক শতাব্দীর বেশী ব্যবধান নয়।[১] স্যর্ জন্ মার্শাল্ এই ব্যবধান-কাল পাঁচ শত বৎসর বলিয়া অনুমান করেন।

১ পোড়া মাটীব পুতুলগুলিব মধ্যে মাত্র একটু প্রভেদ লক্ষিত হয়। অনেক বিষয়ে উপর ও নীচের স্তরেব মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠভাবে সাদৃশ্য থাকিলেও নীচের পুতুলগুলি খুব স্বাভাবিক এবং শিল্পীর পরিপক্ক হস্তের পবিচায়ক। উপরের পুতুল স্বাভাবিকত্বেব গণ্ডী ছাডাইয়া শুধু ছোট ছেলেমেয়েদের খেলনা হিসাবেই তৈরী হইত। মূল জিনিষের আভাস ইহাতে থাকুক আব না থাকুক শিল্পীর তাহাতে কোন মনোযোগ নাই। এইখানেই নগরের অধঃপতনের সূচনা দেখা যায়।

এই সহর-প্রতিষ্ঠার সময়েই যে তত্রত্য অধিবাসীদের অত্যন্ত উন্নত-প্রণালীর সভ্যতা ছিল, ইহা জোর করিয়া বলা যায়। নাগরিক জীবনের জটিলতা, গৃহনির্ম্মাণে নিপুণতা এবং শিল্পকর্ম্মাদির উৎকর্ষ প্রভৃতি দ্বারা মনে হয়, এই সভ্যতা বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই সুরু হইয়াছিল এবং মোহেন্-জো-দড়োর পত্তন এই দীর্ঘকালেরই ক্রমোন্নতির ফলস্বরূপ। নানা প্রকার মৃৎপাত্র, গভীর ভাবে অঙ্কিত মনোরম চিত্রযুক্ত শীলমোহর এবং ইহার নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর লেখা প্রভৃতিও এই সভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাস বহন করিয়া আনিয়াছে। মোহেন্-জো-দড়োর পতনের পরেও এখানকার শিক্ষা-দীক্ষা বহু দিন পর্য্যন্ত সজীব ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ, হরপ্পায় উপরের স্তরে মোহেন-জো-দড়ো-যুগের পরবর্ত্তী কালের সমাধি-দ্রব্য ও পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলি যদি সিন্ধু-সভ্যতার প্রতীক বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে পরবর্ত্তী কালেও যে এই সভ্যতার ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

মোহেন্-জো-দড়ো ও আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ

মোহেন্-জো-দড়োর শীলমোহরের মত ঠিক একই রকম কয়েকটি শীলমোহর মেসোপটেমিয়া ও এলামের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলির অন্ততঃ দুইটি মেসোপটেমিয়ার সারগোন (Sargon) (খ্রীঃ পূঃ ২৮শ শতাব্দীর) নামক রাজার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের অর্থাৎ মোটামুটি খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় সহস্রকের বলিয়া ইতিপূর্ব্বে স্থিরীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান গণনানুসারে সারগোনকে মোটামুটি খ্রীঃ পূঃ ২৩০০ অব্দের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী কালের বলিয়া ধরা হয়। সুতরাং সিন্ধু সভ্যতার যুগ খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ অব্দের পূর্ব্বে নয় বলিয়া ডাঃ হুইলার,[১] ও অধ্যাপক পিগোট্ মনে করেন।

১ Wheeler—Ind. Civil. p. 4.

মেসোপটেমিয়ার উর (Ur) এবং কিশ্ (Kish) নামক স্থানদ্বয়ে প্রাপ্ত শীলমোহর দুইটি হইতে সিন্ধু-সভ্যতা খ্রীঃ পূঃ ২৮০০ অব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। এই সব বিষয় বিবেচনা করিয়া স্যর্ জন্ মার্শাল্ মোহেন-জো-দড়োর স্থিতিকাল খ্রীঃ পূঃ ৩২৫০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ২৭৫০ অব্দ বলিয়া মনে করেন।[১] উল্লিখিত শীলমোহরগুলির একটি সুসা (এলাম) নামক সহরের দ্বিতীয় স্তরে পাওয়া গিয়াছে। ইহা অস্থিনির্ম্মিত ও দেখিতে নলের মত। ইহাতে মোহেন্-জো-দড়োর শীলমোহরের অনুকরণে "বৃষ এবং পাত্র"-চিহ্ন আছে। তাহাতে অনুমান হয় মোহেন্-জো-দড়োর শীলমোহর-অঙ্কনের প্রভাব সুসার দ্বিতীয় যুগের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছিয়াছিল। অন্যান্য দেশের সঙ্গেও তাৎকালিক ভারতের আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ ছিল বলিয়া প্রতীতি হয়। কারণ, মেসোপটেমিয়ার আল-উবৈদ্ (Al-ubaid) নগরে প্রাপ্ত কয়েকটি পাত্রখণ্ড ভারতীয়-প্রস্তরনির্ম্মিত বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ এখানে প্রাপ্ত একটি মূর্ত্তির গাত্রাবরণে অঙ্কিত "ত্রিপত্র"-(trefoil) চিহ্ন[২] এবং সুমেরে প্রাপ্ত "স্বর্গবৃষের" (Bull of Heaven) গাত্রাঙ্কিত ত্রিপত্র-চিহ্ন একই রকম। তৃতীয়তঃ মোহেন-জো-দড়োর শীলমোহরের শৃঙ্গি-মূর্ত্তি[৩] সুমেরবাসীদের শৃঙ্গযুক্ত "ইয়বনি" (Eabani) দেবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। হরপ্পায় আবিষ্কৃত কয়েকটি প্রসাধন-দ্রব্য এবং উর নগরীর প্রথম রাজবংশের গোরস্থান হইতে প্রাপ্ত দ্রব্যের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। মোহেন-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত কতকগুলি

১ সারগোনের রাজত্বকাল এখন খ্রীঃ পূঃ ২৩০০ অব্দের কাছাকাছি অনুমিত হওয়ায় সিন্ধুসভ্যতার কালও খ্রীঃ পূঃ ২৫০০—খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ বলিয়াই আপাততঃ মনে হয়।

২ M. I. C., pl. XCVIII

৩ M. I. C, pl. CXI, Seals 356 and 357

লাল আকীক পাথরের মালার ও সার্গোন্ রাজার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের কিশ্ নগরীয় গোরস্থানের কোন কোন মালার নির্ম্মাণ-কৌশল অবিকল একই রকমের। অধিকন্তু উভয় স্থানের পাথরের নলাকৃতি (cylindrical) ওজন এবং মাটীর উৎসর্গাধার (offering stand) প্রভৃতিতেও যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

উর, কিশ, সুসা, লাগাশ্ উম্মা, তল্ আস্মর, মসুলের নিকটবর্ত্তী তেপে গওরা (Tepe Gawra) এবং সিরিয়া প্রভৃতি স্থানে আবিষ্কৃত প্রায় ২৯।৩০টি শীলমোহর গ্যাড্ (Gadd) ফ্রাঙ্ক ফোর্ট, (Frankfort) ল্যাংডন্, (S. Laugdon) স্পাইজার (E. A. Speiser) ইঙ্গ্হোল্ট্ (H. Ingholt) প্রমুখ পণ্ডিত সিন্ধু-সভ্যতার বিশিষ্ট শীলমোহরের প্রণালীতে নির্ম্মিত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।[১]

ঐগুলির মধ্যে কয়েকটি দেখিতে বৃত্তাকার। হরপ্পা-মোহেন-জো-দড়োর শীলমোহর সাধারণতঃ চতুষ্কোণ। এইজন্য পূর্ব্বোক্ত শীলমোহর-গুলি ভারতীয় চিহ্নযুক্ত হইলেও বাহিরে কোথাও নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। আবার কাহার কাহারও মতে ব্যবসায় বাণিজ্যের দ্রব্যে ছাপ দেওয়ার সুবিধার জন্য ঐগুলি এদেশেই বৃত্তাকার করা হইয়াছিল। ঐ শীলমোহরগুলির মধ্যে কয়েকটি মেসোপটোমিয়ার রাজা সারগোনের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের বলিয়া বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। সারগোন্ রাজার রাজত্বকাল বর্ত্তমান গণনানুসারে খ্রীঃ পূঃ ২৪০০ অব্দের কাছাকাছি ধরা হয় এবং মোটামুটি এই গণনার উপর নির্ভর করিয়া হুইলার মোহেন্-জো-দড়ো সভ্যতার উত্থান ও পতনের সময় খ্রীঃ পূঃ প্রায় ২৫০০ হইতে খ্রীঃ পূঃ প্রায় ১৫০০ অব্দের মধ্যে ধরিতে চান।[২] কিন্তু তাঁহার এই ধারণাও দ্বিধাহীন এবং নিঃসন্দেহ নয়।

১ Wheeler—Indus. Civ, pp 84 88.

২. Ibid, p 93.

মোহেন্-জো-দড়োর আদিযুগের ভূগর্ভস্থ জলমগ্ন স্তর দুইটির স্বরূপ ও সমসাময়িক পুরাবস্তুর তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইলে ভারতের তাম্রপ্রস্তর যুগের ইতিহাসে বিপ্লবের সৃষ্টি হইতে পারে। নগরের প্রথম পত্তনের কাল অধিকতর প্রাচীন বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে; কিন্তু কি পরিমাণ প্রাচীন এখনও বলা কঠিন। সিন্ধু সভ্যতাব পুরাবস্তুর মধ্যে প্রাপ্ত জীব-জন্তুর আকৃতিযুক্ত তামার চুলের কাঁটা, ফায়েন্সের সংযুক্ত বর্ত্তুলাকার ("segmented") মালা, তামার ও ব্রোঞ্জের কুঠার এবং ছুতারের বাইসের (axe-adze) মত যন্ত্র প্রভৃতি মেসোপটেমিযা ও পারস্যের এবং ইউরোপের কোন কোন স্থানে আবিষ্কৃত দ্রব্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া মোহেন্-জো-দড়োর কৃষ্টির সময সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত মতই হুইলার পোষণ করেন। তবে তাঁহার এইসব যুক্তির মধ্যে সন্দেহের অবকাশও কিছু কিছু রহিযাছে। কারণ সমজাতীয় জিনিষের মূল সূত্র যে কোথায় এবং কোন সময়ে উৎপত্তি শুধু আকৃতি দেখিযা ঠিক করা কঠিন। স্থানে স্থানে তিনি নিজেও এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ডাঃ হুইলারের বর্ণিত বিভিন্ন স্থানের পুবাবস্তুর কোন কোনটির নির্ম্মাণ-কাল খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ সহস্রকের শেযভাগেও নির্ণীত হইয়া থাকে। সুনির্দ্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া শুধু আকৃতিগত সাদৃশ্যের উপর নিভর করিয়া সিন্ধুসভ্যতার কাল স্থির ভাবে নির্দ্দেশ কবা দুরূহ।

হুইলার মনে করেন বৈদিক আর্য্যরাই ছিলেন হরপ্পা-মোহেন্-জো-দড়ো সভ্যতার উচ্ছেদকর্ত্তা। ইন্দ্রদেবের নেতৃত্বে সিন্ধুসভ্যতার বিলোপ সাধিত হয বলিয়া তাঁহাব ধারণা।[১] কালের পরিবর্ত্তনে সিন্ধুতীরের অতুলনীয় সমৃদ্ধিশালী সভ্যতায ঘুণ ধরিল। বন্যা, মহামারী ও জলবায়ুর পবিবর্ত্তন প্রভৃতি দৈব উৎপাত দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করিল। ব্যবসা বাণিজ্যের পথ বন্ধ হইল এবং দেশের পতন আরম্ভ হইল। জাতীয়

১ Wheeler—Ind. Civil, pp 90-91

আয় কমিয়া গেল; দেশে দারিদ্র্য দেখা দিল। নাগরিক সুখ-সুবিধা ও স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিল। ধনীর অট্টালিকার স্থান দরিদ্রের ভগ্ন কুটীরে আবৃত হইল, এমন কি যেখানে স্বাস্থ্যরক্ষার সামান্য বিষয়েও নগরশাসকদের দৃষ্টি অনুমাত্রও ক্ষীণ হইত না, সেই নগরের প্রধান প্রধান রাজপথের বুকের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর, নানারূপ আবর্জ্জনাধার এবং ধূম উদ্‌গীরণকারী ভাঁটি পর্য্যন্ত দেখা দিল। প্রকৃতির নিষ্ঠুর পরিহাসে বিপন্ন হইয়া সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায়ীদের সংখ্যা কমিতে লাগিল। এইরূপ অবস্থায় শেষ আঘাত হানিল আক্রমণ-কারীরা। নগরের বাহিরে হয়ত যুদ্ধ হইয়া জয়পরাজয়ের মীমাংসা হইয়া থাকিবে। কিন্তু রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় স্বাধীনতার শেষ দীপটি নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে বিদেশী বিজেতার সঙ্গে নগরের অলিতে গলিতে খণ্ড যুদ্ধে নাগরিকদের আত্মরক্ষার একটা শেষ চেষ্টা দেখা যায়। এখানেও ইহার বিপর্য্যয় ঘটে নাই। মোহেনজোদড়োর শেষ অবস্থায় উপরের স্তরে রাজপথে এবং কোনো কোন আবাসগৃহে আবালবৃদ্ধবনিতার অনেক কঙ্কাল অযত্ন রক্ষিত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। অবস্থা দেখিয়া মনে হয় কেহ তাহাদের সৎকারের ব্যবস্থাও করে নাই। উক্ত সহরের এক স্থানে (H. R Aeca) তের জন প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী এবং একটি শিশুর কঙ্কাল পড়িয়া আছে। ইহাদের মধ্যে কাহারো কাহারো হাতে চুড়ি, আঙ্গুলে আংটি এবং গলায় মালা ছিল। অবস্থা বিবেচনায় মনে হয় একই সময়ে তাহারা সকলে মৃত্যুর সম্মুখান হইযাছিল। ইহাদের একজনের মাথার খুলিতে তরবারী জাতীয় কোন অস্ত্রের আঘাতে মৃত্যু ঘটিয়াছিল এরূপ চিহ্ন পাওয়া যায়। আরও একটা নরকরোটিতেও গুরুতর আঘাতের চিহ্ন বর্ত্তমান[১]। সহরের বিভিন্ন স্থানে অস্বাভাবিক অবস্থায় পতিত আরও অনেক নরকঙ্কাল দৃষ্টিগোচর হয়। এক জায়গায় নয়টি কঙ্কাল একত্র

১ Marshall, M. I. C II, 616, 624

পড়িয়া আছে। ইহাদের মধ্যে পাঁচটি শিশু এবং চারিটি প্রাপ্তবয়স্ক। সঙ্গে রহিয়াছে দুইটি গজদন্ত। এই দলের মধ্যে কেহ কেহ গজদন্ত-শিল্পী ছিল এবং আক্রমণকারীর ভয়ে পলায়নেচ্ছু এই নাগরিকরা শত্রুর হাতে নিহত হইয়াছিল বলিয়া ডাঃ ম্যাকের ধারণা।[১] এই সহরের এক জলকূপের সন্নিকটে সিঁড়ির উপর এবং অন্যান্য স্থানে চারিটি নরকঙ্কাল পড়িয়া আছে। ইহাদের একজন স্ত্রীলোক। ইহারাও আততায়ীদের হাতে নিহত হইয়াছিল বলিয়া সন্দেহ হয়।[২]

হুইলার মনে করেন মোহেন্-জো-দড়ো সভ্যতার ধ্বংসের জন্য ঋগ্বেদীয় আর্য্যদের বীরদেবতা ইন্দ্রই দায়ী। ঋগ্বেদের "পুরন্দর" অর্থে ইন্দ্রকে বুঝায়। শত্রুর পুর অথবা 'দুর্গ' বিদীর্ণ (ধ্বংস) করিয়াছিলেন বলিয়া ইন্দ্র এই আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে তাঁহার আশ্রিত আর্য্য দিবোদাসের সাহায্যার্থে ইন্দ্র নব্বইটি শত্রু-দুর্গ ধ্বংস করিয়াছিলেন। কোন কোন স্থানে আবার বর্ণিত আছে তিনি শম্বরের নিরান্নব্বইটি অথবা একশতটি দুর্গ বিনষ্ট করিয়াছিলেন। ঐ দুর্গের বা পুরীর মধ্যে কোন কোনটি প্রস্তরনির্ম্মিত (অশ্মময়ী) আবার কোনটি বা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত (আমা) ছিল। মোহেন্-জো-দড়ো, হরপ্পা, বেলুচিস্তানের মক্‌রাণের অন্তর্গত সুক্তগেন্-দোর (Suktagen-dor), সিন্ধু প্রদেশের আলিমুরাদ প্রভৃতি স্থানে অশ্মময়ী ও আমা উভয় প্রকার পুরীই (দুর্গ) আবিষ্কৃত হইয়াছে। হুইলার মনে করেন সিন্ধু-পাঞ্জাব-বেলুচিস্তানে অধুনা আবিষ্কৃত ঐ সকল দুর্গই ঋগ্‌বেদের অনার্য্য-অধ্যুষিত ইন্দ্রদেব-বিধ্বস্ত অশ্মময়ী ও আমা পুরী।[৩] পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মতে ঋগ্বেদের কাল যে খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দের কাছাকাছি, সিন্ধু সভ্যতার পতনের কাল দ্বারা তিনিও ঐ মতের সমর্থন

১ Mackay, F. E. M. I. 117

২ Ibid, pp. 94f

৩ Wheeler—Ind Civ., pp 90f

করিতে চান। অর্থাৎ তিনিও মনে করেন ঋগ্বেদের আর্য্যরা খ্রীষ্টের জন্মের মোটামুটি দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে আক্রমণকারী রূপে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া প্রতিকূল প্রাকৃতিক ও সামাজিক কারণে ক্ষীয়মাণ সিন্ধু-সভ্যতার সম্মুখীন হন; এবং স্বীয় যাযাবরীয় সুস্থ সবল দেহের শৌর্য্যবীর্য্যে ও দ্রুতগামী অশ্বের সাহায্যে সিন্ধুবাসীদিগকে পরাভূত করিয়া ইহাদের উন্নত সভ্যতার বিলোপ সাধন করেন।

কিন্তু আর্য্য অনার্য্যের স্বরূপ ও তাহাদের সংঘর্ষ প্রভৃতির কাল এবং ভারতীয় বিশাল হিন্দু সভ্যতায় তাঁহাদের অবদানের অনুপাত নির্ণয় ইত্যাদি বিষয়ে সুমীমাংসা এখনও হয় নাই। ভারতের বিভিন্ন স্থানে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও গবেষণাই একমাত্র এই প্রশ্নের সমাধান করিতে পারে। প্রত্ন-বিজ্ঞানের প্রতি শাসক-শ্রেণী এবং জনসাধারণের প্রকৃত আগ্রহ ও সহানুভূতি থাকিলে অদূর ভবিষ্যতেই এই প্রশ্নের সন্তোষজনক সমাধান হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

অধিবাসী

মোহেন্-জো-দড়োতে এক গলির মধ্যে ছয়টি এবং ঘরের ভিতরে চৌদ্দটি নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, কোন মহামারী কিংবা আকস্মিক বিপদ্ অথবা বহিঃশত্রুর আক্রমণই ইহাদের মৃত্যুর কারণ। ভারতবর্ষে মৃতদেহ-সৎকারের প্রণালী কোন সময়েই এইরূপ ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই সকল এবং অন্যান্য কঙ্কাল ও মস্তক পরীক্ষার দ্বারা এখানে চারি জাতীয় লোক বিদ্যমান ছিল বলিয়া বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করিয়াছেন।

১ ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের যে সব প্রদেশ ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী, সেই সব স্থানে যে জাতীয় লোক বাস করে, মোহেন্-জো-দড়োতে তদনুরূপ লোক ছিল বলিয়া অস্থিকঙ্কাল পরীক্ষার দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। এই আকৃতি-বিশিষ্ট

লোক দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড়ীয় ভাষাভাষীদের (যথা তেলেগু, মালয়ামলম্ ভাষীদের) মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক বাঙ্গালী জাতির মধ্যেও কখন কখনও এই নমুনার লোক দৃষ্টিগোচর হয়। [১]

ইহাদের অধিকাংশেরই মাথা চওড়ার অনুপাতে বেশী লম্বা। এই সকল লোকের মাথার উপরিভাগ উন্নত, কপাল সমতল এবং নাসিকা অপ্রশস্ত ও উন্নত ছিল। ইহাদের অস্থি দেখিয়া মনে হয়, ইহারা নাতিদীর্ঘ ও নাতিখর্ব্ব আকার-বিশিষ্ট ছিল। ইহাদের মধ্যে একটি পুরুষের কঙ্কালের দৈর্ঘ্য ৫'৪½" এবং দুইটি স্ত্রীলোকের দৈর্ঘ্য ৪'৯" এবং ৪' ৪½" ছিল। অনেকে মনে করেন এইজাতীয় লোকই হয়ত সিন্ধুসভ্যতার স্রষ্টা এবং সুপ্রাচীন কালে সমাজব্যবস্থা এবং কৃষির উন্নতিবিধানের অগ্রদূত।[১]

দ্বিতীয় প্রকারের মস্তক আয়তনে বৃহৎ ও অনুন্নত, অক্ষিপুটের উপরিস্থিত (অর্থাৎ ভ্রূর নিম্নস্থ) অস্থি উন্নত, এবং কানের পশ্চাদ্-ভাগে মস্তকের (করোটীর) অংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, ললাট অনুন্নত ও নাসিকা অনতিপ্রশস্ত। ইহাদিগকে প্রথমে আদি-অষ্ট্রেলীয় (Proto-Australoid) বলিয়া কর্নেল্ স্যুয়েল্ ও ডাঃ বিরজাশঙ্কর গুহ বর্ণনা করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে ডাঃ গুহ এইরূপ আকৃতিবিশিষ্ট লোককে অষ্ট্রেলীয় জাতির অন্তর্ভুক্ত না করিয়া ককেশীয় (Caucasic) জাতি বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।[১]

উল্লিখিত দুই প্রকার লম্বা-মস্তক-বিশিষ্ট জাতি ছাড়া এখানে প্রশস্ত-মস্তক-বিশিষ্ট আরও একপ্রকার জাতির বাস ছিল। ইহাদের মস্তকের শীর্ষদেশ উন্নত এবং নাসিকা অপ্রশস্ত ও উন্নত ছিল। এই জাতীয় লোক এশিয়া মহাদেশের আর্ম্মেনিয়া হইতে পামীর বা কাশ্মীরের উত্তর দিক্ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়; এবং বর্ত্তমানে

১ Census of India 1931, Part III, pp. lxviii-lxiv.

ভারতবর্ষের বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, বেলুচিস্তান প্রভৃতি প্রদেশেও এই জাতীয় লোক দেখা যায়।

উল্লিখিত তিন প্রকার জাতি ব্যতীত মোঙ্গোলীয় জাতীয় একটি নরমুণ্ডও এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে রক্ষিত একটি নাগা-মুণ্ডের সঙ্গে ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে বলিয়া বিবিধ পরিমাপ-দ্বারা কর্নেল্ সুয়েল্ ও ডাঃ গুহ প্রমাণ করিয়াছেন।

বেলুচিস্তানের নাল এবং পাঞ্জাবের হরপ্পা প্রভৃতি স্থানেও তাম্র-প্রস্তর-যুগের মোহেন্-জো-দড়ো-বাসীর তুল্য কোন কোন জাতির বাস ছিল বলিয়া সেই সকল স্থানে আবিষ্কৃত অস্থি-কঙ্কাল পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।

এখানকার সভ্যতাসম্বন্ধে স্যর্ জন্ মার্শাল্ বলেন যে, ইহা হয়ত কোন জাতি-(race) বিশেষের সৃষ্টি নয়, প্রধানতঃ স্থান ও স্থানীয় নদীর পরিবেষ্টনীর মধ্যে বিভিন্ন জাতির আহৃত উপাদান ও আনুকূল্যের দ্বারা এই বিরাট্ সভ্যতার পরিপোষণ ও অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাইয়াছিল।[১]

কেহ কেহ মোহেন্-জো-দড়োর অধিবাসীদিগকে প্রাচীন দ্রাবিড়ীয় (Dravidians) জাতি বলিয়া মনে করেন। কারণ, দ্রাবিড়ীয়েরা পশ্চিম হইতে আক্রমণকারিরূপে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে বলিয়া একটি মত আছে। এই অনুমানের মূলে কোন সত্য নিহিত থাকিলে এই বলা যাইতে পারে যে ভূমধ্যসাগরীয় (Mediterranean) জাতির যে সকল লোক কিশ্ (Kish), আনাউ (Anau), নাল (Nal) এবং মোহেন্-জো-দড়োতে বাস করিত বলিয়া অনুমান করা হয়, দ্রাবিড়ীয়েরা হয়ত তাহাদেরই স্বজাতি এবং ভারতে প্রবেশ করিয়া নানাজাতির সঙ্গে বৈবাহিক আদান-প্রদান প্রভৃতি মেলামেশার দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন,

১ M. I. C., Vol. I, pp. 108-09.

সুমেরীয় জাতি ভারতীয় দ্রাবিড়দের সমজাতীয় এবং মেসোপটেমিয়ার পূর্ব্বদিকে কোন স্থানে বা সিন্ধু-উপত্যকায় ইহাদের পূর্ব্বনিবাস ছিল।

কেহ কেহ মোহেন্-জো-দড়ো-বাসীদিগকে বৈদিক আর্য্যদের সঙ্গে একজাতিভুক্ত করিতে চাহিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে অন্যান্য অনেক সমস্যার উদ্ভব হয়; নরকঙ্কাল পরীক্ষার দ্বারা ইহার কোন সমাধান হয় না। পরন্তু আর্য্যদের সম্বন্ধে বেদে যে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় ইঁহারা প্রধানতঃ গ্রামে বাস করিতেন এবং কৃষিজীবী ছিলেন। নাগরিক জীবনযাপন সম্বন্ধে কিংবা জটিল অর্থনীতি-বিষয়ে ইহাদের তেমন পারদর্শিতা ছিল না। বৈদিক আর্য্যদের মোহেন্-জো-দড়ো-বাসীদের মত বড় বড় পোড়া ইটের অট্টালিকা ছিল না; পরন্তু মনে হয়, ইঁহারা বাঁশ ও বেত প্রভৃতি দিয়া কুঁড়ে ঘর তৈরী করিয়া তাহাতে বাস করিতেন। মোহেন্-জো-দড়োতে অল্প দূরে দূরে কূপ খনন করিয়া সহরবাসীদের জল-সরবরাহের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; স্নানাগার প্রস্তুত করিয়া দিয়া লোকের আধুনিক সভ্যতানুযায়ী স্বচ্ছন্দভাবে স্নানাদির বন্দোবস্ত ছিল; অসংখ্য পয়ঃ-প্রণালী নির্ম্মাণ করিয়া আবর্জ্জনা ও অপক্রুত জল নিকাশের দ্বারা সহরবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষার সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল; বড় বড় রাস্তা প্রস্তুত করিয়া যানবাহনাদির চলাচলের পথ সুগম করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; জলপথে যাতায়াত ও বাণিজ্যের জন্য নৌকার প্রচলন ছিল[১] এই সকল এবং আরও অনেক উন্নত প্রণালীর নাগরিক জীবনের বিকাশ মোহেন্-জো-দড়োর পুরাবস্তু (antiquity) পর্য্যালোচনা করিলে সম্যক্ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আর্য্যদের সম্বন্ধে বেদ সেরূপ কোন প্রমাণ বহন করিয়া আনে নাই। ধাতুর ব্যবহার-বিষয়ে বেদ এবং

১ Mackay, F. E. M. Vol. II. Pls. LXIX. 4; LXXXIII. 30; LXXXIX. A

মোহেন্-জো-দড়োর মধ্যে অনেকটা ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। মোহেন্-জো-দড়োতে সোনা, রূপা, তামা ও ব্রোঞ্জের জিনিষপত্র পাওয়া গিয়াছে। লোহার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ এখানে নাই। ঋগ্বেদেও সোনা, তামা বা ব্রোঞ্জের উল্লেখ আছে।

শত্রুকে আক্রমণ করার জন্য বৈদিক আর্য্যরা তীর, ধনুক, বর্শা, ছোরা ও কুঠার এবং আত্মরক্ষার জন্য শিরস্ত্রাণ ও কবচ ব্যবহার করিতেন। মোহেন্-জো-দড়ো-বাসীরাও এক দিকে যেমন আর্য্যদের মত তীর, ধনুক, বর্শা. ছোরা এবং কুঠার ব্যবহার করিত, পক্ষান্তরে মিশর ও মেসোপটেমিয়া-বাসীদের মত পাথর কিংবা ধাতুনির্ম্মিত মুষলের ব্যবহারও জানিত। আত্মরক্ষার কোন সরঞ্জাম আজ পর্য্যন্ত মোহেন-জো-দড়ো হইতে আবিষ্কৃত হয় নাই। ঋগ্বেদের আর্য্যরা মাংসাশী ছিলেন কিন্তু মৎস্য-ভক্ষণ-সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে বেদে কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। মৎস্য মোহেন-জো-দড়ো-বাসীদের দৈনন্দিন খাদ্য ছিল বলিয়া মনে হয়; কারণ এখানে মৎস্য-শিকারোপযোগী তামার অনেক বড়্শি পাওয়া গিয়াছে। জলচর জীবের মধ্যে আরও কোন কোন জীব ইহাদের খাদ্য ছিল বলিয়া বোধ হয়।

বেদে অশ্বের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্র প্রভৃতি যোদ্ধগণ অশ্ব ব্যবহার করিতেন, সূর্য্যের বাহন অশ্ব—ইত্যাদি উল্লেখ আছে। কিন্তু মোহেন-জো-দড়ো বা হরপ্পায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের অশ্বের কঙ্কাল[১] কিংবা প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া যায় নাই।

১ মোহেন্-জো-দড়োর উপরের স্তরে এক স্থানে অশ্বের কতকগুলি হাড় পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু এইগুলি আধুনিক কালের বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করেন। পক্ষান্তরে বেলুচিস্থানের রণঘুণ্ডৈ নামক স্থানে প্রাক্-মোহেন্-জো-দড়ো যুগেও যে অশ্ব ও গর্দ্দভ বিদ্যমান ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

বেদে গোমাতার স্থান বহু উচ্চে, কিন্তু মোহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পাতে ইহার পরিবর্ত্তে শীলমোহর ও খেলনা প্রভৃতিতে বৃষের প্রতি আকর্ষণই অতিমাত্রায় পরিস্ফুট। ব্যাঘ্রের বিষয়ে ঋগ্বেদে উল্লেখ নাই, আর হস্তীর কথা সামান্যই আছে। কিন্তু সিন্ধুতীরবাসীর নিকট এই উভয় জন্তুই পরিচিত ছিল। বেদে কোন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়োতে অনেক মূর্ত্তি দেখিয়া সে সব স্থানে মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত ছিল বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করেন। বেদে স্ত্রীদেবতার স্থান পুংদেবতার নীচে; এবং মাতৃকা (Mother Goddess)-পূজা কিংবা শিবপূজার উল্লেখ উক্ত গ্রন্থে দেখা যায় না। কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতায় শিবলিঙ্গ এবং মাতৃকাপূজার বহুল প্রচলন ছিল বলিয়া প্রতীতি হয়। বৈদিক আর্য্যদের প্রতিগৃহে অগ্ন্যাধান করিয়া তাহাতে অগ্নির আহুতি দেওয়া হইত। কিন্তু মোহেন-জো-দড়োতে অগ্নিকুণ্ডের চিহ্ন খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। বেদে "শিশ্নদেব" (লিঙ্গোপাসক)-দিগকে খুব নিন্দা করা হইয়াছে; কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতার অন্যতম অঙ্গ শিশ্ন-পূজা বলিয়া অনুমিত হয়।

উল্লিখিত সমালোচনা হইতে দেখা যাইবে যে বৈদিক ও মোহেন-জো-দড়োর সভ্যতার মধ্যে বিশেষ কোন ঐক্য নাই। তবে এমন মনে হইতে পারে যে হয়ত বৈদিক সভ্যতা সিন্ধু-সভ্যতার জননী কিংবা ভগিনী। প্রথম মতের বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে, বেদে অশ্ব ও আত্মরক্ষার অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতির উল্লেখ আছে। যদি বৈদিক সভ্যতা সিন্ধু-সভ্যতার জননীই হয় তবে মোহেন-জো-দড়োতে এই সব জিনিষের অভাব দেখিতে পাওয়া যায় কেন? আর যদি বৈদিক সভ্যতা পূর্ব্ববর্ত্তী হয় তবে প্রথমতঃ বেদে গোমাতার শ্রেষ্ঠত্ব, তারপর সিন্ধু-সভ্যতায় বৃষের প্রাধান্য, এবং পরবর্ত্তী যুগে আবার গোমাতার পূজার কারণ কি? মোহেন-জো-দড়োর যুগে মধ্যে একবার বৃষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতীয়মান হওয়ায় একটা সাধারণ গতির ব্যতিক্রম হয় না

কি ?[১] যদি প্রস্তর-যুগের পরে মোহেন-জো-দড়ো-যুগের পূর্ব্বে একটা বৈদিক যুগের কল্পনা করা যায় তবে ঐ বৈদিক যুগে নানারূপ ধাতুদ্রব্যের ব্যবহারের পর মোহেন-জো-দড়োতে যে প্রস্তর-ধাতু-যুগ দেখিতে পাওয়া যায়, এই সমস্যারই বা সমাধান কি প্রকারে হয় ?

যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে ভারতীয় আর্য্যরা সিন্ধু-সভ্যতা ও বৈদিক-সভ্যতা এই উভয়েরই স্রষ্টা, তাহা হইলেও আর এক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। কারণ ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয় যে, যে লোকেরা মোহেন-জো-দড়োতে গগনস্পর্শী অট্টালিকায় নাগরিক জীবনযাপন করিতে জানিতেন, তাঁহারাই আবার বেদের যুগে গ্রামে বাঁশ-খড়ের ঘরে বসবাস সহ্য করিলেন ? তাঁহারা একদা শিবলিঙ্গ এবং মাতৃকা-পূজা অভ্যাস করিয়া বেদের সময়ে ইহা ত্যাগ করিয়া পুনরায় পরবর্ত্তী যুগে ইহার প্রবর্ত্তন করিলেন, অথবা একবার সিন্ধুদেশে কিংবা মোহেন-জো-দড়ো প্রভৃতি স্থানে যাঁহারা বাস করিয়াছিলেন তাঁহারা বৈদিক-গ্রন্থে ঐ সব স্থানের কথা উল্লেখ করিতে একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেলেন—ইহাই বা কি প্রকারে মানিয়া লওয়া চলে ? উল্লিখিত কারণ-সমূহ হইতে দেখা যায় যে বৈদিক ও সিন্ধু-সভ্যতাব মধ্যে কোন যোগা-যোগ প্রমাণ করা দুষ্কর। এই সব চিন্তা করিয়া স্যর্ জন মার্শাল্ বলেন যে বৈদিক সভ্যতা উক্ত উভয়ের মধ্যে শুধু যে পরবর্ত্তী তাহা নয়, ইহা সম্পূর্ণ বিজাতীয় এবং স্বতন্ত্র।[২]

অধ্যাপক হ্রোজ্নি মনে করেন যে তিনি মোহেন-জো-দড়ো লিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার মতে সিন্ধু-উপত্যকা-বাসীরা সংস্কৃত-

১ বেদে সময় সময় বৃষভের সঙ্গে শ্রেষ্ঠ বীরদের উপমা দেওয়া হইয়াছে। প্রাক্-খ্রীষ্টীয় যুগের উজ্জয়িনী মুদ্রায় শিবেব পার্শ্বে বৃষের আকৃতি রহিয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই মুদ্রার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

২ M. I. C., vol. I, pp. 111-12

ভাষা-ভাষী ভারতীয় আর্য্যজাতি অপেক্ষা কোন প্রাচীনতর আর্য্য জাতির অন্তর্ভূ‍র্ত ছিল। তিনি মনে করেন সিন্ধু-সভ্যতার পত্তন ও স্ফুরণ এই প্রাচীনতর আর্য্যজাতির হাতেই হইয়াছিল।

কিন্তু মোহেন-জো-দড়ো, হরপ্পা, সিন্ধুপ্রদেশ এবং ভারতীয় প্রত্ন-বিভাগ কর্ত্তৃক পাঞ্জাব ও সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে আবিষ্কৃত অসংখ্য ধ্বংসস্তূপের রীতিমত খনন ও প্রত্নসম্পদের আলোচনা না হওয়া পর্য্যন্ত বৈদিক ও সিন্ধুসভ্যতার পৌর্ব্বাপর্য্য ও পারম্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কে কিছু বলা অত্যন্ত কঠিন। শীলমোহরের অক্ষরমালা-পঠনের দ্বারোদ্ঘাটন নিঃসংশয়ভাবে না হইলেও এ বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করা অতীব দুরূহ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ধর্ম্ম

মোহেন-জো-দড়ো-বাসীদের প্রধান ধর্ম্ম যে কি ছিল সে বিষয়ে নিঃসন্দেহে কিছু বলা সম্ভব নয়। এখানে যে সকল গৃহ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা দেখিয়া ঐগুলিকে দেবমন্দির কিংবা উপাসনালয় বলিয়া মনে করা অত্যন্ত কঠিন। প্রধানতঃ শীলমোহর ও তাম্রফলকে ক্ষোদিত ছবি এবং মৃন্ময়, প্রস্তর ও ধাতু-নির্ম্মিত মূর্ত্তি প্রভৃতি হইতে এখানকার ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

মাতৃকা-মূর্ত্তি

মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পাতে অসংখ্য মৃন্ময় মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইরূপ মূর্ত্তি বেলুচিস্তানেও পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সেখানকার মূর্ত্তির আকৃতিতে কিছু প্রভেদ আছে। সিন্ধু-উপত্যকা এবং বেলুচিস্তানের মৃন্ময় মূর্ত্তির মত অনেক মূর্ত্তি পারস্য, এলাম, মেসো-পটেমিয়া, ট্রান্স্‌কাস্পিয়া, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, পালেস্‌টাইন, সাইপ্রাস, ক্রীত্‌, বল্‌কান উপদ্বীপ এবং ইজিপ্ত্‌ প্রভৃতি স্থানেও দেখিতে পাওয়া যায়। ঐগুলি প্রত্যক্ষভাবে কোন এক সাধারণ ধর্ম্ম হইতে উপজাত না হইলেও এই সকল বিভিন্ন দেশ এক শ্রেণীর ধর্ম্মের আদর্শেই অনুপ্রাণিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। মাতৃকা-বা প্রকৃতি-পূজার সূত্রপাত প্রথমে অ্যানাটোলিয়া-য় (Anatolia)। পরে সমস্ত পশ্চিম এশিয়ায় উহা বিস্তার লাভ করে এইরূপ অনেকে অনুমান করেন। সিন্ধু-উপত্যকার মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয় পশ্চিম এশিয়ার মত ইহারাও ব্রত-উপলক্ষে নির্ম্মিত মাতৃকা কিংবা প্রকৃতি দেবীর মূর্ত্তি; অথবা বাড়ীর দেবালয়ে প্রতিষ্ঠিত কোন

দেবীমূর্ত্তি। এই সিদ্ধান্তের মূল কারণ এই যে তাম্রপ্রস্তর-যুগের সভ্যতায় উদ্ভাসিত সিন্ধুনদের তীর হইতে আরম্ভ করিয়া নীল নদের তীর পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানেই নিরবচ্ছিন্নভাবে এই মূর্ত্তির প্রচলন দেখা যায়।। পশ্চিম এশিয়ার কথা ছাড়িয়া দিলেও শুধু হরপ্পা, মোহেন্-জো-দড়ো ও বেলুচিস্তানের মূর্ত্তি হইতেই ইহারা যে মাতৃকা-মূর্ত্তি কিম্বা মাতৃকাস্থানীয় অন্য কোন প্রতিমূর্ত্তি (অভিব্যক্তি) ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। ' কারণ, ভারতবর্ষে মাতৃকা-মূর্ত্তির পূজা যেরূপ প্রাচীন ও সর্ব্বব্যাপী, পৃথিবীর অন্যত্র সেরূপ আর দেখা যায় না। ইহাই সম্ভবতঃ মাতা কিংবা মহামাতা এবং "শক্তি" বা প্রকৃতি দেবীর আদি অবস্থা।। গ্রাম্য-দেবতারা হয়ত ইহারই অভিব্যক্তি। গ্রাম্য-দেবতাদের অবস্থান কোন পাথরে কিংবা বৃক্ষে অথবা সময় সময় লোকালয় হইতে দূরে অবস্থিত শূন্য গৃহে দেখিতে পাওয়া যায়।

পশ্চিম-এশিয়ার মত এই দেশেও সামাজিক জীবনে মাতৃজাতির প্রাধান্যের সময় এই মাতৃকা-পূজার সূত্রপাত হয়। এবং এতদ্দেশীয় অনার্য্যদের জাতীয় দেবতামণ্ডলীর মধ্যে এই পূজার অক্ষুণ্ণ প্রভাব ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

ভারতীয় কিংবা অন্য দেশের আর্য্যদের মধ্যে কোন স্ত্রী-দেবতাকে সর্ব্বপ্রধান স্থান দিতে বিশেষ দেখা যায় না। ঋগ্বেদে দ্যাবা-পৃথিবীর মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া বরলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্থান দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া বুঝা যায় না। স্ত্রী-দেবতার পূজা আর্য্য-অনার্য্য-সংমিশ্রণের পরে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকের ধারণা।

ভূমাতার উপাসনা যে সিন্ধু-সভ্যতায় প্রচলিত ছিল ইহা হরপ্পার একটি লম্বা শীলমোহরের ছাপে[১] দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে একটি স্ত্রীমূর্ত্তির উদর হইতে একটি বৃক্ষের জন্মের চিত্র অঙ্কিত আছে।

১ M. I. C., Vol. I, Pl. XII 12.

পুং-দেবতা

মাতৃকা-পূজার সঙ্গে সঙ্গে আদিম শিবের পূজাও প্রচলিত ছিল বলিয়া মোহেন্-জো-দড়োর এক শীলমোহর দেখিয়া অনুমান করা যায়।[১] ইহাতে যোগাসনে উপবিষ্ট উর্দ্ধশিশ্ন শৃঙ্গবিশিষ্ট এক ত্রিবক্ত্র দেবমূর্ত্তির চতুষ্পার্শে ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, মহিষ এবং অধোদেশে মৃগ ক্ষোদিত রহিয়াছে। ইহাতে অনুমিত হয়, শিবকে এখানে শুধু মহাযোগিবেশে নয়, পশুপতিভাবেও কল্পনা করা হইয়াছে।[২] যোগ আর্য্যদের আগমনের পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল এবং পৌরাণিক যুগে আর্য্য-সভ্যতায় ইহা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। এইরূপ যোগমগ্ন অপর এক প্রস্তর-মূর্ত্তি[৩] মোহেন্-জো-দড়োতে পাওয়া গিয়াছে এবং রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ সর্ব্বপ্রথমে এই মূর্ত্তির যোগাবিষ্ট ভাবের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এইরূপ যোগাবিষ্ট ভাবের মূর্ত্তি আরও পাওয়া গিয়াছে। ১৯৩০-৩১ সালে মোহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত দুইখানা শীলমোহরের মধ্যেও যোগাসনে উপবিষ্ট মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে, দেখিতে পাওয়া যায়।[৪]

শাক্ত ধর্ম্ম

শাক্ত ধর্ম্ম মাতৃকা-পূজার (Cult of Mother Goddess) অঙ্গীভূত। শাক্ত ধর্ম্মের কোন পৃথক্ অস্তিত্বের সাক্ষাৎ প্রমাণ মোহেন-জো-দড়ো কিংবা হরপ্পাতে অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। ইহা ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ধর্ম্মসমূহের অন্যতম। শক্তিপূজা শৈব ধর্ম্মের

১ M. I. C., Vol. I, Pl. XII, 17.

২ শৃঙ্গবিশিষ্ট এই প্রকার দেবমূর্ত্তি ব্রোঞ্জযুগের পরবর্ত্তী কালে ইউরোপের কোন কোন স্থানে দেখা যায়।

৩ M. I. C. Pl. XCVIII.

৪ F. E. M. Vol II. Pl. LXXXVII, 222 ; 235

সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবাপন্ন। শাক্তমতে একের মধ্যে পুরুষ ও প্রকৃতি এই উভয়ের বিকাশ (বিভূতি) কল্পিত হইয়া থাকে। এশিয়া-মাইনর ও ভূমধ্যসাগরের তীরে এইরূপ শক্তিপূজার অনুরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল। ইজিপ্ত, ফিনিসিয়া (Phænicia) গ্রীস প্রভৃতি দেশে শাক্ত-ধর্ম্মের অনুরূপ পুরুষ ও প্রকৃতির একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

শিশ্ন (লিঙ্গ)-পূজা

লিঙ্গ-পূজা যে সিন্ধু-উপত্যকায় বিশেষভাবে প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত নানারূপ প্রস্তর, মৃত্তিকা ও ফায়েন্স (faience) প্রভৃতি নির্ম্মিত অসংখ্য লিঙ্গ ও বলয়াকৃতি দ্রব্য লিঙ্গ-পূজার নিদর্শন বহন করিয়া আনিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহা অনার্য্য এবং প্রাগ্-আর্য্যসভ্যতার নিজস্ব মৌলিক বস্তু বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করেন। ঋগ্বেদে শিশ্নদেবদের প্রতি যথেষ্ট ভৎর্সনা-বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতেই বুঝা যায়, ইহা অবৈদিক ধর্ম্ম। বলয়াকৃতি গৌরীপট্টের মত দ্রব্য ও লিঙ্গ-চিহ্ন স্যর্ অরেল্ ষ্টাইন্ (Sir Aurel Stein) বেলুচিস্তানের তাম্রপ্রস্তর যুগের নগরাভ্যন্তর হইতেও আবিষ্কার করিয়াছেন।

অতি ক্ষুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ২।৩ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ লিঙ্গাকার প্রস্তর এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। ছোটগুলি দেখিতে আধুনিক দাবা খেলার ব'ড়ের (ঘুঁটির) মত।

প্রস্তরাঙ্গুরীয়ক

এখানে অর্দ্ধ ইঞ্চি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় চারি ফুট ব্যাসের অঙ্গুরীয়ের আকৃতি-বিশিষ্ট প্রস্তরনির্ম্মিত দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। এই জাতীয় দ্রব্যে দৈব শক্তি আছে বলিয়া স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবাসীর ভীতিমিশ্রিত বিশ্বাস। তক্ষশীলার প্রস্তরাঙ্গুরীয়তে ভূমির উর্ব্বরতার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অধিষ্ঠান আরোপ করা হইয়া থাকে।

মোহেন্-জো-দড়োর এসকল দ্রব্য যোনিপূজার নিদর্শনও মনে করা যাইতে পারে।

বৃক্ষোপাসনা

কয়েকটি শীলমোহরে ক্ষোদিত ছবি হইতে সিন্ধু-সভ্যতায় বৃক্ষের পূজাও প্রচলিত ছিল বলিয়া স্যর্ জন্ মার্শাল্ অনুমান করেন।

বৃক্ষোপাসনা অপেক্ষা মোহেন্-জো-দড়োতে জীবজন্তুর পূজা অধিকতর প্রসার লাভ করিয়াছিল বলিয়া স্যর্ জন্ মার্শাল্ অনুমান করেন। শীলমোহরে ক্ষোদিত চিত্রে হস্তী, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, বৃষ, মহিষ ও ঘড়িয়াল-কুমীর প্রভৃতি জীবজন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের প্রায় সকলগুলিরই পোড়া মাটীর তৈরী প্রতিমূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে। প্রস্তর এবং ফায়েন্স (faience) নির্ম্মিত জীবজন্তুও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সমস্ত জীবজন্তুতে দেবত্ব আরোপ করা হইত বলিয়া স্যর্ জন্ মার্শাল্ মনে করেন।

কোন এক অর্দ্ধনর-অর্দ্ধবৃষ মূর্ত্তিকে এক শৃঙ্গী ব্যাঘ্রের সহিত লড়াই করিতে শীলমোহরে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সুমের দেশীয় গিলগ্যামেশ (Gilgamesh) নামক বীরের সাহায্যকারী অর্দ্ধনর-অর্দ্ধবৃষ আকৃতিবিশিষ্ট ইঅবনি (Eabani) মূর্ত্তির অনুরূপ। সিন্ধু-উপত্যকার নর-বৃষ-মূর্ত্তি পৌরাণিক যুগের হিরণ্যকশিপু-নিধনকারী নৃসিংহমূর্ত্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। পৌরাণিক ভারতীয়েরা নৃসিংহকে যেমন ভগবানের অবতার স্বীকার করিয়া পূজা করিতেন সেইরূপ সিন্ধু-উপত্যকাবাসীরাও নর-বৃষ-মূর্ত্তিতে দেবত্ব আরোপ করিয়া পূজা করিতেন বলিয়া মনে হয়।

নাগপূজা

মোহেন্-জো-দড়ো-বাসীদের মধ্যে নাগ (সর্প)-পূজা প্রচলিত ছিল বলিয়াও অনেকে অনুমান করেন। ইঁহারা হয়ত জল-দেবতার পূজাও করিতেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মৃতদেহের সৎকার

সিন্ধু-উপত্যকার মৃতদেহ-সৎকার সম্বন্ধে এখনও একেবারে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নাই। মোহেন্-জো-দড়োতে এখনও এই বিষয়ে গবেষণার যথেষ্ট উপাদান আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে সিন্ধু-উপত্যকায় মৃতদেহ-সৎকারের তিন প্রকার প্রণালী বিদ্যমান ছিল বলিয়া আপাততঃ অনুমান করা হইয়াছে।

(১) পূর্ণ সমাধি (Complete burial)

(২) আংশিক সমাধি (Fractional burial)

(৩) দাহান্তর সমাধি (Post-cremation burial)

প্রথম প্রণালীর সৎকারের প্রমাণ মোহেন্-জো-দড়ো, হরপ্পা, লোথাল এবং বেলুচিস্তানে পাওয়া গিয়াছে। এই প্রথানুসারে পূর্ণাঙ্গ মৃতদেহকে শায়িত অথবা উপবিষ্টভাবে এক পার্শ্বে প্রোথিত করা হইত। হরপ্পার সমাধি-ক্ষেত্রের দ্বিতীয় স্তরেও এইরূপ পূর্ণ সমাধির বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। হরপ্পাতেও লোথালে[১] এই সমাধির সঙ্গে মাটির কলসী, থালা, মালসা, গেলাস, উপহার-পাত্র প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়।

হরপ্পার দুর্গ অঞ্চলের দক্ষিণে ৫৭টি সমাধির নিদর্শন ১৯৩৭-১৯৪১ সালের মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।[২] ঐগুলির বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মৃতদেহগুলি উত্তর দক্ষিণে শায়িত অবস্থায় ছিল। ইহাদের মস্তক সাধারণতঃ উত্তর দিকেই থাকিত। মৃত দেহের সঙ্গে

১ Indian Archaeology 1958-59—A Review, Pl. XX.

২ Wheeler, Ind. Civil. p 48.

১৫।২০ হইতে আরম্ভ করিয়া কোন কোন স্থলে ৪০টি পর্য্যন্ত মৃৎপাত্র দেওয়ার উপযোগী করিয়া সমাধিক্ষেত্র তৈরী করা হইত। কোন কোন মৃতদেহে পরিধানের অলঙ্কারপত্রও থাকিত।। শাঁখার চুড়ী, গলার হার, নানা জাতীয় পায়ের মল, তামার আংটি, এবং কাণের তামার দুল প্রভৃতি পরিহিত অবস্থায় মৃতদেহ দেখা যায়।। প্রসাধন-দ্রব্য, হাতলযুক্ত তামার দর্পণ, ঝিনুক, অঞ্জন-শলাকা এবং শঙ্খের চামচ প্রভৃতিও কোন কোন মৃতদেহের সঙ্গে দেওয়া হইত।।

হরপ্পাতে আবিষ্কৃত দুইটি মৃতদেহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি মৃতদেহের চতুর্দ্দিকে আয়ত ক্ষেত্রের মত কাচা ইট দিয়া একটি প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিয়া শবটি রক্ষিত হইয়াছিল। সঙ্গে মৃৎপাত্রাদি রহিয়াছে। দ্বিতীয়টিতে দৈর্ঘ্যে ৭ ফুট এবং প্রস্থে ২ হইতে ২½ ফুট দেবদারু কাঠের ১½ ইঞ্চি পুরু তক্তায় তৈরী বাক্সে জনৈক স্ত্রীলোকের মৃতদেহ সমাহিত করা হয়। মৃতদেহটি প্রথমে খাগড়া দ্বারা বেষ্টিত করিয়া বাক্সে রাখা হইয়াছিল বলিয়া কোন কোন চিহ্ন হইতে নাকি অনুমান হয় বলিয়া হুইলার মনে করেন। এইরূপ সমাধি সুমের দেশেও প্রচলিত বলিয়া তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।[১] ঐ স্ত্রীলোকটির দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলিতে তামার আংটি, মস্তকের নিকটে শঙ্খের একটি এবং বাম স্কন্ধের নিকটে আরও দুইটি আংটি দেখিতে পাওয়া যায়। ৩৭টি মৃতপাত্রও এই সঙ্গে ছিল, তবে ঐগুলির মধ্যে একটি মাত্র শবাধারের ভিতরে দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ সমাধি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক, এবং এ দেশে আর বিশেষ দেখা যায় নাই। মেসোপটেমিয়াতে সার্‌গোণের যুগে এবং তৎপুর্ব্ববর্ত্তী যুগে এইরূপ সমাধি দেখা যায়।

দ্বিতীয় প্রণালীর অর্থাৎ আংশিক সমাধি মোহেন্-জো-দড়ো, হরপ্পা এবং বেলুচিস্তানের অন্তর্গত নাল নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১ Ibid. p 48-49

এই প্রথানুসারে মাটীর বড় বড় হাঁড়িতে মৃতের মস্তক এবং কতকগুলি অস্থি রক্ষা করিয়া ভূগর্ভে প্রোথিত করা হইত। হরপ্পার সমাধি-ক্ষেত্র হইতে এইরূপ অস্থিপূর্ণ বহু মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১] এই মৃৎপাত্রের আকার ও আয়তন সাধারণ পাত্র হইতে ভিন্ন। এইগুলির বহির্দ্দেশে নানাপ্রকার চিত্র অঙ্কিত হইত। সাধারণতঃ ময়ূর, গো, বন্য ছাগ কিংবা হরিণের চিত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। বৃক্ষ ও লতা-পাতার ছবিও অঙ্কন করা হইত। এইরূপ মৃৎপাত্র-চিত্রের জন্য হরপ্পাই বিখ্যাত। অনেকে অনুমান করেন প্রথমে মৃতদেহ উন্মুক্ত প্রান্তরে নিক্ষেপ করা হইত এবং পশুপক্ষীতে মাংসাদি ভক্ষণ করিয়া ফেলিলে কয়েক দিন পর মৃতের মস্তক ও কয়েক খণ্ড অস্থি পাত্র-মধ্যে রাখিয়া ভূগর্ভে প্রোথিত করা হইত।[১]

৩। তৃতীয় প্রথানুসারে মৃতদেহ দাহ করা হইত এবং দাহাবশিষ্ট কয়েক খণ্ড অস্থি ও ভস্ম কোন মৃৎপাত্রে রক্ষিত হইত। এই মৃৎপাত্র সাধারণতঃ ভূগর্ভে প্রোথিত করা হইত। হরপ্পার কোন ইষ্টক-বেদীতে ক্ষোদিত গর্ত্তে রক্ষিত এক মৃৎপাত্রে ভস্ম ও মৃত্তিকাদি পাওয়া গিয়াছে। সেখানে আবার চতুষ্কোণ এক মঞ্চের মধ্যে দুইটি গর্ত্তে ভস্ম ও দগ্ধ অস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সমস্ত প্রাচীন সমাধি-শেষ বলিয়া অনুমিত হয়।[২]

মোহেন্-জো-দড়োতে হরপ্পার মত সমাধিস্থান হিসাবে স্বতন্ত্র কোন স্থান এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। বিচ্ছিন্নভাবে স্থানে স্থানে নর-কঙ্কাল ও নর-কপাল প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মনে হয়, মোহেন-জো-দড়োর সমাধিস্থান এখনও লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহা

১ হরপ্পাতে মানুষের মস্তক ও অস্থিপূর্ণ শতাধিক মৃদ্ভাণ্ড ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

২ Arch. Sur. Rep., 1924-25, pp.74f ; also pls. XXIV. (a), (b) ; XXV (c), (d).

আবিষ্কৃত হইলেই এখানকার সমাধি-প্রসঙ্গে আরও অনেক তথ্য নির্ণীত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তবে এখন পর্য্যন্ত যে সব উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে, এই সব পরীক্ষা করিয়া স্যর্ জন্ মার্শাল্ অনুমান করেন, সিন্ধু-সভ্যতার যুগে মোহেন্-জো-দড়োতে প্রধানতঃ শব-দাহ এবং দাহান্তর দগ্ধ অস্থির সমাধি অনুষ্ঠিত হইত। পূর্ণ সমাধি ও আংশিক সমাধি সম্ভবতঃ পশ্চিম হইতে আগত বিদেশীয়দের প্রভাবে সিন্ধু-উপত্যকায় ক্রমশঃ স্থান লাভ করিয়াছিল বলিয়া তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন।[১]

১ M. I. C., Vol. I. p. 90.

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ধাতু

মানব-সভ্যতার আত্মস্ফুরণে ধাতুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান। যব এবং গমের ব্যবহার, পশু-পালন, হস্ত-দ্বারা ও কুলাল-চক্রে মৃৎপাত্র-নির্ম্মাণ এবং তামা ও ব্রোঞ্জের আবিষ্কার ও ব্যবহার প্রভৃতিতে সভ্যতার ধারা একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এই সমস্তের মধ্যে তামার আবিষ্কারই সম্ভবতঃ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইলিয়ট্ স্মিথ্ (Elliot Smith)-প্রমুখ পণ্ডিতেরা ইজিপ্ট্কে তামা-আবিষ্কারের কেন্দ্র ও জগতের সভ্যতা-বিস্তারের অগ্রদূত বলিয়া মনে করেন। গর্ডন্ চাইল্ড্ (Gordon Childe)-এর মতে সুমের দেশ (Sumer) তামা-আবিষ্কারের প্রথম ক্ষেত্র। সুসা (Susa) এবং আনাউ (Anau) নামক স্থানেও উল্লিখিত ধাতব পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের সিন্ধুতীরবর্ত্তী মোহেন্-জো-দড়োতেও তাম্র ও ব্রোঞ্জ্-নির্ম্মিত পুরাবস্তু পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত দেশ খ্রীষ্টের জন্মের ন্যূনাধিক তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। উল্লিখিত সমস্ত স্থানেই সভ্যতার একটা সাধারণ ধারা এবং সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। পশুপালন, কৃষিকর্ম্ম, সূতাকাটা, চক্রে মৃন্ময়-পাত্র-নির্ম্মাণ এবং তাহাতে চিত্রকলার প্রবর্ত্তন, তামার আবিষ্কার ও বহুল প্রচার, এবং লৌহ সম্বন্ধে মানুষের অজ্ঞতা প্রভৃতি এই সকল স্থানের তৎকালীন বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক স্থানে আবার পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আত্মস্ফুরণের একটা স্বাতন্ত্র্যও দেখিতে পাওয়া যায়। এই তাম্রযুগের সভ্যতার মুল কেন্দ্র যে কোথায় ছিল তাহা বলা খুব কঠিন। বৈদিক আর্য্যদের "অয়স্"-এর সঙ্গে এই সমস্ত প্রাগৈতিহাসিক তাম্রযুগের কোন সম্পর্ক আছে কি-না ভাবিবার বিষয়। তাম্রযুগের চওড়া কুঠার

(flat celt) ভারতবর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম-ইউরোপ্ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশেরই প্রাচীন কেন্দ্রগুলিতে আবিষ্কৃত হইতেছে। ইহাদের মধ্যেই বা কি সম্বন্ধ আছে? এই সব বিষয়ে পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া দরকার। মোহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত ধাতব পদার্থের বিষয় বর্ত্তমানে আলোচনা-প্রসঙ্গে কিছু কিছু তুলনা করিতে চেষ্টা করিব।

স্বর্ণ

চাকচিক্য এবং সৌন্দর্য্যের জন্য ধাতুর মধ্যে স্বর্ণই বোধ হয় মানুষের দৃষ্টি সর্ব্বপ্রথম আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু তাম্রযুগে ধাতু দ্রবীকরণ-প্রণালী আবিষ্কারের পূর্ব্বে ইহাকে কাজে লাগাইবার সুযোগ খুব কমই ঘটিয়াছিল। এই প্রণালী আবিষ্কারের পর হইতে সোনার গহনাপত্র প্রভৃতি নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। বৈদিক আর্য্যেরা সোনাকে "হিরণ্য" বলিতেন। ইঁহারা হিরণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মোহেন্-জো-দড়ো এবং হরপ্পা নগরেও সোনার বিবিধ অলঙ্কার আবিষ্কৃত হইয়াছে। পুরাকালে নদী-সৈকত হইতে সোনা সংগৃহীত হইত। ঋগ্বেদে সিন্ধুনদীকে "হিরণ্যয়ী[১]", "হিরণ্যবর্তনি"[২] প্রভৃতি বিশেষণযুক্ত করা হইয়াছে। প্রাচীন ভারতীয়েরা ভূগর্ভ হইতেও খনিজ স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে জানিতেন বলিয়া বেদে[৩] প্রমাণ পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় সংহিতার[৪] ও শতপথব্রাহ্মণের[৫] ঋষিরা স্বর্ণ-প্রক্ষালন-প্রণালী অবগত ছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়।

১ R. V., X. 75. 8.

২ R. V., VIII. 26. 18

৩ R. V., I. 117. 5.; A. V. XII. 1. 6.

৪ Tait. Sam., VI. 1. 7. 1

৫ Sat. Br., II. 1. 1. 5.

মোহেন্-জো-দড়োর স্বর্ণাভরণ আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রাগৈতিহাসিক ভারতে ব্যবহৃত স্বর্ণ সম্বন্ধে আমাদের একটা অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োর স্বর্ণে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে ইংরাজীতে ইলেক্‌ট্রোন্ (electron) বলা হয়। এইরূপ মিশ্রিত স্বর্ণ মহীশূরের কোলার (Kolar) এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনন্তপুরের স্বর্ণখনিতে দেখিতে পাওয়া যায়। স্যর্ জন্ মার্শল্-প্রমুখ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, দক্ষিণাপথের উল্লিখিত স্থানসমূহ হইতে সম্ভবতঃ সিন্ধু-উপত্যকায় স্বর্ণ আমদানী করা হইত।[১] মোহেন্-জো-দড়োতে যে স্বর্ণকারের শিল্প যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল ইহা গহনাপত্রের নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিলেই বুঝা যায়। হরপ্পার স্বর্ণকারেরা সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে বিশেষ দক্ষ ছিল। মোহেন্-জো-দড়োতে রৌপ্যপাত্রে রক্ষিত সোনার কণ্ঠহার (necklace), হাতের বলয়, কানের দুল, মাথার বন্ধনী[২] (fillet) ও চূড়া, সূচ এবং মালা প্রভৃতি নানাবিধ স্বর্ণদ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। বেদেও এইরূপ নানাবিধ সোনার গহনাপত্রের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। গলার নিষ্ক[৩] (ঋগ্বেদ 1. 26. 2 হইতে মনে হয় নিষ্ক মুদ্রা হিসাবেও ব্যবহৃত হইত) ও কর্ণশোভনা[৪] প্রভৃতির উল্লেখ আছে। বৈদিকযুগে স্থলবিশেষে স্বর্ণ-পাত্রেরও[৫] প্রচলন ছিল। বৈদিকযুগের অষ্টাপ্রুত্, শতমান,[৬] কৃষ্ণল[৭] প্রভৃতিকে পণ্ডিতেরা ভারতীয় স্বর্ণমুদ্রার আদিম অবস্থা বলিয়া অনুমান

১ M.I.C., Vol. I. p. 30.

২ এইরূপ মস্তক-বন্ধনী সুমেরবাসীদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।

৩ R. V., II. 33. 10.; VIII. 47. 15., etc.

৪ R. V., VIII. 78. 3.

৫ Tait. Sam., III. 4. 1. 4; Kathaka Sam., XIII. 10.

৬ Sat. Br., V. 5. 4. 16. XII. 7. 2. 13.

৭ Tait. Sam., II. 3. 2. 1. Kathaka Sam., XI. 4., etc.

করেন। কিন্তু হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োর পুরাবস্তুর মধ্যে স্বর্ণমুদ্রার কোন চিহ্ন আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

রৌপ্য

মোহেন্-জো-দড়োতে সোনার চেয়ে রূপা অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশর ও সুমের দেশ অপেক্ষাও এখানে রূপার জিনিষ বেশী। মোহেন্-জো-দড়োর এই রূপা কোন স্থান হইতে আমদানী করা হইত সেই বিষয়ে কোন তথ্য এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। তৈত্তিরীয় সংহিতা,[১] কাঠক সংহিতা,[২] ও শতপথ ব্রাহ্মণ[৩] প্রভৃতিতে রজতের (রৌপ্যের) উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মোহেন্-জো-দড়োতে মূল্যবান্ অলঙ্কার-পত্র রাখার জন্য রৌপ্যপাত্র ব্যবহৃত হইত। নানারূপ মূল্যবান্ গহনাপত্রপূর্ণ এক রৌপ্যপাত্র ঐস্থানে ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ পাত্রের ভিতরে সোনা ও রূপার নানারূপ গহনা, বলয়, আংটি, বিভিন্নপ্রকার মালা, ও কয়েকটি ছোট পাত্র পাওয়া গিয়াছে। মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পা ভিন্ন গাঙ্গেরিয়াতেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের রৌপ্যদ্রব্যের নিদর্শন বর্ত্তমান আছে। প্রাচীন বৈদিকসাহিত্যেও[৪] রৌপ্য-নির্ম্মিত রুক্ম, পাত্র, ও নিষ্কের (মুদ্রা) উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

খ্রীষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থে উল্লেখ আছে, অ্যাব্রাহাম (Abraham)

১ তৈঃ সঃ ১।৫।১।২

২ কাঠক সঃ ১০।৪

৩ শতঃ ব্রাঃ ১২।৪।৪।৭, ১৩।৪।২।১০

৪ শতপথ ব্রাঃ ১২।৮।৩।১১, তৈঃ ব্রাঃ ২।২।৯।২, ৩।৯।৬।৩; পঞ্চবিংশ ব্রাঃ ১৭।১।১৪

এফ্রোনের (Ephron) নিকট হইতে রৌপ্য দিয়া কবরের স্থান ক্রয় করিয়াছিলেন।[১]

গাওল্যাণ্ড সাহেব (Gowland) বলেন, প্রায় খ্রীঃ পূঃ ৪৫০০ অব্দের ক্যালডিন-লেখে (Chaldaean Inscription) রৌপ্য দ্রব্যের মূল্য হিসাবে প্রচলিত ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে।[২]

তামা ও ব্রোঞ্জ্

প্রস্তরযুগের পরের যুগকে পণ্ডিতেরা 'ব্রোঞ্জ্-যুগ' বলিয়া থাকেন। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিতে গেলে এই নামটি সকল দেশে সমান-ভাবে প্রযোজ্য হয় না। কারণ প্রাচীন ভারতবর্ষ এবং ইহার সম-সাময়িক মিশর ও মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি কোন কোন স্থানে প্রথমে তাম্র প্রচলিত হয়, ইহা হইতে ক্রমে ক্রমে টিন ও তাম্রের সম্মিলিত ধাতু ব্রোঞ্জের আবিষ্কার হয়। কিন্তু ইউরোপের কোন কোন প্রধান দেশে প্রথম হইতেই প্রাকৃতিক অবস্থাতেই টিন ও তাম্রের সংমিশ্রিত ধাতু ব্রোঞ্জ্ পাওয়া যায় এবং সে সব স্থানে তাম্রযুগের পত্তনই হয় নাই; সে জন্যই তাঁহারা প্রস্তরযুগের পরবর্ত্তী যুগকে ব্রোঞ্জ্যুগ বলিয়া থাকেন। আমাদের দেশে কোন কালে ব্রোঞ্জ্যুগ ছিল না বলিয়া ভিন্সেণ্ট্ স্মিথ্ (V. A. Smith) মনে করেন।[৩] তিনি শুধু উত্তর-ভারতের কতিপয় স্থান এবং গাঙ্গেরিয়ার আবিষ্কারের উপর নির্ভর করিয়া প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি যখন এই বিষয়ে গবেষণা করেন তখন মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পার বিষয় লোকে জানিত না; এবং সেই সব স্থানে ভারতের

১ Encyclopaedia Br., vol. 20 (U. S. A. ed. 1946), p. 684

২ Ibid..

৩ I. A., 1905, pp. 229 f.

প্রাগৈতিহাসিক যুগের তাম্র বা ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত কোন দ্রব্য যে লুক্কায়িত থাকিতে পারে এই বিষয় কাহারও ধারণা হয় নাই। সেজন্য তৎকালে স্মিথ্ সাহেবের অনুমান সকলের কাছে চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। কিন্তু এখন হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োর আবিষ্কারের ফলে সেই সব স্থানে ভূরি ভূরি ব্রোঞ্জ্-নির্ম্মিত দ্রব্য ভূগর্ভ হইতে বাহির হইতেছে। এখানে লক্ষ্যের বিষয় এই যে, হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োতে বিশুদ্ধ তাম্র ও ব্রোঞ্জ্-নির্ম্মিত দ্রব্য একই সঙ্গে পাশাপাশি পাওয়া যাইতেছে। সে সময়ের কারিকরেরা যেমন এক দিকে খাঁটী তামার দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারিত সেইরূপ ব্রোঞ্জ্ তৈয়ারের কৌশল অবগত ছিল এবং তাহাদ্বারা নানারূপ দৈনন্দিন কার্য্যের জিনিষপত্র, অস্ত্রশস্ত্র ও প্রসাধন-সামগ্রীও নির্ম্মাণ করিতে পারিত।

মোহেন-জো-দড়োর তাম্র ও ব্রোঞ্জ্-নির্ম্মিত দ্রব্যকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ঃ—

(১) যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র, (২) নানাবিধ হাতিয়ার এবং (৩) অন্যান্য গৃহসামগ্রী।

ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক স্থানসমূহ হইতে যে সব দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা দেখিয়া মনে হয়, ভারতবর্ষ তৎকালে অস্ত্রশস্ত্রে বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল না। আক্রমণ-শস্ত্রের মধ্যে বর্শা, ছোরা, তীর ও ধনুক প্রভৃতিই উল্লেখযোগ্য। মোহেন্-জো-দড়ো প্রভৃতি স্থানে যে জাতীয় অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায়, বৈদিক আর্য্যদেরও প্রায় তৎসমুদয় ছিল। ঋগ্বেদে নানাজাতীয় আয়ুধের মধ্যে কুঠার (পরশু বা তেজঃ), বর্শা (ঋষ্টি, রম্ভিণী, শরু) এবং তরবারি (অসি বা কৃতি) প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ধনুক (ধনুস্, ধন্বন্) এবং বাণও যুদ্ধ-উপলক্ষে ব্যবহৃত হইত। তাঁহারা দুই প্রকারের বাণ ব্যবহার করিতেন। এক প্রকার বাণ বিষাক্ত, এবং ইহার অগ্রভাগ শৃঙ্গ (রুরুসীর্ষ্ণ)-নির্ম্মিত থাকিত। অন্য প্রকার বাণের অগ্রভাগ তাম্র বা ব্রোঞ্জ্-নির্ম্মিত (অয়োমুখ) হইত। দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ তাম্র বা ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত

বাণের অগ্রভাগ মোহেন্-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষে যুদ্ধের সরঞ্জাম যে বহুদিন পর্যন্ত অনেকটা একই প্রকার ছিল তাহা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-লেখ হইতেও বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন অসি, তোমর, বর্শা, কুঠার প্রভৃতি গতানুগতিক ভাবেই চলিয়া আসিয়াছে।

কুঠার

মোহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত কুঠারকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—(১) সরু লম্বা এবং (২) খাটো চওড়া। প্রথম শ্রেণীর কুঠারকে পণ্ডিতেরা 'চেপ্টা কুঠার' (flat celt) আখ্যা দিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর কুঠার ভারতবর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া সুসা, মেসোপটেমিয়া, ক্রীত্, মিশর ও ইউরোপের অনেক দেশে প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল। মোহেন্-জো-দড়োতে কুঠার-নির্ম্মাণের জন্য ব্রোঞ্জ্ অপেক্ষা তামারই প্রচলন বেশী ছিল। ট্রয়্ এবং ইজিয়ন্ (Aegean) দ্বীপে দ্রব্য-নির্ম্মাণে তামার পরিবর্ত্তে ব্রোঞ্জ্ প্রাচীন কাল হইতে ব্যবহৃত হইত বলিয়া গর্ডন চাইল্ড অনুমান করেন[১]। মিশরের প্রাচীন নাকদা সহরে প্রাপ্ত কুঠারের সঙ্গেও মোহেন-জো-দড়োর কুঠারের যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।[২] দ্বিতীয় শ্রেণীর খাটো ও চওড়া কুঠার মোহেন্-জো-দড়োতে বেশ সুরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। ঐগুলি বিজনোর-জেলায় প্রাপ্ত লক্ষ্ণৌ মিউজিয়ামে রক্ষিত তামার কুঠারের মত। মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলার গাঙ্গেরিয়ায় প্রাপ্ত কয়েকটি কুঠারের সঙ্গে মোহেন্-জো-দড়োর কোন কোন কুঠারের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়।

১ Gordon Childe, Bronze Age, p 61.

২ De Morgan, La Prehistoire Orientale, Vol. II, fig. 267,

বর্শা

মোহেন্-জো-দড়োর বর্শা সমসাময়িক মিশর বা মেসোপটেমিয়ার বর্শার মত নয়। এইগুলি অপেক্ষাকৃত পাতলা ও চেপ্টা। এইগুলিতে কোন গর্ত্ত কিংবা মধ্যভাগে কোন শিরা নাই, অধিকন্তু একটা লেজ (tang) আছে। এইরূপ বর্শা এখনও আফ্রিকার কোন কোন জাতি ব্যবহার করে। এইরূপ অনুন্নত প্রণালীর বর্শা দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন ইহা সভ্য সিন্ধুতীরবাসীদের নিজস্ব জিনিষ নয়। ইহা হয়ত কোন বিজিত অসভ্য জাতি হইতে প্রাপ্ত লুণ্ঠন-দ্রব্য। সমসাময়িক এলাম, সুমের প্রভৃতি স্থানে তৎকালে মধ্যভাগে শিরাযুক্ত এবং গর্ত্তবিশিষ্ট বর্শা ব্যবহৃত হইত। মোহেন্-জো-দড়োর প্রায় সমস্ত বর্শাই তাম্র-নির্ম্মিত—ইহাদের কয়েকটি পত্রাকৃতি।

ছোরা

বহু প্রাচান প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিশেষ বিশেষ সময়, আমরা আন্তর্জ্জাতিক সমান কিংবা বিভিন্ন আকারের দ্রব্যাদি পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়া থাকি। এইরূপ বৈশিষ্ট্যমূলক সময়-নির্দ্ধারণের জন্য কুঠার প্রভৃতি অপেক্ষা ছোরার মূল্য অনেক বেশী। ধাতু-যুগের পত্তন হইতেই সমগ্র জগতে ছোরার প্রচলন আরম্ভ হইতে দেখা যায়। আদিম যুগের ছোরা দেখিতে ত্রিকোণাকার এবং উভয় পার্শ্ব মোটামুটি চেপ্টা। ঐগুলি খুব ছোট এবং লম্বায় ৬ ইঞ্চির বেশী নয়।[১] অন্য লোকের শরীরে আঘাত করার উদ্দেশ্যেই ছোরা তৈরী করা হইত। পুরাকালে কাঠ, হাড়, হাতীর দাঁত কিংবা ধাতু দিয়া ছোরার হাতল নির্ম্মিত হইত। প্রাচীন ছোরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এক প্রকার ছোরার গোড়ার দিকে লম্বা লেজ থাকিত এবং দ্বিতীয় প্রকারের কোন লেজ থাকিত না।

১ Childe, Bronze Age, p. 75.

মোহেন্-জো-দড়োতে শুধু লেজবিশিষ্ট[১] ছোরাই আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পেরেক দিয়া হাতল আটকাইয়া দেওয়ার মত কোন ছিদ্র নাই। এইগুলির জন্য বাঁশের কিংবা কাঠের হাতলই ব্যবহৃত হইত। মিশরের সর্ব্বপ্রাচীন ছোরার অগ্রভাগ ত্রিকোণাকার, এবং গোড়ার দিক্‌ও ত্রিকোণাকার, সুতরাং সমগ্র ছোরাটা দেখিতে একটা চতুর্ভুজের মত। মেসোপটেমিয়ার সর্ব্বপ্রাচীন ছোরা লেজবিশিষ্ট এবং হাতলের সঙ্গে লাগাইবার জন্য লেজে পেরেক বসাইবার ছিদ্র (rivet-hole) আছে।[২]

বাণ-মুখ (Arrow-head)

মানবজাতির আদিম সভ্যতার সময়ে অর্থাৎ নব-প্রস্তর-যুগে (Neolithic age) এবং তাম্র-প্রস্তর-যুগেরও প্রথমভাগে বাণ-মুখ-নির্ম্মাণের জন্য চক্‌মকি পাথর এবং হাড় ব্যবহৃত হইত। ব্রোঞ্জ্‌যুগের প্রথম অবস্থায় মিশর দেশে এই উভয় দ্রব্য-দ্বারা বাণমুখ তৈরী হইত।[৩] তামা ও ব্রোঞ্জের বিস্তার-লাভের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা বাণের অগ্রভাগের জন্যও ব্যবহৃত হইতে লাগিল। হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োর ধ্বংসস্তূপ হইতে এখনও চক্‌মকি পাথরের কোন বাণ-মুখ আবিষ্কৃত হয় নাই। অন্য কোন কোন স্থান হইতে পাথরের বাণ-মুখ আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পা হইতে তাম্রনির্ম্মিত দ্বিধাবিভক্ত বাণমুখ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলি ঠিক পাথরের অনুকরণেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। মিশর, উত্তর-পারস্য এবং পশ্চিম-ইউরোপে নব-প্রস্তর-যুগ ও তাম্র-প্রস্তর-যুগে চক্‌মকি পাথরের যে সব নমুনা

১ M. I. C., Vol III. Pl. CXXXV. ৪, 5, 6.

২ Childe, Bronze Age, p. 77, Fig 7, No. 4.

৩ Ibid, pp. 93-4

পাওয়া যায়, এইখানে প্রাপ্ত বাণ-মুখে এইগুলিরই একটু সংশোধিত অনুকরণ দেখা যায়। এই আকৃতির ধাতুজ বাণ-মুখ প্রাচীন গ্রীস্ এবং ককেসাস্ (Caucasus) প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত ছিল। মধ্য ও অন্ত্য ব্রোঞ্জ্-যুগে ধাতুনির্ম্মিত দ্বিধাবিভক্ত নানারূপ লম্বালেজবিশিষ্ট বাণ-মুখ মিশর, গ্রীস্ ও মধ্য-ইউরোপে ব্যবহৃত হইত।[১]

এখানে ধাতুজ (তামা ও ব্রোঞ্জ্-নির্ম্মিত) অন্যান্য হাতিয়ার ও গৃহসামগ্রীর মধ্যে বাটালি, ক্ষুর, করাত, বড়শি, কাস্তে, বেধনী (awl), শলাকা ও সূচ প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়।

বাটালি

ধাতুজ বাটালির আবিষ্কার খুব কৌতূহলজনক। আদিম প্রস্তর-কুঠারের অনুকরণে ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ইহাদের পার্থক্য এই যে কুঠারগুলি চেপ্টা এবং বাটালিগুলি অপেক্ষাকৃত সরু। সিন্ধু-উপত্যকাতে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর বাটালি দেখিতে পাওয়া যায়।

(ক) চৌফলা-যুক্ত ও লেজহীন ; মুখের দিক্ চেপ্টা ও ধারাল।[২]

(খ) চৌফলা-যুক্ত কিন্তু গোড়ার দিকে হাতল লাগাইবার জন্য লেজযুক্ত।[৩]

(গ) গোল ও লম্বা।[৪]

প্রথম দুই জাতীয় বাটালি বহুসংখ্যক পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর বাটালির সংখ্যা খুব কম। প্রথম শ্রেণীর বাটালি পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও পুরাতন দ্রব্যের সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়।

১ Childe, Bronze Age, p 94.

২ M. I. C., Vol. III. Pl. CXXXV. 11. 14.

৩ Ibid, Pl. CXXXV. 12. 13. 15.

৪ Ibid, Pl. CXLII. 15.

দ্বিতীয় শ্রেণীর বাটালি মোহেন্-জো-দড়োর বিশেষ সৃষ্টি বলিয়া মনে হয়। এরূপ জিনিষ আর কোথাও এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। তৃতীয় শ্রেণীর বাটালির একদিক্ খুব সূক্ষ্মাগ্র। এইগুলি সম্ভবতঃ পাথরের কাজে ব্যবহৃত হইত। এইগুলির সাহায্যে বোধ হয় পাথর-ভাঙ্গা ও খোদাই প্রভৃতি কাজ করা হইত।

আদিম যুগের মানুষ পাতলা ও ধারাল চক্মকি পাথর দিয়াই ক্ষুরের কাজ চালাইত। মিশর প্রভৃতি দেশে প্রাচীন কালে যে সমস্ত ধাতুজ ক্ষুর ব্যবহৃত হইত ঐগুলি দেখিতে চক্মকি পাথরের ক্ষুরের মতই।[১] হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োতে চক্মকি পাথরের নমুনার কোন ক্ষুর আবিষ্কৃত হয় নাই। এমন কি ধাতু (ব্রোঞ্জ্)-নির্ম্মিত ক্ষুরের সংখ্যাও এই উভয় স্থানেই খুব অল্প এবং ইহাদের আকৃতিরও বিশেষত্ব আছে।

বৈদিক সাহিত্যে ক্ষুর এবং ক্ষুরের উপযোগিতার বিষয় বহুল উল্লেখ আছে।[২]

করাত

ভাল এবং ভগ্ন অবস্থায় কয়েকখানা করাত মোহেন্-জো-দড়োতে পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি ব্রোঞ্জ্-নির্ম্মিত। ভাল করাতগুলি দেখিতে ঠিক আধুনিক যুগের লৌহ-নির্ম্মিত করাতের মতই। মোহেন্-জো-

১ Childe, Bronze Age. p. 97.

২ R. V. I. 165. 10 ; X. 142. 4 ; A. V. VI. 68. 1. 3, VIII. 2. 7. 17 ; Sat. Br. II. 6. 4. 5., III, 1. 2. 7 ; Tait. Sam. II. 1. 5. 7., 5. 5. 6., IV. 3. 12. 3., V. 6. 6. 1 ; Mait. Sam. 1. 10. 14. etc ; Kath. Sam. VI. 3. 12. 3. ; Nir V. 5. ; Vaj. Sam. XV. 4.

দড়োর করাতের গোড়ার দিকে পেরেক দিয়া হাতলে আটকাইবার জন্য দুইটি করিয়া ছিদ্র আছে। এই ব্রোঞ্জ্-নির্ম্মিত করাত বোধ হয় প্রাচীনকালে শঙ্খ কাটিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমান যুগে শাঁখারীরা লোহার করাত দিয়া শঙ্খ কাটিয়া থাকে।

বড়শি

ব্রোঞ্জ্-নির্ম্মিত ছোট এবং বড় নানারূপ বড়শি মোহেন-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের কয়েকটি খুব সুন্দর ও অভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। কয়েকটি ভগ্ন অথবা ক্ষয় প্রাপ্ত অবস্থায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই আকৃতির তাম্র-নির্ম্মিত বড়শি মিশর দেশের নাকদা (Naqada) নামক স্থানেও পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু উহাদের বিশেষত্ব এই যে মুখের দিকে কোন হুল বা ফলা (barb) নাই এবং উপর দিকে সূতা লাগাইবার জন্য চক্ষুর মত একটি করিয়া গর্ত্ত আছে।[১]

কাস্তে

এখানে কাস্তের ভাঙ্গা টুকরা পাওয়া গিয়াছে। ইহা দেখিতে কতকটা গোলাকার এবং ইহার ভিতরের দিক্ অপেক্ষা বাহিরের দিক্ পাতলা ও ধারাল। এই দিক্ই বোধ হয়, কাটিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। মেসোপটেমিয়ার 'কিশ' নামক স্থানে এইরূপ কাস্তের কতকগুলি ভগ্নখণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে। ডাঃ ম্যাকে এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।[২]

১ De Morgan, Prehistoire Orientale, Vol. II. p. 214, Fig. 267.

২ M. I. C, Vol. II, p. 501.

বৈদিক সাহিত্যে[১] "দাত্র" শব্দের উল্লেখ আছে। ইহাকে কোন কোন পণ্ডিত কাস্তে (sickle) বলিয়া মনে করেন।

বেধনী (Awl)

সিন্ধু-উপত্যকার বেধনীর কোন কোনটি দুই দিকেই, আবার কোন কোনটি একদিকে সূক্ষ্ম; এইগুলি তিন চারি ইঞ্চি লম্বা। মিসর দেশের নাকদা (Naqada) নামক স্থানের বেধনী দেখিতে এখানকার মতই।[২]

ম্যাকডোনেল্ (Macdonell) ও কিথ্ (Keith) ঋগ্বেদে উল্লিখিত[৩] পূষদেবের 'আরা' নামক অস্ত্রকেই পরবর্ত্তী কালের চামড়া ছিদ্র করার বেধনী বলিয়া অনুমান করেন। ঋগ্বেদের[৪] কোন কোন স্থানে বর্ণিত আছে মরুত্ এবং ত্বষ্টা 'বাশী' নামক অস্ত্র ব্যবহার করিতেন। অথর্ব্ববেদে ব্যবহৃত[৫] এই শব্দে ছুতারের (carpenter) ছুরি বুঝায় এইরূপ মনে করা হয়। সায়ণাচার্য্যের মতে এই শব্দের অর্থ বেধনীও হইতে পারে।

সূচ (Needle)

এখানে তামা এবং ব্রোঞ্জের কতকগুলি তারের মত জিনিষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলির এক দিকে চোখের মত একটি করিয়া

১ বেদে বলা হইয়াছে গরুর কানে দাত্রের মত চিহ্ন দেওয়া হইত (দাত্রকর্ণঃ)। R. V. VIII. 78. 10.; Nirukta, II, 1; Mait. Sam. IV. 2. 9.

'দাত্র' হইতেই বঙ্গদেশে প্রচলিত দা' অথবা 'দাও' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

২ De Morgan, *op. cit.*, Vol. II, p. 214, Fig. 267.

৩ R. V. VI. 53. 8.

৪ R. V. 1. 37. 2.; 88. 3.; V. 53. 4.; VIII. 29. 3.

৫ A. V. X. 6. 3.

গর্ত্ত আছে। এইজন্য এইগুলি স্চ বলিয়া মনে হয়। মিসরের নাকদা (Naqada) নামক স্থানেও এই নমুনার স্চ আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১]

ঋগ্বেদের যুগে স্চকে 'বেশী' বলা হইত বলিয়া অনেকে মনে করেন।[২]

শলাকা (Rod)

তামা ও ব্রোঞ্জের লম্বা শলাকা এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের উভয় দিক্ গোল। কাজেই কোন জিনিষ ছিদ্র করার উদ্দেশ্যে ইহারা ব্যবহৃত হইত না। এইগুলির ব্যবহারবিষয়ে কেহ কিছু ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না। ডাঃ ম্যাকে অনুমান করেন, এইগুলি অঞ্জন-শলাকারূপে ব্যবহৃত হইত। আধুনিক মিসরে অঞ্জন-প্রয়োগের জন্য এইরূপ শলাকার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া তিনি এইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। প্রাচীন মিসরেও এই কার্য্যের জন্য শলাকা ব্যবহৃত হইত বলিয়া তিনি অনুমান করেন। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে এখনও এইরূপ অঞ্জন-শলাকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আরশি

গোলাকার এবং হাতল সংযুক্ত তামা ও ব্রোঞ্জের আরশিও এখানে পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি এত মসৃণ করা হইত যে আকৃতি সহজেই ইহাতে প্রতিবিম্বিত হইত।[৩]

১ De Morgan, *op. cit.*, Vol. II, p. 214, Fig. 267.

২ R. V. VIII. 18. 17. *Cf.* Hopkins, Journal of the American Oriental Society, 15, p. 264 n.

৩ বঙ্গদেশে বিবাহের সময় বর ও কন্যার হাতে ব্রোঞ্জ বা কাংস্য নির্ম্মিত দর্পণ এখনও প্রদত্ত হইয়া থাকে। ধাতু নির্ম্মিত দর্পণ ব্যবহারের মূলসূত্র কি মোহেন্-জো-দড়ো হইতেই? বিবাহের সময় দর্পণ ধারণের প্রথা কালিদাসের সময়েও প্রচলিত ছিল। বিবাহের সময় পার্বতীর হাতেও দর্পণ ছিল বলিয়া কুমার সম্ভবে (৭।২৬) বর্ণিত আছে।

ফাঁড়ি (Spacer)

তামা ও ব্রোঞ্জের বহু ফাঁড়ি[১] মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। মালা কিংবা মেখলার লহর প্রবেশ করাইবার জন্য ঐগুলিতে দুইটী হইতে ছয়টী পর্যন্ত ছিদ্র থাকিত। তামা কিংবা ব্রোঞ্জের সাদাসিদে লম্বা টুকরাতে ছিদ্র করিয়া সাধারণ ফাঁড়ি তৈরী হইত।

অন্যান্য গৃহ-সামগ্রী

ধাতুজাত অন্যান্য গৃহসামগ্রীর মধ্যে বাসন-কোসন, ছোটদের খেলনা, প্রসাধন দ্রব্য এবং গহনাপত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নানা জাতীয় বাসনকোসনের মধ্যে তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরী কতকগুলি নমুনা বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক।[২] এই ধাতুজ ভাণ্ডের ঠিক একই আকৃতিবিশিষ্ট মৃত্তিকানির্ম্মিত কতকগুলি ভাণ্ডও এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মাটী[৩] ও ধাতুর[৪] ভাণ্ডের উদরদেশে একই নমুনার শিরা বর্ত্তমান আছে। ঠিক একই আকৃতিবিশিষ্ট মৃন্ময় ও ধাতুজ কলসীও এখানে পাওয়া গিয়াছে। তামা ও ব্রোঞ্জের থালা ও ঢাক্নিগুলি অতিশয় মনোরম। এইগুলি দেখিয়া মনে হয় মোহেন্-জো-দড়োর শিল্পীরা ধাতুদ্রব্য-নির্ম্মাণে কতই না পরিপক্ক হস্তের পরিচয় দিতে পারিত। পান-পাত্র, মালসা, হাঁড়ি ও কলসী প্রভৃতি দ্রব্যে মৃত্তিকা, তাম্র ও ব্রোঞ্জ্ প্রভৃতি উপাদানের বিভিন্নতায় আকৃতির বিশেষ কোন পার্থক্য হইত না।

১ নরম পাথর, পোড়া মাটী, ফায়েন্স, সাদা মণ্ড, শঙ্খ এবং সোনা প্রভৃতিও ফাঁড়ি তৈরী করার জন্য ব্যবহৃত হইত।

২ M. I. C., Vol III, Pl. CXL, CXLI.

৩ Ibid, Pl. LXXXVI, No, 22

৪ Ibid, Pl. CXL, Nos. 7, 18

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দ্রব্যের মধ্যে তৃতীয় যুগের (Late Period) একখানা ছোট ভারী থালা এবং ইহার ঢাক্নি দেখিতে খুব চমৎকার।[১] এইরূপ আরও অনেক সুন্দর জিনিস দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি, যেমন কড়া (pan) ও কলসী-ঢাক্নি প্রভৃতি শিল্পীর অত্যন্ত নিপুণ হস্তের পরিচায়ক।

সীসা

সীসা নির্ম্মিত দ্রব্য এখানে খুব অধিক সংখ্যায় আবিষ্কৃত হয় নাই। যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে কয়েকটি ছোট থালা এবং ওলন-যন্ত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। মধ্যে মধ্যে সীসার ডেলাও দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারত, রাজপুতানার অন্তর্গত আজমীর, আফগানিস্তান এবং পারস্য প্রভৃতি স্থান হইতে সীসা আমদানী করা হইত বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।

১ Ibid, Pl. CXLII, No. 1,

নবম পরিচ্ছেদ

মৃৎশিল্প ও মৃৎপাত্র-রঞ্জন

হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োতে নানা জাতীয় অসংখ্য মৃৎপাত্রের মধ্যে হাঁড়ি, মট্‌কী, কলসী, শরা, গেলাস, গামলা, কড়া, পেয়ালা, ধুনুচি, থালা, বাটী, রেকাব, চুল্লী, জালা, খাঁচা, দীপ, চামচ, ঘট, উপহার-পাত্র (offering stand), পানপাত্র, ঢাকনি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ঐগুলির মধ্যে আবার লম্বা, বেঁটে, নলাকৃতি, ঢেউ-তোলা, সরু-গলা ও সরু-তলার অনেক প্রকারের পাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে শির-ওয়ালা, খাঁজ-কাটা, হাতল-ওয়ালা নমুনাও আছে। স্থানে-স্থানে এমন এক-এক প্রস্থ সুন্দর ও মসৃণ পাত্র পাওয়া গিয়াছে যে এইগুলি দেখিলে এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাস্ফীত লোককেও অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। যে সময়ে প্রস্তরের ব্যবহার আস্তে আস্তে সভ্য জগৎ হইতে বিরল হইতেছে অথচ তাম্র ও ব্রোঞ্জ্ পূর্ণমাত্রায় নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনের দ্রব্যসম্ভারের অভাব দূর করিতে অপ্রচুর, এইরূপ সময়ে জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই মৃৎশিল্পের খুব উন্নতি দেখা যায়। সিন্ধু-উপত্যকায়ও এই প্রাকৃতিক নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। এই সময়ে সেখানেও মৃৎশিল্পের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। তত্রত্য অধিবাসীরা কোন কোন বিষয়ে আধুনিক যুগের মতই উন্নত প্রণালীর নাগরিক জীবন যাপন করিত। সর্ব্বদা বসবাসের জন্য ইষ্টক-নির্ম্মিত মনোরম গৃহ নির্ম্মাণ করিত। দ্বিতল, ত্রিতল গৃহের ছাদ হইতে জল নিকাশের জন্য আধুনিক যুগের মত মৃন্ময় নল (pipe) নির্ম্মাণ করিয়া খাড়াভাবে দেয়ালের সঙ্গে বসাইয়া দিত। স্থাপত্য ও পূর্ত্তকর্ম্মে ইহারা যে কোন হিসাবে পশ্চাৎপদ ছিল না, ইহা তাহাদের নানারূপ গাঁথনির দেয়াল, মঞ্চ, ড্রেন্ ও রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি দেখিলে নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হয়।

এত বড় একটা সভ্যজাতির শিশুদের খেলা ও আমোদ-প্রমোদ চাই। কাজেই তাহাদের জন্য মাটী দিয়া নানারূপ খেলনা—মানুষ, গরু, মহিষ, ভেড়া, বানর, শূকর, মুরগী, পাখী, মার্ব্বেল ও গাড়ী প্রভৃতি—তৈরী হইল। গরীব লোকদের জন্য মাটীর বলয়, আংটী, মালা ও মেখলা প্রভৃতি নির্ম্মিত হইল। জেলেদের জাল ডুবাইবার জন্য মাটীর ভারী কড়া, সৌখান লোকদের খেলার জন্য মাটীর (ও পাথরের) পাশা ও ঘুঁটি প্রভৃতির সৃষ্টি হইল। অবস্থাপন্ন লোকদের জন্য মোহেন্-জো-দড়োতে মৃত্তিকাকেই কাচের মত চক্‌চকে ও মসৃণ করিয়া যে নানারূপ দ্রব্য নির্ম্মিত হইত, এইরূপ প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। সিন্ধু-উপত্যকার কাচবৎ মৃৎপাত্রই (glazed pottery) যে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব প্রাচীন, ইহা বিশেষজ্ঞেরা এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।[১]

ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলেও বৈদিক সাহিত্যে কুলাল (potter)[২], কুলালচক্র[৩] (potter's wheel), এবং বহু মৃৎপাত্রের নাম ও বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সিন্ধু-উপত্যকায় আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রের ন্যায় বহু পাত্রই বৈদিকযুগে যাগ-যজ্ঞ কিংবা দৈনন্দিন কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। প্রায় ৩০।৪০ প্রকারের পাত্র বৈদিক ঋষিরা ব্যবহার করিতেন। এইগুলির মধ্যে পানীয়ের জন্য পাত্র[৪] (drinking vessel), পুরোডাশের (sacrificial cake)

১ Marshall, M. I. C., Vol. I. p. 38; Mackay, Vol II, pp. 578, 581

২ Vaj-Sam. XVI. 27.

Raghu Vira, Implements & Vessels used in Vedic Sacrifice, JRAS, April, 1934, pp. 283 ff.

৩ Sat. Br. XI. 8. 1. 1.

৪ RV. 1. 82. 4, 110. 5; II. 37. 4. etc. A. V. IV. 17. 4. VI. 142. 1, etc. Tait. Sam., V. 1. 6. 2., VI. 3. 4. 1. Vaj. Sam XVI 62, XIX. 86 etc,

জন্য 'পাত্রী'[১] (vessel), ব্রহ্মৌদনের জন্য 'পাজক'[২] (dish ?), এবং শস্যপরিমাপ[৩] কিংবা অগ্নি-প্রণয়নের জন্য শরাব (saucer) ব্যবহৃত হইত। জলের জন্য কুম্ভ বা কলস, দধি-দুগ্ধ রাখিবার এবং গো-দোহনের নিমিত্ত 'কুম্ভী' (small round jar) ছিল। আরও এক প্রকার কুম্ভী থাকিত। ইহাতে পশু-রন্ধন হইত বলিয়া ইহাকে পশু-কুম্ভী বলিত। জল সেচন করার জন্য বড় বড় ঘট থাকিত, ঐগুলিকে 'পরিসেচন-ঘট' বলা হইত। রন্ধন এবং দ্রব্যাদি উত্তপ্ত করার জন্য স্থালীর[৪] ব্যবহার ছিল। স্থালী মাটী দিয়া কিংবা হয়ত তাম্র দিয়াও নির্ম্মিত হইত।

বৈদিক আর্য্যরা মৃৎপাত্রের ভগ্ন খণ্ডগুলিও ফেলিয়া দিতেন না। ঐগুলিতে করিয়া তাঁহারা পুরোডাশ (পিষ্টক) প্রভৃতি অগ্নিতে সেঁকিতেন। এই ভগ্ন খণ্ডকে তাঁহারা 'কপাল' বলিতেন। আর্য্যরা যে সব মৃৎপাত্র ব্যবহার করিতেন হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োর অধিবাসীরা তাহাদের চেয়ে কোন অংশে হীন বা অল্পসংখ্যক পাত্র ব্যবহার করিত বলিয়া মনে হয় না। এইগুলির নমুনা এত বেশী ও সংখ্যা এত অসীম যে ভগ্ন পাত্রখণ্ড তাঁহাদের বিশেষ কোন কাজে লাগিত বলিয়া মনে হয় না। তবে ভগ্ন শরা কিংবা মৃৎ-পাত্রের বৃহৎ খণ্ড এখনও পল্লীগ্রামে পিষ্টকাদি সেঁকার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখনও শরা এবং মৃৎ-কপাল বঙ্গদেশের পল্লীগৃহে পিষ্টকাদি-নির্ম্মাণের কালে পুরাকালের বিলীন স্মৃতি সঞ্জীবিত করিয়া

১ Ait. Br, VIII. 17, Sat. Br I. 1. 2. 8., Sankh Sr. Sutra, V. 8. 2., *Cf*, Zimmer, Altindische Leben, 271,

২ Ap. Sr. Sutra, Monier William's Sans-Eng. Dictionary, S. V.

৩ Tait Br. I, 3, 4, 5, 6, 8, Sat. Br. V, 1, 4, 12,

৪ A. V. VIII, 6, 17, Tait Sam. VI. 10. 5, Vaj. Sam, XIX. 27. 86 etc.

দেয়। এই সব আচার-ব্যবহারের মূল সূত্র কোথায় ? আর্য্য সভ্যতায়, না সিন্ধু সভ্যতায় ?

হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োর প্রায় সমস্ত মৃন্ময় দ্রব্যই কুমারের চাকায় তৈরী। মূর্ত্তি এবং খেলনা ছাড়া হস্তনির্ম্মিত দ্রব্যের সংখ্যা অতি সামান্য। ঋগ্বেদে কুলালচক্রের উল্লেখ পাওয়া যায় না। শতপথ ব্রাহ্মণে ইহার বিষয় প্রথম জানা যায়। তবে উল্লেখ নাই বলিয়াই যে ঋগ্বেদের আর্য্যরা ইহার ব্যবহার জানিতেন না এরূপ অনুমান করা অন্যায়। মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পার কুম্ভকার যে মৃৎ-শিল্পে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পাত্রের বহির্দ্দেশের মসৃণতা, ভিতরের অসংখ্য সমান্তরাল সূক্ষ্ম রেখা এবং ঘূর্ণ্যমান চক্র হইতে রজ্জুর সাহায্যে পাত্র পৃথক্-করণের চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। হস্ত-নির্ম্মিত পাত্রে এই সব চিহ্ন থাকে না। সিন্ধু-উপত্যকায় সাধারণতঃ মৃৎপাত্রগুলি পোড়াইয়া লাল করা হইত। শতকরা নিরানব্বইটী এরূপ লাল। ধূসর বা পাংশু রংয়ের মৃত্তিকা দিয়াও সময় সময় পাত্রাদি তৈরী হইত।[১] পুরু ও পাতলা প্রভৃতি নানারূপ পাত্র এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কখন কখন ডিমের খোলার মত মসৃণ ও পাতলা পাত্রও দেখিতে পাওয়া যায়। পাত্রের আয়তন-অনুসারে শিল্পীরা পুরু এবং পাতলা ভাবে নির্ম্মাণ করিত। এই স্থানের পাত্রের উপাদান মৃত্তিকার মধ্যে অভ্রযুক্ত বালি বা চূর্ণ কিংবা উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

মৃৎপাত্র নানাভাবে তৈরী হইত। কোনটি এক সঙ্গেই ঘূর্ণ্যমান চক্রে নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ছুরি কিংবা রজ্জু দিয়া তলা কাটিয়া পৃথক্ করা হইত। আবার কোন কোন পাত্র দুই খণ্ডে নির্ম্মিত হইত। পাত্রের মাথা ও গলা স্বতন্ত্রভাবে নির্ম্মাণ করিয়া, খণ্ডদ্বয়

১ কিশ্ নগরে সারগোন নামক রাজার পূর্ব্বে এইরূপ পাত্রের প্রচলন ছিল।

শুষ্ক হওয়ার পূর্ব্বেই গলার সঙ্গে মাথার দিক্‌টা চক্রে চড়াইয়া সংযুক্ত করিতে হইত।[১] ইহাতে গলার দিকে কোণের সৃষ্টি হইয়া পাত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইত। পাত্র নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইলে ইহার বহির্দ্দেশে লাল কিংবা ঈষৎ পীত রংয়ের প্রলেপ লাগাইয়া স্বাভাবিক লালকে আরও উজ্জ্বল লাল কিংবা পীতাভ করা হইত। এখনও বঙ্গদেশে এবং অন্যত্র পাত্রের উপর ও গলার দিকে এইরূপ রং দেওয়ার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়।

পাত্রে সাজ দেওয়াও শিল্পকর্ম্মের আর একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। সজ্জাযুক্ত পাত্র লোক-সমাজে আদরের সামগ্রী ছিল। নানা উপায়ে এই সাজ দেওয়া হইত। এক প্রকার নিয়ম এই যে ঘূর্ণ্যমান চক্রের উপরিস্থিত পাত্রের বহির্দ্দেশে একটা রজ্জু বাঁধিয়া দিলেই, এই পাত্রের গায়ে সুন্দর রজ্জু-চিহ্ন অঙ্কিত হইত।[২] ইহাতে পাত্রের শোভা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইত। দ্বিতীয়তঃ পাত্র সম্পূর্ণ হইয়া গেলে শুষ্ক হওয়ার পূর্ব্বেই ইহাতে নানারূপ চিহ্ন ক্ষোদিত করা হইত। মোহেন্-জো-দড়োর মৃৎপাত্রে পরস্পর ছেদনকারী বৃত্ত-চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।[৩] কোন গোলাকার দ্রব্যের সাহায্যে এই বৃত্ত-চিহ্ন ক্ষোদিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কোন কোন পাত্রে, অর-যুক্ত চক্রের মত চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।[৪] আবার অর্দ্ধচক্রাকার নখচিহ্নবৎ সজ্জাও সিন্ধু-উপত্যকায় বিরল নহে।[৫] মৃৎপাত্রের অনুকরণে ফায়েন্স

১ এইরূপ পাত্র প্রাচীন কিশ্, জামদেত্‌নসর, সুসা ও মুস্যান্ নগরেও নির্ম্মিত হইত।

২ মেসোপটেমিয়াতে পাত্রের গায়ে এইরূপ রজ্জু চিহ্ন খ্রীঃ পূঃ ২০০০ অব্দ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। M I C, Vol. I. P.291.

হরপ্পাতেও এইরূপ সজ্জাযুক্ত মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে।

৩ M. I. C., Vol. III. Pl CLVII. Nos 2—4, 5.

৪ Ibid, Pl. CLVII. No 1

৪ Ibid, Nos. 3, 7

(faience) পাত্রেও যে সজ্জা হইত, ইহারও যথেষ্ট প্রমাণ মোহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পাতেই পাওয়া যায়।

কোন কোন পাত্রের বাহিরের দিকে দানার মত আছে। সময় সময় ঘূর্ণ্যমান চক্রের উপর নির্ম্মীয়মান পাত্রের গায়ে অঙ্গুলি-সংযোগে নানারূপ সজ্জার সৃষ্টি করা হইত। কোন কোন পাত্রের বহির্দ্দেশে চিত্রাক্ষরে কুম্ভকারের চিহ্ন কিংবা শীলমোহরের ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়।

উৎসর্গ-পাত্র বা নৈবেদ্য-পাত্র এখানে তিন প্রকার দেখা যায়ঃ

(ক) চেপটা-তলা-বিশিষ্ট [১]

(খ) সাজসজ্জাহীন-লম্বা-দণ্ডযুক্ত[২]

(গ) ছাঁচে-ঢালা-দণ্ডযুক্ত[৩]

প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিত্তনল্লুর নামক স্থানে যে মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাতেও উৎসর্গ-পাত্র আছে। কিন্তু ঐগুলির মাথায় মাটীর থালা সংযুক্ত নাই, পরন্তু মোহেন্-জো-দড়োর উৎসর্গ-পাত্রে থালা সংযুক্ত থাকিত। তবে, বাহিরের আকৃতিতে ঐগুলিকে মোহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত দ্রব্যের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে।[৪]

মৃত্তিকা ছাড়া, তামা ও ব্রোঞ্জ্ দ্বারাও উৎসর্গ-পাত্র মোহেন-জো-দড়োর সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিরা নির্ম্মাণ করাইতেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

তাম্র-প্রস্তর যুগে জগতের বহু সভ্যদেশে অর্থাৎ মিসর, এলাম (Elam), সুমের (Sumer), আনাউ (Anau), ক্রীত্ (Crete), হিসার্লিক (Hissarlik), ট্রান্সিল্ভানিয়া (Transylvania)

১ M. I. C, Vol III. Pl. LXXVIII. NO. 8, LXXIX. No. 2, 5.

২ Ibid, Pl. LXXIX, No. 1 ; 17

৩ Ibid, Pl. LXXIX, No. 21 ; 22 ; 23.

৪ Arch. Sur. Rep., 1903-4 Pl. LVII. Fig. I, 7-11

এবং আল্‌ত্‌-(Alt)-উপত্যকা প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন আকারের উৎসর্গাধারের বহুল প্রচলন দেখা যায়। তবে কিশ্‌ এবং মোহেন্‌-জো-দড়ো নগরের নৈবেদ্যাধারের মধ্যেই আকারের যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। লম্বা নৈবেদ্যাধার মেসোপটেমিয়াতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপে ব্যবহৃত হইত। উর্‌-নগরেও উৎসব-উপলক্ষে ইহাদের ব্যবহার ছিল। সুসা-নগরে ইহা সময় সময় হস্তে ধারণ করিয়া লোকেরা মিছিলে যোগদান করিত বলিয়া ডাঃ ম্যাকে অনুমান করেন।[১] মোহেন্‌-জো-দড়োতে ও হরপ্পাতে এই সব নৈবেদ্যাধার সম্ভবতঃ নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপ এবং দৈনন্দিন কার্য্য এই উভয়ের জন্যই ব্যবহৃত হইত বলিয়া তাঁহার ধারণা।[২]

সরু-তলার পেটে-খাঁজকাটা একরূপ নাতিবৃহৎ পাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি সংখ্যায় অজস্র। সিন্ধু-উপত্যকায় পুরা কালে এইরূপ হাজার হাজার পাত্র ব্যবহৃত হইত বলিয়া মনে হয়। এইগুলির মূল্য খুব কম ছিল এবং অতি সামান্য কাজের জন্যই ব্যবহৃত হইত বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে শিল্প-নৈপুণ্য বা সৌন্দর্য্য কিছুই নাই। বাহিরের দিক্‌ অন্যান্য পাত্রের মত মসৃণ নয়। তিন চারি বা পাঁচটি ব্যাবর্ত্তিত রেখা (spiral) দ্বারা বাহিরের খাঁজগুলি গঠিত। ভিতরেও এইরূপ আঙ্গুলের রেখা দেখা যায়। সরু-তলা বলিয়া এইগুলি মাটীতে বসাইয়া রাখা যায় না। এই পাত্র উৎসবাদিতে নিমন্ত্রিতের জল পানের জন্য ব্যবহৃত হইত বলিয়া মনে হয়। কারণ ইহা স্থায়ী ব্যবহারে লাগিলে হয়ত সংখ্যায় এত বেশী পাওয়া যাইত না। স্থায়ী ব্যবহারের পাত্র সাধারণতঃ দেখিতে ভাল ও মজবুত হইত। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের পান-ভোজনের পর বোধ হয় এই পাত্র ফেলিয়া দেওয়া হইত। আজ-কালও বঙ্গদেশে কিংবা উত্তর-ভারতের অনেক স্থানে পানাহারের জন্য

১ M. I. C., Vol. 1, p. 296.

২ Ibid, p. 296.

মৃৎপাত্র একবার ব্যবহার করিয়াই পরিত্যাগ করা হয়। শক্ত খাদ্যদ্রব্য পাতায় রাখা যায়, কিন্তু তরল জিনিস ও জলের জন্য পাত্রের দরকার। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সম্ভবতঃ পৃথক্ পৃথক্ পাত্র দেওয়া হইত। এইরূপ পাত্র সিন্ধু-উপত্যকায় এক এক স্থানে স্তূপাকারে পড়িয়া আছে। তলা সরু দেখিয়া মনে হয় ইহা উল্টাইয়া রাখা হইত এবং জল পানের সময় নিম্নদেশে ধরিয়া পান করা হইত। মৃৎপাত্র এইরূপ উল্টাইয়া রাখার নিয়ম কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

আর এক প্রকার পান-পাত্র এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলিকে "চষক" বলা যাইতে পারে। এইরূপ দ্রব্যকে ইংরেজীতে 'বীকার' (beaker) বলা হয়। এইগুলি দেখিতে খুব সুন্দর ও মসৃণ। তলা চেপ্‌টা বলিয়া ইহাদিগকে গেলাসের মতও বসাইয়া রাখা যায়। ইহাদের সংখ্যাও খুব বেশী। অভিজাত সম্প্রদায়ের পানীয়ের জন্য ইহা ব্যবহৃত হইত বলিয়া মনে হয়।

খুরা-ওয়ালা পাত্রও (pedestal vases) এখানে অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। রন্ধন-ক্রিয়া কিংবা অন্য দ্রব্যাদি রাখার জন্য বোধ হয় এইগুলি ব্যবহৃত হইত।[১]

এখানকার কানাওয়ালা উদ্গত-গল কলস (ledge-necked jar) দেখিতে খুব সুন্দর। এই শ্রেণীর মৃৎপাত্র মোহেন্-জো-দড়োতে সংখ্যায় খুব কম। হরপ্পাতেও এই নমুনার দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ পাত্রের গলা এবং নিম্ন দেশ পৃথক্ পৃথক্ নির্ম্মাণ করিয়া পরে জোড়া দেওয়া হইত।[২]

শিরওয়ালা পাত্র (ribbed vases) এখানে বিরল, কিন্তু মাঝে মাঝে চমৎকার দুই চারিটী নমুনা পাওয়া যায়।[৩]

১ M. I. C. Vol. III. Pl. LXXX. 28-34.

২ Ibid Pl. LXXX, 35-37.

৩ Ibid, Pl. LXXX, 38-42.

ভাণ্ডাকৃতি পাত্র (vase-like jar) ছোট বড় নানা প্রকার আছে। এইগুলির তলা চেপ্‌টা এবং সময় সময় পেটে খাঁজ কাটা থাকে। এই নমুনার পাত্রের সংখ্যাও খুব প্রচুর।[১]

ছোট ঘট[২], লম্বা ভাঁড়[৩], সরু-মুখ[৪] ও সরু তলার[৫] পাত্রও অল্প-বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। আরও এক প্রকার পাত্র আছে; এগুলির স্কন্ধদেশ খুব প্রশস্ত।[৬] এমন কি এইসব পাত্রের স্কন্ধদেশ উচ্চতার চেয়েও অধিক প্রশস্ত হইত। সরু-তলার আর এক প্রকার মৃৎপাত্র এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি দেখিতে অনেকটা গামলার মত[৭] এবং সংখ্যায় খুব কম।

ছোটোখাটো সাদা এবং রঙ্গীন নানা রূপ পাত্র আছে। ঐগুলি দেখিতে খুব চমৎকার। এই সব কি উদ্দেশ্যে যে ব্যবহৃত হইত ঠিক বুঝা যায় না। গৃহসজ্জা কিংবা প্রসাধন-দ্রব্য রাখার জন্য হয়ত এই পাত্রের ব্যবহার হইত।[৮]

পুরুতলা-বিশিষ্ট পাত্র[৯] (heavy-based ware), ডাবর,[১০] পাউলি[১১] (কানাওয়ালা পান-পাত্র) ও চওড়া-মুখ-যুক্ত[১২] এবং আরও নানারূপ পাত্র এখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

১ Ibid, Pl. LXXX, 43-70.

২ Ibid, Pl. LXXXI, 1-10,

৩ Ibid, 11-12 ৪ Ibid, 13-17

৫ Ibid, 18-20 ৬ Ibid, 21-26

৭ Ibid, 27-31.

৮ Ibid, Pl. LXXXI, 32, Ibid, 33-40

৯ Ibid, 41-45.

১০ Ibid, 46-49.

১১ Ibid, 50-52.

১২ Ibid, 53-60.

রঙ্গীন পাত্র

সিন্ধু-উপত্যকায় নানাজাতীয় পুরাবস্তুর সঙ্গে অসংখ্য ভগ্ন রঙ্গীন পাত্রের খণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে। অক্ষত অবস্থায় কোন রঙ্গীন পাত্র কদাচিৎ পাওয়া যায়। নগরের বিভিন্ন স্তর হইতে এইগুলি উদ্ধার করা হইলেও মূলতঃ রং কিংবা চিত্রে বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয় না। ইহাতে স্বভাবতঃই মনে হয় মোহেন্-জো-দড়ো-সভ্যতার আবির্ভাব, স্থিতি, পরিণতি ও পতনের মধ্যে ব্যবধান অতি দীর্ঘকালের নয়।

রঞ্জন-শিল্পে মোহেন্-জো-দড়োর শিল্পীরা নিপুণ ও সিদ্ধহস্ত ছিল। পরস্পরচ্ছেদক বৃত্ত ও অন্যান্য জ্যামিতিক চিত্র দেখিলেই তাহাদের পরিপক্ক হস্তের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে শিল্পীর তুলির স্থূল ও অযত্নসাধিত রেখা দেখিয়া মনে হয় অতি দীর্ঘকাল পূর্ব্বে এই শিল্প মোহেন্-জো-দড়ো কিংবা অন্যত্র লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া, ক্রমে অধোগতির দিকে যাইয়া নির্জীব অনুকরণের বাঁধাবাঁধি সীমার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। মোহেন্-জো-দড়োর, ও সমসাময়িক আন্তর্জ্জাতিক রঞ্জন-শিল্পের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে মোহেন্-জো-দড়োর শতকরা আশীটি চিত্রই পুরু পাত্রের উপর এবং অবশিষ্টগুলি পাতলা ভাণ্ডের উপর অঙ্কিত। কিন্তু সুসা (Susa), নাল (Nal) ও সিস্তান (Sistan) প্রভৃতি স্থানে ঠিক ইহার বিপরীত; সেখানে শতকরা আশীটি চিত্রই পাতলা পাত্রের উপর অঙ্কিত।

সিন্ধু-উপত্যকার রঙ্গীন পাত্রের মৃত্তিকায় অভ্র, বালি, চূণ ও নানারূপ ময়লা দেখিতে পাওয়া যায়। জামদেত্ নসৃর (Jamdet Nasr)-এর রঙ্গীন পাত্রের মৃত্তিকায় সাধারণতঃ বালি ও চূণ এবং সুসার দ্বিতীয় যুগে চূণ থাকিত। মোহেন্-জো-দড়োতে অধিকাংশ স্থলে শুধু এক প্রকার রং অর্থাৎ লালের উপর কাল ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বেলুচিস্তানে যদিও চিত্রের নমুনা মোটামুটি একই প্রকার তথাপি সেখানে

এক জাতীয় রংয়ের পরিবর্ত্তে নানাবিধ রং ব্যবহৃত হইত। হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়োতে বহু রংয়ের ব্যবহার অল্পসংখ্যক পাত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। রং প্রয়োগ সম্বন্ধে দেখা যায়, লাল রংয়ের শক্ত পোড়া পাত্রের উপর কাল, পোড়া লাল, কটা লাল এবং সিঁদুর-রং প্রভৃতির একটি বা দুইটি একসঙ্গে ব্যবহৃত হইত। পাত্রের গায়ে পাতলা লাল (light red), পোড়া লাল (dark red), পাটল রং (pink), ঈষৎ পীত (cream) এবং পীতাভ ধূসর প্রভৃতির আস্তরণ (slip) লাগাইয়া পূর্ব্বোল্লিখিত রং প্রয়োগ করা হইত। পারস্য (সুসা) ও মেসোপটেমিয়ায় ঐ সময়ে পাণ্ডু (pale) রংয়ের এবং বেলুচিস্তানের দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে এই সব দেশের প্রভাবে পীতাভ ধূসর রং এবং পূর্ব্ব ও উত্তর-পূর্ব্ব বেলুচিস্তানে মোহেন্-জো-দড়োর প্রভাবে লাল রংয়ের প্রলেপ ব্যবহৃত হইত। বেলুচিস্তানের দিকে বিশেষভাবে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ এই দেশ, ভারতীয় এবং মেসোপটেমিয়া-পারসীক সভ্যতার সংযোগবাহক। এখনও উভয় সভ্যতার প্রাচীন স্মৃতি-চিহ্ন বহুল পরিমাণে এখানে আবিষ্কৃত হইতেছে। মোহেন-জো-দড়োর রঙ্গীন পাত্রে মোটামুটি দুই প্রকার চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—(১। জ্যামিতিক ও (২) প্রাকৃতিক। জ্যামিতিকের মধ্যে সরলরেখা, বক্ররেখা, ত্রিভুজ, বর্গক্ষেত্র, বৃত্ত প্রভৃতি দেখা যায়। প্রাকৃতিকের মধ্যে সাধারণতঃ ফল, ফুল, বৃক্ষ, লতা, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, মৎস্য শল্ক ও বন্যছাগ প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত হইত।

জ্যামিতিক সরল ও বক্ররেখাদ্বারা নানারূপ নূতন নূতন চিত্র সৃষ্টি হইত। আঁকাবাঁকা রেখা সাধারণতঃ পাত্রের কিনারা (broder) অঙ্কনের জন্য ব্যবহৃত হইত। মিসরেও খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ সহস্রক হইতে কিনারায় এইরূপ আঁকাবাঁকা রেখা-অঙ্কনের প্রথা চলিয়া আসিয়াছে। গোলার্দ্ধ (hemispherical), যব বা মালা, ত্রিভুজ, বৃত্ত, বলয় ও শতরঞ্চ খেলার ছক প্রভৃতির চিত্রও এখানে অঙ্কিত হইত। শরার (saucer) ভিতর দিকে বৃত্তাদির চিত্র দেখা যায়। পাত্রের গায়ে

পরস্পরচ্ছেদকবৃত্ত (intersecting circles), তরঙ্গাকার রেখা, সূর্য্য, তারকা, বন্যছাগ, মেরু, বৃষ, শতরঞ্জের ছক, পশুচর্ম্ম, শঙ্খ, বৃক্ষ, পাত্র (vase), অশ্বত্থ বৃক্ষ ও পত্র, চিরুনি, পাখী, চক্র, স্ক্রু (screw), দ্বিমুখ কুঠার (double axe), জাল, মুকুল, ময়ূর, পদ্ম, সর্প, বৃষ ও হরিণ প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত আছে। রেখা, বৃত্ত, শঙ্খ, বৃক্ষ লতা গুল্ম প্রভৃতি চিত্রে কতকাংশে মিসরের সঙ্গে এবং এই সমস্ত ও অন্যান্য চিত্র-বিষয়ে বেলুচিস্তান, পারস্য ও মেসোপটেমিয়া প্রভৃতির সঙ্গে বহুল পরিমাণে তাম্র-প্রস্তর যুগের সিন্ধু-উপত্যকার সাদৃশ্য ছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

শীলমোহর

মোহেন্‌-জো-দড়োর স্তূপসমূহ খননের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য শীলমোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শীলমোহরের অক্ষর এবং ভাষা আজও পর্য্যন্ত জগতের পণ্ডিত-সমাজে দুর্ব্বোধ্য থাকিয়া সকলের বিস্ময় এবং কৌতূহল উৎপাদন করিতেছে। অধিকাংশ শীলমোহরই নরম পাথরের তৈরী। ইহা ছাড়া পোড়ামাটী, মণ্ড (paste), তামা, ব্রোঞ্জ্‌ ও কাল মর্ম্মর প্রভৃতির শীলমোহর ও তাহার ছাপ (sealing) দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলিতে অক্ষর ছাড়া একশৃঙ্গযুক্ত পশু (unicorn), হাতী, গণ্ডার, বৃষ, মহিষ, হরিণ, ছাগল, ঘড়িয়াল কুমীর, ব্যাঘ্র, বৃশ্চিক, সর্প ও কিম্ভূতকিমাকার জীব প্রভৃতির নানাবিধ ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে। কোন কোন শীলমোহরে দেবদেবী ও মানুষের মূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কোন কোন মূর্ত্তি শৃঙ্গযুক্ত। একটী শীলমোহরে ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, মহিষ ও হরিণ পরিবেষ্টিত যোগাসনে[১] উপবিষ্ট একটী মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে কেহ কেহ মহাযোগী পশুপতি শিবের আদি অবস্থা দেখিতে পান। অধিকাংশ শীলমোহরে একশৃঙ্গযুক্ত পশুর (unicorn) ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে। এই অদ্ভুত

১ M I. C., Vol. I. Pl. XII. Fig 17

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে এই আসন পরবর্ত্তী যুগের কূর্ম্মাসনের অনুরূপ। পরবর্ত্তীকালে খননের ফলে আরও দুইটি শীলমোহরে এইরূপ যোগাসনে উপবিষ্ট শৃঙ্গযুক্ত একটি করিয়া নরমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ ভাবে যোগাভ্যাস সিন্ধু সভ্যতার একটি বিশেষত্ব ছিল বলিয়া মনে হয়। Cf. Mackay—Vol. I, Pl, LXXXVII. 222, 235.

জীবের কোনও সময়ে যে কোথাও অস্তিত্ব ছিল তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কেহ কেহ বলেন প্রকৃতপক্ষে শীলমোহরে অঙ্কিত এই গবাকার পশুটির একটি মাত্র শৃঙ্গ নয়। ছবিতে ইহার পার্শ্ব (profile) দেখান হইয়াছে বলিয়া একটি শৃঙ্গ দেখা যায়, পিছনের শৃঙ্গটি সামনেকার শৃঙ্গের দ্বারা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে।

অন্যান্য জীবজন্তুর যে সব চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে, সমস্তই যেন জীবন্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। শীলমোহরে জীবজন্তুর চিত্র-অঙ্কন-কার্য্যে মোহেন্-জো-দড়োর শিল্পীরা যে সিদ্ধহস্ত ছিল সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তামা ও ব্রোঞ্জের পাতে অঙ্কিত প্রাণীদের চিত্রগুলির মধ্যে সময় সময় শিল্পী বিশেষ পরিপক্ক হস্তের পরিচয় দিতে পারে নাই; এবং ইহাদের ছবিতে বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা পাইলেও, পাথরের শীলমোহরে অঙ্কিত ছবির মত উচ্চাঙ্গের হয় নাই।/ শীলমোহরগুলিকে আমরা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারি—

(১) লেখময়,

(২) রূপ বা চিত্রময়

(৩) রূপ ও লেখ উভয় যুক্ত

প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ চিহ্ন কিংবা চিত্র-বর্জ্জিত শুধু লেখযুক্ত বহু শীলমোহর সিন্ধু-উপত্যকায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে শীলমোহরের মালিকের নাম কিংবা অন্য কোন জ্ঞাতব্য বিষয়ও হয়ত থাকিতে পারে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শীলমোহরে শুধু গরু, মহিষ, ছাগল, হরিণ, গণ্ডার, দেবতা, দানব ও মানব প্রভৃতির চিত্র নানা ভাবে ক্ষোদিত রহিয়াছে। কোন কোন শীলমোহরে গরুর সম্মুখে একটা গামলার মত কিছু রহিয়াছে। ইহা তাহার খাদ্য ও পানীয়ের পাত্র বলিয়া মনে হয়। শীলমোহরে ক্ষোদিত পশু-মূর্ত্তির মধ্যে এক-শৃঙ্গ-যুক্ত পশু-মূর্ত্তিই (unicorn) অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। গণ্ডার ও

খর্ব্বশৃঙ্গযুক্ত গরুর সম্মুখ ভাগেই সাধারণতঃ খাদ্য ও পানীয়ের পাত্র দেখা যায়। কোন কোন শীলমোহরে লাঙ্গুল-যুক্ত এক নরাকৃতি শৃঙ্গীকে[১] ব্যাঘ্রের সঙ্গে সংগ্রামে ব্যাপৃত অবস্থায় অঙ্কিত করা হইয়াছে; এইরূপ শৃঙ্গ ও লাঙ্গুলবিশিষ্ট নর-মূর্ত্তিকে মেসোপটেমিয়ার বীর গিল্‌গামেশের (Gilgamesh) সহচর এন্‌কিডু (Enkidu)-এর সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। এন্‌কিডু-এর মুখ, স্কন্ধ ও বাহু মানুষেরই মত, কিন্তু মাথার শৃঙ্গ দুইটী গরুর মত। শীলমোহরের হাতী এবং ককুদ্বান্ বৃষ বিশেষ ভাবে শিল্পীর মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছিল। ইহাদের চিত্র নিখুঁত। কল্পিত চিত্র-অঙ্কনেও মোহেন্-জো-দড়োর শিল্পীরা পশ্চাৎপদ ছিল না। শীলমোহরের কোন কোন চিত্রে মেষের দেহে মানুষের মুখ, গরুর শিং ও হাতীর শুঁড় এবং দাঁত যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সব চিত্রেই আবার পশ্চাদ্ভাগ ও পিছনের পদদ্বয় ব্যাঘ্রের মত দেখা যায়।[২]

একটী চিত্রে শিল্পী একশৃঙ্গীর (unicorn) দেহে হরিণের তিনটী মস্তক ও শৃঙ্গ যোগ করিয়া দিয়া এক অদ্ভুত প্রাণীর সৃষ্টি করিয়াছে।[৩] আর একটী ছবিতে দেখিতে পাওয়া যায়, এক অঙ্গুরীয় চিহ্ন হইতে ছয়টী প্রাণীর মস্তক বাহির হইয়াছে। ইহাতে একশৃঙ্গ পশু (unicorn), খর্ব্বশৃঙ্গ বৃষ, হরিণ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি নানারূপ জন্তুর সৃষ্টি হইয়াছে।[৪] জীবজগতের অনেক প্রাণীই মোহেন্-জো-দড়োর শিল্পীর দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে কোন শীলমোহরে কিংবা খেলনায় সিংহমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে সমসাময়িক এলাম, সুমের ও কিশ্ প্রভৃতি স্থানে সিংহ-মূর্ত্তি-

১ M. I. C., Vol. III. Pl. CXI, Nos. 356 58.

২ Ibid, Pl. CXII, Nos. 376 81

৩ M. I. C., Pl. CXII. No 382

৪ Ibid, Pl. CXII No 383.

যুক্ত প্রাচীন শীলমোহর বহুল পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়। মোহেন্-জো-দড়োতে ব্যাঘ্রই অন্যান্য দেশের সিংহ-মূর্ত্তির স্থান অধিকার করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

বৃক্ষাদির চিত্রও শীলমোহরে স্থান পাইয়াছে। একটী চিত্রে কল্পিত অশ্বত্থ বৃক্ষের মধ্যভাগ হইতে একশৃঙ্গীর (unicorn) দুইটী মাথা দুই দিকে বাহির হইয়াছে, এইরূপ অঙ্কিত হইয়াছে।[১] কোন কোন চিত্রে বাবুল বা ঝাণ্ডি বৃক্ষও অঙ্কিত রহিয়াছে।[২]

তামার বা ব্রোঞ্জের পাতে অঙ্কিত ছবির মধ্যে পূর্ব্ব-লিখিত বহু ছবিই দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকন্তু খরগোস[৩] ও বানর (?) প্রভৃতি জন্তুর আকৃতিও কোন কোন ফলকে অঙ্কিত রহিয়াছে।[৪]

এই সব ছাড়া আর একটী তাম্রফলকে মানুষের একটী আশ্চর্য্য ছবি অঙ্কিত আছে।[৫] দেখিলে ইহাকে ব্যাধ বলিয়া মনে হয়। হাতে তীর-ধনুক রহিয়াছে, মস্তকে শৃঙ্গ, আর পরিধানে পত্র-নির্ম্মিত পরিচ্ছদ। সহজে অপরিজ্ঞাত অবস্থায় জীবজন্তুর কাছে গিয়া শিকার লাভ করাই বোধ হয় এই পরিচ্ছদ পরিধানের উদ্দেশ্য ছিল। মস্তকে শৃঙ্গ থাকায় ইহাকে ব্যাধরূপী দেবতা বলিয়া মনে হয়। কারণ, মস্তকের শৃঙ্গ ঐ যুগে দেবত্বের পরিচায়ক ছিল।

পাথর, তামা ও ব্রোঞ্জেই বহুল-পরিমাণে সিন্ধু-উপত্যকার লেখা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত মৃৎপাত্রের গায়েও শীলমোহরের ছাপ রহিয়াছে।

১ Ibid, Pl· CXII No. 387·

২ Ibid, Nos. 352, 353 355, 357.

৩ Ibid, Pl CXVII Nos 5, 6

৪ ডাঃ ম্যাকে বলেন যে একটা অস্পষ্ট তাম্রফলকে বানরের আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। ফায়েন্স, পোড়ামাটী ও মণ্ডনির্ম্মিত এইরূপ বানর-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

৫ M. I. C., Vol. III. Pl. CXII. No. 16.

ফায়েন্স্ এবং পোড়া মাটী-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিরামিডের অনুকারী দ্রব্য, চতুষ্কোণ ফলক ও চক্রাকার তলসমূহেও শীলমোহরের ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়।

সিন্ধু-উপত্যকার শীলমোহরের উদ্দেশ্য এ যাবৎ নিরূপিত হয় নাই। ইহাদের পাঠোদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত এই বিষয় জগতের একটা জটিল সমস্যা হইয়া থাকিবে। অন্যান্য প্রাচীন দেশে যে সব শীলমোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের সঙ্গে তাহাদের ছাপও (sealing) পাওয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ মাটীর ছোট ফলকে এই ছাপ দিয়া উক্ত ফলক মৃৎপাত্রের গায়ে কিংবা অন্য পণ্য-দ্রব্যের মধ্যে সূতা দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইত। যে দ্রব্যে বন্ধন করা হইত সেই দ্রব্যের চিহ্ন এখনও কোন কোন ফলকে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

মোহেন্-জো-দড়োতে যে সব শীলমোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে ইহাদের অবিকল ছাপ এখনও পাওয়া যায় নাই। পোড়ামাটী ও ফায়েন্সের মাত্র কয়েকটী ছাপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলি সংখ্যায় এত অল্প যে ইহাদের দ্বারা কোন নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। যদি ব্যবসায়-বাণিজ্যের সৌকর্য্যার্থ পণ্যদ্রব্যের উপর ছাপ দিবার উদ্দেশ্যেই এই হাজার হাজার ছোট-বড় শীলমোহর ক্ষোদিত করার ব্যবস্থা হইয়াছিল তবে এইগুলির প্রতিচ্ছবি এখন কোথায়? এই প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর এখনও কেহ দিতে পারেন নাই। ডাঃ ম্যাকে বলেন এ দেশের আবহাওয়া আর্দ্র বলিয়া শীলমোহরের ছাপ-বিশিষ্ট মৃৎ-ফলক-সমূহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই ভারতবর্ষেই মোহেন্-জো-দড়োর চেয়ে অধিক আর্দ্র মজঃফরপুর জেলার বসাঢ় ও গোরখপুর জেলার কাসিয়া এবং পাটনা জেলার নালন্দা প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত পরবর্ত্তী কালের শীলমোহরের মাটীর ছাপ বেশ অক্ষত অবস্থায় আছে। সুতরাং মোহেন্-জো-দড়ো-বাসীদের মধ্যে মাটীর উপর ছাপ দেওয়ার প্রথা বহুল ভাবে প্রচলিত ছিল এবং আর্দ্র আবহাওয়ার জন্য উহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে এইরূপ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত

হওয়া যায় না। মাটী ছাড়া শিলাজতু (bitumen) এবং রজনের (resin) উপর ছাপ দেওয়ার প্রচলন হয়ত ছিল এবং দীর্ঘ কালের আবর্ত্তনে এই সব জিনিষ বিকৃত হইয়া গিয়াছে বলিয়া ডাঃ ম্যাকে অনুমান করেন। এই অনুমানের মধ্যে হয়ত সত্য থাকিতে পারে। কারণ বর্ত্তমান যুগের গালার মত প্রাগৈতিহাসিক যুগেও অগ্নির উত্তাপে নরম করিয়া ছাপ দেওয়ার উপযুক্ত দ্রব্যের আবিষ্কার ও ব্যবহার মোহেন্-জো-দড়োর উন্নত সভ্য নাগরিকদের পক্ষে কল্পনার অতীত জিনিষ নয়। তবে উক্ত বিষয়ে এই বলা যাইতে পারে যে শিলাজতুর ব্যবহারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা এই স্থানেই এক জলাশয়ের দেয়ালের গায়ে পাইয়াছি, কিন্তু রজনের কোন চিহ্ন কোথাও পাওয়া যায় নাই ; এবং এইগুলি ছাপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত বলিয়া এখনও কোন নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

মাটী যে শীলমোহরের ছাপের জন্য ব্যবহৃত হইত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পাতে শীলমোহরের ছাপ-যুক্ত ছোট কয়েকটি মৃৎ-ফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। অধিকন্তু ডাঃ শাইল্-ও (Dr. Scheil) বাবিলোনিয়ার য়োখ্ (Yokh) নামক স্থানে প্রাপ্ত মোহেন্-জো-দড়োর বৃষের ছবি ও চিত্রাক্ষর-যুক্ত একটি পোড়া মাটীর শীলমোহরের ছাপের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।[১] ইহা ভারতবর্ষ হইতে প্রেরিত কোন বস্তা-বিশেষের গায়ে আবদ্ধ ছিল বলিয়া চিহ্নও নাকি পাওয়া যায়। বিদেশে রপ্তানীর পণ্যদ্রব্যে ছাপ দেওয়ার জন্য যে কোন কোন শীলমোহর কাটা হইয়াছিল, সে অনুমান হয়ত অমূলক হইবে না।

প্রাগৈতিহাসিক ভারতবাসী বেলুচিস্তান, পারস্য ও মেসোপটেমিয়ার অতি প্রাচীন সুসভ্য জাতিদের সঙ্গে যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সূত্রে আবদ্ধ ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ শ্রীযুক্ত ননীগোপাল

১ Revue d' Assyriologie, XXII, 2 (1925).

মজুমদার মহাশয় মোহেন্-জো-দড়ো হইতে সিন্ধুপ্রদেশ ও বেলুচিস্তানের সীমা পর্য্যন্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু স্তূপ ও সার্থবাহ পথ (caravan route) আবিষ্কার করিয়াছিলেন। স্যর্ অরেল্ ষ্টাইন্-ও (Sir Aurel Stein) বেলুচিস্তানের মধ্যে এরূপ বহু প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। কাজেই সমসাময়িক সভ্য জাতিদের সঙ্গে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে মোহেন্-জো-দড়ো-বাসীরা যে ব্যক্তিগত কিংবা সংঘগত শীলমোহরের ছাপ পণ্য-দ্রব্যের উপর ব্যবহার করিত সে বিষয়ে অনুমান করা খুবই স্বাভাবিক।

কেহ কেহ আবার এরূপ অনুমানও করেন যে কোন কোন জিনিষে রংয়ের ছাপ দেওয়ার জন্য শালমোহর কাটা হইয়াছিল। এই অনুমানের মূলে সন্তোষজনক যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ রংয়ের ছাপের জন্য এইগুলির ব্যবহার অভিপ্রেত হইলে, প্রাণীর ছবিগুলি এত গভীর ও সূক্ষ্মভাবে ক্ষোদিত হইত না। যেহেতু সমান জিনিষের উপর নীচের সূক্ষ্ম অবয়বের ছাপ বসিবে না। সুতরাং ইহারা রংয়ের ছাপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত বলিয়া অনুমান করা যুক্তিযুক্ত নয়।

কাহারও কাহারও মতে শালমোহরগুলি হয়ত মাদুলি কিংবা রক্ষা-কবচের ন্যায় গলায় বা বাহুতে ধারণ করা হইত। কিন্তু ইহাদের কোন কোনটি এত বড় ও ভারী যে গলায় বা বাহুতে ধারণ করা অসম্ভব। অধিকন্তু ঐ শালমোহরগুলির পাশ্চাৎ-দিকে আঙ্গুল দিয়া ধরার জন্য হাতল বা আংটীর মত উচ্চ অবয়ব থাকায় গলায় অথবা বাহুতে ধারণ করা খুব অসুবিধাজনক মনে হয়। কেহ কেহ মনে করেন, ক্ষুদ্র তাম্র-ফলকগুলি সম্ভবতঃ পবিত্র দ্রব্য কিংবা রক্ষাকবচরূপে অঙ্গে ধারণ করা হইত। ঐগুলিতে কোন ছিদ্র কিংবা কড়া দেখিতে পাওয়া যায় না। কাপড় কিংবা অন্য কোন দ্রব্যের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া ঐগুলিকে ধারণ করা হইত বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস।

। শীলমোহরের দুই প্রকার ব্যবহার সম্ভব হইতে পারে। প্রথমতঃ আধুনিক যুগের অর্থনীতির দৃষ্টিতে মনে হয় ইহা ব্যবসায়-বাণিজ্যের

দ্রব্যের উপর ছাপ দেওয়ার নিমিত্ত প্রচলিত ছিল, কিংবা ধর্ম্ম-কর্ম্ম এবং আধিদৈবিক কার্য্যাদির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমান যুগেও আমরা ধর্ম্ম-কর্ম্ম, স্বাস্থ্যরক্ষা ও উদ্দেশ্যসিদ্ধি প্রভৃতির জন্য শীলমোহর-জাতীয় জিনিসের ব্যবহার দেখিতে পাই। ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য কোন কোন সম্প্রদায় এইরূপ দ্রব্য ধারণ ও পূজা করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায় এখনও পিতলের ছাপে রাধা, কৃষ্ণ অথবা যুগলমূর্ত্তি অঙ্কিত করাইয়া ঐ মূর্ত্তির পাদদেশে অথবা পার্শ্বে কিংবা মূর্ত্তি ব্যতীতই "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ" প্রভৃতি লেখাইয়া ইহা দ্বারা পবিত্র মৃত্তিকার ছাপ বক্ষ, বাহু ও কপাল প্রভৃতি স্থানে ধারণ করিয়া থাকেন। হিন্দুদের ছাপ দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত এইসব পিতলের দ্রব্যকে 'ছাপ' বলা হইয়া থাকে।

অনেকে এই ছাপকে বিগ্রহের সমান স্থান দিয়া পূজা করেন। আবার ধাতুদ্রব্যে রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি অঙ্কিত করাইয়া কেহ কেহ গলায় কিংবা বাহুতে ধারণ করিয়া থাকেন। এই সব দ্রব্য মোহেন্-জো-দড়োর শীলমোহর-ব্যবহার-প্রণালীর কোন স্মৃতি বহন করিয়া আনিয়াছে কিনা ঠিক বলিতে পারা যায় না; কারণ অঙ্গে ছাপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইলে অবতল (concave) শীলমোহরের ভিতরের সূক্ষ্ম রেখাগুলির চিহ্ন ছাপে মোটেই দেখা যাইবে না। কাজেই এই কার্য্যের জন্য ঐগুলির ব্যবহার যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তবে তাম্র-প্রস্তর যুগের সিন্ধু-উপত্যকার শীলমোহর এবং তাম্র ও ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত অক্ষরযুক্ত ফলকগুলির অন্য কারণে ধর্ম্মের দিক্ দিয়া সার্থকতা থাকিতে পারে। ঐগুলি হয়ত গৃহের সম্পদ্ বলিয়া গণ্য হইত এবং পূজার আসনেও স্থান পাইত।

শীলমোহরে অঙ্কিত জীবজন্তুগুলি বিশেষ বিশেষ দেবতার বাহন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। হিন্দুরা সময় সময় স্বীয় অভীষ্ট দেবতার বাহনের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তক্ষশিলাবাসী গ্রীক্দূত দিও-পুত্র হেলিওদোরোস্ (Heliodoros, 2nd. Cen.

B. C.) প্রতিষ্ঠিত বিদিশার গরুড়ধ্বজ এবং কাশার অপেক্ষাকৃত আধুনিক বিশ্বনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণের নন্দী, এই উক্তির সার্থকতা প্রমাণ করে।

ভারতের আধুনিক হিন্দুসমাজে মোহেন্-জো-দড়োর শালমোহরে অঙ্কিত জীবজন্তু-সমূহের কোন কোনটির বাহনত্বের প্রমাণ সাহিত্য কিংবা জনশ্রুতিতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু পাঁচ হাজার বৎসর পুর্ব্বে ইহারা যে এই কার্য্যের জন্য কল্পিত হইত না তাহা কে বলিতে পারে? যদি এই অনুমান সত্য হয় তবে দেখা যাইবে পৃথক্ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক্ পৃথক্ দেবতা ও বাহন ছিল। এই ভাবে মোহেন্-জো-দড়োর ধর্ম্ম-সম্প্রদায়েরও একটা সংখ্যা পাওয়া যাইতে পারে।

শীলমোহরে অঙ্কিত জীবজন্তু জাতি বা সম্প্রদায়-বিশেষের টোটেম্ (totem) ছিল বলিয়া কল্পনা করা কি অসম্ভব হইবে? ভারতের দ্রাবিড়ীয় কিংবা অন্য কোন কোন অনার্য্য জাতির মধ্যে এখনও টোটেমের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে সিন্ধু উপত্যকাবাসীদের মত একটি বিশিষ্ট সভ্য জাতির অর্থ-সমস্যার জটিলতা দূর করিবার জন্য কি কোন মুদ্রার প্রচলন ছিল না? এই প্রশ্নের এখনও কোন সন্তোষজনক সমাধান হয় নাই। তবে ঐ যুগে হয়ত বিনিময়-প্রথা ছিল। হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য চতুষ্কোণ পাতলা তাম্র ও ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত ফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের একদিকে পশুচিহ্ন এবং অন্যদিকে চিত্রাক্ষর অঙ্কিত আছে। কেহ কেহ এই ফলকগুলিকেই সিন্ধু-উপত্যকাবাসীদের মুদ্রা বলিয়া মনে করেন।[১] আবার মোহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত চিত্রাক্ষর-যুক্ত তামার প্রায়-চক্রাকার একটি পুরাবস্তু

১ Hunter, "Scripts of Mohenjodaro and Harappa," p. 26.

ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়মের প্রদর্শনী-গৃহে রক্ষিত আছে। ইহা দেখিয়া মুদ্রা বলিয়াই ধারণা হয়।[১]

মোহেন্-জো-দড়ো সভ্যতার বহুকাল পরে প্রাচীন ভারতে যুগে যুগে চক্রাকার ও চতুষ্কোণ তাম্র কিংবা অন্য ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রার বহুল প্রচলন ছিল বলিয়া যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। মোহেন্-জো-দড়োর তাম্রফলক-সমূহ ও ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়মে রক্ষিত চক্রাকার দ্রব্যটি যদি সত্য সত্যই মুদ্রা বলিয়া প্রমাণিত হয় তবে ঐগুলিকে ভারতীয় মুদ্রার অগ্রদূত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। মোহেন্-জো-দড়োতে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের খননের ফলে অন্যান্য পুরাবস্তুর সঙ্গে চিত্রাক্ষরযুক্ত আয়তাকার তামার চারিটি পুরু মুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া ১৯২২-২৩ সালের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের রিপোর্টে উল্লেখ আছে।[২] উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বোধ হয় ক্ষুদ্র ফলকগুলিকে মুদ্রা বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। এখানে লব্ধ তাম্র বা ব্রোঞ্জ্ ফলকের মত দ্রব্য পৃথিবীর আর কোন প্রাচীন নগরীতে ঐ যুগে প্রচলিত ছিল বলিয়া এ যাবৎ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

শীলমোহর পাঠের উদ্যম

স্যর্ আলেক্জাণ্ডার কানিংহাম্

সিন্ধু-উপত্যকার শীলমোহরের লেখা পড়িবার চেষ্টা বহুদিন যাবৎ হইতেছে। খ্রীষ্টীয় ১৮৭১-৭৩ অব্দে স্যর্ আলেকজাণ্ডার্ কানিংহাম্

১ ইহা মুদ্রা হইলে এরূপ জিনিষ আরও পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না হওয়ায় ইহা সত্যই মুদ্রা কিনা সন্দেহ হয়। তবে প্রাচীন ভারতের অনেক ঐতিহাসিক রাজা ও রাজবংশের মুদ্রা মোটেই পাওয়া যায় নাই, কিংবা পাইলেও অল্প-সংখ্যক পাওয়া গিয়াছে; এজন্য তাহাদের মুদ্রা প্রচলিত ছিল না বলিয়া অনুমান করা যায় না।

২ "Four thick oblong Copper Coins inscribed with pictograms were discoverd at this level." Arch Sur Rep. 1922-23. p 103.

তদায় রিপোর্টে[১] উল্লেখ করিয়াছেন যে মেজর ক্লার্ক (Major Clark) নামক জনৈক ইউরোপীয় ব্যক্তি হরপ্পা নামক স্থানে ককুদ্-বিহীন (humpless) বৃষ ও ছয়টি অজ্ঞাত-অক্ষর-যুক্ত কাল পাথরের একটি আশ্চর্য্য শীলমোহর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কানিংহাম্ এই প্রসঙ্গে বলেন যে এই অক্ষর ভারতীয় নয় এবং যেহেতু ক্ষোদিত বৃষটি ককুদ্‌বান্ নয় সুতরাং শীলমোহরও বিদেশীয়ই হইবে।

তিনি আবার কিছুদিন পরে স্বপ্রণীত গ্রন্থান্তরে[২] বলিয়াছেন যে উল্লিখিত শীলমোহরটি খ্রীষ্টের জন্মের অন্ততঃ চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী কালের হইবে, অধিকন্তু পূর্ব্বের উক্তির সংশোধন করিয়া বলেন যে ইহার লেখা ভারতীয় আদি লিপির নমুনা এবং বুদ্ধদেবের প্রায় সমসাময়িক যুগের।

শীলমোহরের সময়-নির্ণয়-বিষয়ে তাঁহার উক্তি নির্ভুল না হইলেও তিনিই সর্ব্ব প্রথম ভারতীয় ব্রাহ্মীলিপির সঙ্গে ইহার কোন কোন অক্ষরের সাদৃশ্য প্রতিপন্ন করিয়া ঐ ছয়টি অক্ষরে "লছ্‌মিয়" শব্দটি লেখা আছে বলিয়া একটি পাঠ উপস্থাপিত করেন। যদিও ব্রাহ্মীর সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ-স্থাপনের স্বপক্ষে কিংবা বিপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না, তথাপি এই অনুমানের একটা মৌলিকত্ব আছে এবং একদিন এই অনুমান সত্য বলিয়া প্রমাণিত হওয়াও অসম্ভব নয়; কারণ প্রফেসর ল্যাঙ্গ্‌ডনের মত মনীষী ব্যক্তিও এখন মোহেন্-জো-দড়ো লিপিই ব্রাহ্মা লিপির আদি জননী বলিয়া অনুমান করেন।

ডাঃ ফ্লিট্

কানিংহামের বহু বৎসর পরে ডাঃ ফ্লিট্ (Dr. Fleet) কানিংহাম্ প্রকাশিত শীলমোহর ব্যতীত আরও দুইটির ছবি প্রকাশিত

১ Cunnigham Archaological Report Vol V, p. 108 (published in 1875 A D)

২ Corp Ins. Ind, Vol I pp 61-62 (published in 1877 A D

করেন।[১] এইগুলিও হরপ্পা নগর হইতেই প্রাপ্ত। ফ্লিট্-প্রকাশিত এখানকার 'B' চিহ্নিত শীলমোহর বহু বৎসর পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান আন্টিকুয়ারী পত্রিকায়[২] উল্টাভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'C' চিহ্নিত শীলমোহরখানা মিঃ ডেমস্ নামক জনৈক ভদ্রলোক তত্রত্য ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা সর্ব্বপ্রথম এখানেই প্রকাশিত হয়। কানিংহামের নির্দ্দেশ অনুসারে ফ্লিট্‌ও ইহা হইতে "ক-লো-মো-লো-গু-ত" (Ka-lo-mo-lo-gu-ta) এই পাঠ উপস্থাপিত করেন। এই পাঠের সত্যাসত্য নির্ণয় কেহই এ যাবৎ করিতে পারেন নাই। কবে হইবে তাহারও ঠিক নাই।

জয়স্‌বাল

অতঃপর, শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়স্‌বাল পূর্ব্বোক্ত 'B' চিহ্নিত শীলমোহরের পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেন।[৩] তিনিও স্যর্ আলেকজাণ্ডার কানিংহামের উক্তির সমর্থন করিয়া বলেন, এই লেখা পূর্ব্ববর্ত্তী চিত্রলিপি অপেক্ষা পুরাতন ব্রাহ্মী লিপিরই অধিকতর সমীপবর্ত্তী। তিনি এই শালমোহরের লিপি বাম দিক্ হইতে "লো-ব-ব্য-দী" (lo-ba-vya-di) পড়িলেন ; কিন্তু ইহার ছাপের স্বাভাবিক পাঠ (অর্থাৎ শালমোহরটির লিপির পাঠ ডান দিক্ হইতে পড়িলে) 'দীব্য-বলো' বলিয়া মনে করেন। 'C' চিহ্নিত শীলমোহরটি তিনি এরূপ ভাবে "ত-পূ-লো মো-গো" (= ত্রিপুরময়ূরক ?) বলিয়া পড়িতে চাহেন। কিন্তু তাঁহার পাঠের সঙ্গে আমরা একমত হইতে পারি না। কারণ, ইহা নিশ্চিতভাবে ঠিক হইয়া গিয়াছে যে মোহেন্-জো-দড়োর লেখার গতি দক্ষিণ হইতে বামে। শীলমোহরের লেখা উল্টা থাকে, কাজেই উহা বাঁ হইতে ডাইনে পড়া উচিত। শ্রীযুক্ত জয়স্‌বাল বাম হইতে পড়িয়া

১ J. R. A. S, 1912, pp 699ff.

২ Indian Antiquary, Vol. XV (1886), p. I.

৩ Ind. Ant , 1913, p. 203.

পুনরায় বিপরীত পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন এইজন্য পাঠভ্রম হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। জয়সৃবালের এই প্রচেষ্টার পর বহু বৎসর কাটিয়া গেল। ইহা লইয়া মনীষি-সমাজে আর কোন উচ্চবাচ্য শুনা যায় নাই। অতঃপর মোহেন্-জো-দড়োর আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এই অজ্ঞাত অক্ষরযুক্ত শত শত শীলমোহর প্রাপ্ত হওয়ায় পণ্ডিতসমাজের দৃষ্টি এ দিকে পুনরায় নূতনভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। মিসরীয় এবং সুমেরায় বিদ্যায় সুপণ্ডিত সেইস্ (Sayce), গ্যাড্ (C. F. Gadd) , সিড্‌নি স্মিথ্ (Sidney Smith), ল্যাঙ্গ্‌ডন্ (S. Langdon) ও স্যর্ ফ্লিণ্ডারস্ পেট্রি (Sir Flinders Petrie) প্রভৃতি মনীষীর দৃষ্টি প্রাগৈতিহাসিক ভারতের লিপিমালার দিকে আকৃষ্ট হয়।

গ্যাড্

গ্যাড্ বলেন, তিনি এই লিপিমালার একবর্ণও পড়িতে পারেন নাই। তবে নানা দেশের প্রাচীন ভাষায় অভিজ্ঞতার ফলে তিনি কতকগুলি অনুমানের অবতারণা করিয়াছেন, এবং ইহার পাঠোদ্ধারের জন্য মেসোপটেমিয়ার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে বলিয়াছেন। এই অক্ষরমালা চিত্রাত্মক, এবং ইহাতে নানা ভঙ্গীর মানুষ, বিভিন্ন চিহ্ন যুক্ত মৎস্য, পর্ব্বত, হস্ত, পদ, বর্শা, ছত্র, পথ ও বৃক্ষ প্রভৃতি চিহ্ন তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই লিপিমালার পঠন-প্রণালী ডান দিক্ হইতে বাম দিকে, এই অনুমানেরও তিনি অবতারণা করিয়াছেন।

সিন্ধু-উপত্যকার লিপি একস্বরসূচিত অক্ষর-মালার (syllable) সমষ্টি এবং স্বতন্ত্র ধ্বনিযুক্ত বর্ণমালার সৃষ্টি তখনও হয় নাই বলিয়া তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। লেখাগুলিতে ব্যক্তিবিশেষের নাম ও উপাধি উল্লিখিত আছে এবং ঐ নামগুলি ইন্দো-আর্য্য (Indo Aryan) ভাষার অন্তর্গত বলিয়া তিনি অনুমান করেন। একটি শীলমোহরে তিনি "পুত্র" ⇑||||U এই শব্দটির পাঠোদ্ধার করিতে প্রয়াস পাইয়া-

ছেন। তবে এই অনুমানের বিরুদ্ধে বহু কথাই বলিবার থাকিবে বলিয়া তিনি নিজেই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাক্-খ্রীষ্টীয় যুগে উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচলিত লাঞ্ছনময় (punch-marked) মুদ্রার কোন কোন চিহ্নের সঙ্গে সিন্ধু-উপত্যকার শীলমোহরের চিহ্নের আশ্চর্য্যরূপ সাদৃশ্য আছে বলিয়া তিনিই প্রথম স্থির করেন।[১]

সিড্‌নি স্মিথ্

সিড্‌নি স্মিথ্‌ও এই অপরিচিত বিষয়ে বিশেষ কোন আলোকপাত করিতে পারেন নাই। শীলমোহর-সমূহে বিভিন্ন শব্দ ও ব্যক্তিগত নাম থাকিতে পারে বলিয়া তিনি অনুমান করিয়াছেন। গ্যাডের অনুমানের বিরুদ্ধে ঊর্দ্ধগামী লম্বা রেখাগুলিকে (|||) সংখ্যার অক্ষর-দ্যোতক না বলিয়া সংখ্যাবোধক বলিয়া তিনি মনে করেন।[২] সুমেরীয় লেখার সঙ্গে সাদৃশ্য ব্যতীত তিনি আফ্রিকা ও আরব দেশের কোন কোন জাতির (tribe) অক্ষরের সঙ্গেও এই লিপির সাদৃশ্য দেখিতে পান। এইরূপ কোন কোন চিহ্ন লিবীয় মরুর (Libyan desert) সেলিমা (Selima) নামক স্থানেও দেখা যায়। কাহারো কাহারো মতে এইরূপ সাদৃশ্য আকস্মিক বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু কতকগুলি চিহ্ন ব্যবসায়-বাণিজ্যের পক্ষে সুবিধা-জনক বোধে নানা জাতির মধ্যেই লোকপরম্পরায় কিছুদিন পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল বলিয়া তিনি অনুমান করেন।

ল্যাঙ্গ্‌ডন্

ল্যাঙ্গ্‌ডন্ মোহেন্-জো-দড়োর চিত্রাক্ষর হইতে ব্রাহ্মী বর্ণমালার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করেন; এবং ব্রাহ্মী লিপির কতিপয়

১ M. I. C., Vol. II, p. 413.

২ Ibid, p. 418.

বর্ণের মূল সিন্ধুলিপিতেই দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া উভয় লিপির সমান আকৃতি-বিশিষ্ট চিহ্নের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি যদিও উভয়ের উচ্চারণ-সাম্যের বিষয়েরও অবতারণা করিয়াছেন, তথাপি এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন বলিয়া তিনি নিজেই মনে করেন না। ব্রাহ্মী লিপির অক্ষর সমান কিংবা প্রায় সমান আকৃতিবিশিষ্ট সিন্ধুলিপির অক্ষরের ধ্বনি সূচনা করে কিনা এই বিষয়ে তিনি নিজেই সন্দিহান। ব্রাহ্মী বর্ণমালার প্রত্যেক অক্ষরে (syllable) যেমন ব্যঞ্জনের পর স্বরবর্ণের ধ্বনি শ্রুত হয় (যথা, ক্ + অ = ক, খ্ + অ = খ ইত্যাদি) সিন্ধুলিপিতে সেরূপ বিধান ছিল কিনা সে বিষয়ে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই ; বরং এইরূপ পরিণতির বিষয়ে সন্দেহই প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, সুমেরীয় বা আদি-এলামীয় লিপির সঙ্গে সিন্ধুলিপির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কোন সম্পর্ক নাই। সুমেরীয় রেখাক্ষর (linear) কিংবা কীলকাক্ষর (Cuneiform) অপেক্ষা মিসরের চিত্রাক্ষরের (hieroglyphs) সঙ্গে সিন্ধুলিপির অনেক সাদৃশ্য আছে বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন।[১]

তিনি সিন্ধু-লেখে-র চিহ্নগুলি শব্দাংশ (syllable) জ্ঞাপক এবং সমস্ত লেখা ধ্বনি-দ্যোতক বলিয়া (phonetic) মনে করেন। কোন কোন চিহ্ন আবার শুধু জ্ঞাপক হিসাবেই শব্দের আদিতে বা অন্তে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু ইহারা সম্ভবতঃ উচ্চারিত হইত না। সিন্ধুলিপির বহু চিহ্নের তালিকা প্রস্তুত করিয়া তিনি ব্রাহ্মী বর্ণমালার সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন।[২]

তিনি সিন্ধুলিপির যে সব চিহ্নের আকৃতি ও ধ্বনি প্রভৃতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাদের সাহায্যে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের নিকট প্রস্তাব

১ M. I. C., Vol. II, pp. 423-24.

২ Ibid, p. 428.

করিয়াছেন যে তাঁহারা যদি প্রসিদ্ধ পৌরাণিক বীর এবং যোদ্ধাদের নাম বাহির করিয়া শীলমোহরের লেখার সঙ্গে মিলাইয়া দেখেন তবে এই লিপির পাঠোদ্ধার বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় কিনা দেখা যাইতে পারে।[৪]

ওয়াডেল্

শ্রীযুক্ত এল্. এ. ওয়াডেল (L. A. Wadell) তাঁহার পুস্তকে ("Indo-Sumerian Seals Deciphered") মোহেন্-জো-দড়োর অক্ষর পড়িবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন শীলমোহরের ভাষা সংস্কৃত এবং তাহাতে ভৃগু, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শব্দ তিনি পড়িয়াছেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন; কিন্তু এ যাবৎ তাঁহার মত পণ্ডিত-সমাজে গ্রাহ্য হয় নাই।

প্রাণনাথ

ডাঃ প্রাণনাথ প্রফেসার ল্যাঙ্গ্ডনের নির্দ্দেশ মত ব্রাহ্মী ও আদি এলামীয় (Proto-Elamite) বা আদি-ইরানীয় লেখার সাহায্যে সিন্ধু-সভ্যতার বহুসংখ্যক শীলমোহরের পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন। তিনি ঐ লেখায় শু-নিন্-সিন নাম পড়িয়া ইহাকে সুমেরীয় নিসিন্ন (Nisinna) এবং ভারতীয় নিচীন (Nicina) দেবের নামের সমান বলিতে চাহেন। এইরূপভাবে তিনি মোহেন্-জো-দড়োর শীলমোহরে সিনি-ইসর, ইসল্-নগেন প্রভৃতি পাঠোদ্ধার করিয়া উহাদিগকে সিনীবালী ও নগেশ শব্দের রূপান্তর হিসাবে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।[২] কিন্তু তাঁহার এইরূপ পরিশ্রমেও

১ Ibid, p. 431.

২ Indian Historical Quarterly, Vol. VII, No. 4, 1931, & Vol. VIII, No. 2, 1932.

পণ্ডিত-মণ্ডলী সন্তুষ্ট হন নাই এবং ইহার যে যথাযথ পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা হইয়াছে তাহা এখনও কেহই মনে করেন না।

মেরিজ্জি

ফন্ পি. মেরিজ্জি (Von P. Merriggi) কিছুকাল পূর্ব্বে সিন্ধু-উপত্যকার শীলমোহরের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও লিপিপাঠের সম্পর্কে কোন নূতন আলোকপাত করিতে পারেন নাই।[১]

ডাঃ জি. আর. হাণ্টার

ডাঃ জি. আর. হাণ্টারও বহুদিন যাবৎ এই লিপি লইয়া যথেষ্ট গবেষণা করিয়াছেন। তৎপ্রণীত গ্রন্থে ও প্রবন্ধে[২] তাঁহার অদম্য চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শৃঙ্খলাসহকারে নানাভাবে লিপিগুলির বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মিসর ও সুমের প্রভৃতি স্থানের অক্ষরের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকিলেও আদি এলামবাসীর (Proto-Elamite) লেখার সঙ্গেই মোহেন-জো-দড়োর অক্ষরের সাদৃশ্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দৃষ্ট হয় বলিয়া তিনি মনে করেন। তাঁহার মতে ঐ চিহ্নগুলি কোন বর্ণমালার (alphabet) অন্তর্ভুক্ত নয়, ইহারা সুমেরীয় লেখার মত ধ্বনি (phonetic) এবং চিত্রযুক্ত (pictographic) চিহ্নসমূহের সংমিশ্রণমাত্র। এ স্থানের ভাষা আর্য্য কিংবা শেমীয় জাতির ভাষার অন্তর্গত বলিয়া তিনি মনে করেন না। কারণ, তাঁহার ধারণা, এই সিন্ধুলিপির ভাষা একস্বরাত্মক শব্দ বিশিষ্ট (mono-syllabic)। আদি-এলাম-বাসীর (Proto-Elamite) ফলকলেখের ভাষার সঙ্গেও

১ Z. D. M. G., 1934 pp. 198 f.

২ G. R. Hunter, 'The Script of Harappa and Mohenjo-daro'; J. R. A. S., 1932.

ইহার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু উভয় স্থানের কতকগুলি চিহ্ন সমান এবং ঐগুলি ব্যক্তিবিশেষের নাম বলিয়া তিনি মনে করেন। এখানে আবিষ্কৃত এই অজ্ঞাত লিপি ও নানারূপ পশুর আকৃতি-যুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাম্র বা ব্রোঞ্জ-ফলকগুলিকে তিনি ঐ যুগে প্রচলিত মুদ্রা বলিয়া মনে করেন। ডাঃ হাণ্টার আরও বলেন যে তিনি সম্প্রদান ও অপাদান কারকের এবং সংখ্যার চিহ্ন ও ভৃত্য (servant), দাস (slave), ও পুত্র (son) বাচক শব্দ পড়িতে পারিয়াছেন। কিন্তু যত দিন না সিন্ধুতীর কিংবা মেসোপটেমিয়া অথবা অন্যত্র কোন দ্বিভাষিক (bilingual) শীলমোহর বা লেখ আবিষ্কৃত হইবে, তত দিন পর্য্যন্ত পণ্ডিতদের কল্পিত পাঠের মধ্যে প্রকৃত সত্য নিহিত থাকিলেও সেই পাঠ কেহ নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হইবে না।

ডাঃ সি. এল. ফাব্রি

ডাঃ সি. এল. ফাব্রিও মোহেন্-জো-দড়ো-শীলমোহর সম্বন্ধে কোন কোন পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।[১] কিন্তু তিনিও লিপি-সমস্যার উপর বিশেষ কোন নূতন আলোকপাত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার প্রবন্ধে অন্য কর্ত্তৃক পূর্ব্বে আলোচিত কথারই বিশদভাবে পুনরুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতীয় লাঞ্ছনময় (punch-marked) মুদ্রার চিত্রের সঙ্গে সিন্ধু-উপত্যকার শীল-মোহরের চিত্রের সাদৃশ্য আছে বলিয়া তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন[২] তাহা তাঁহার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত গ্যাড্-এর লেখায়ও পাওয়া যায়[৩]। তাঁহার অন্যান্য প্রবন্ধেও বিশেষ কোন নূতন কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেই শুনা

১ Indian Culture, Vol. I, 1934-35, pp. 51.56

২ J. R. A. S., 1935, pp. 307-18.

৩ M. I. C., Vol. II., p. 413.

গিয়াছিল যে তিনি নাকি সৈন্ধবলিপি পাঠোদ্ধারের প্রায় সমীপবর্ত্তী। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তিনি সে বিষয়ে কোন নূতন তথ্য প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

স্যর্ ফ্লিণ্ডার্স্ পেট্রি

প্রাচীন মিসরীয় বিদ্যায় সুপণ্ডিত প্রবীণ মনীষী স্যর্ ফ্লিণ্ডার্স্ পেট্রি (Sir Flinders Petrie)[১] স্বীয় সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার বলে পুরাতন মিসরের লেখার সঙ্গে স্থানে স্থানে মোহেন্-জো-দড়োর লেখার সাদৃশ্য প্রতিপন্ন করিয়া বলেন যে এখানকার শীলমোহরের শতকরা প্রায় ৫০টিই রাজকীয় কর্ম্মচারীর জন্য ব্যবহৃত হইত। ইহাদের মধ্যে মিসরীয় শীলমোহরের ধরণে পথাধ্যক্ষ, পদাতি-পঞ্চাধিকরণ-শকটাধ্যক্ষ (Wakil of the Wagon of Official of the Court of Five for Infantry), রাজকীয় জালিকাধ্যক্ষ (Wakil of the Official Trapper), বৃহৎ চক্রযানাধ্যক্ষ, ধনুর্দ্ধরাধিকরণ (office of archers), খাত ও সেচ-বিভাগের কর্ত্তা (Official of Canal and Water-supply), ধনুর্দ্ধর, অরণ্যাধিপতি, রাজকীয ব্যাধাধ্যক্ষ (Wakil of official hunters) ইত্যাদি রাজকীয় কর্ম্মচারিসংক্রান্ত বিষয়ে শীলমোহরের উপযোগিতার প্রতি তিনি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। শীলমোহরগুলি উল্লিখিতভাবে ভাবব্যঞ্জক ধরিয়া লইয়া তিনি বলেন, মিসর, সুমের ও চীনের ভাবব্যঞ্জক চিত্রাক্ষরের মত মোহেন্-জো-দড়োর লেখাও ভাবব্যঞ্জক ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

তিনি মনে করেন, অরণ্য, খাত, সেচ, বাণিজ্য, চক্রযান এবং বাণিজ্যে ও রাজকীয় কর্ম্মব্যপদেশে ব্যবহৃত আবাস প্রভৃতি ভারতীয় উন্নত নাগরিক জীবনের আদর্শ আমাদের চক্ষুর সমীপে চিত্রপটের

১ Petrie—"Ancient Egypt and the East," 1932, pp. 33-40.

স্থায় ধরিয়া দেয়। উক্ত স্যর্ ফ্লিণ্ডার্স্ পেট্রি, স্যর্ জন্ মার্শাল্ সম্পাদিত মোহেন-জো-দড়ো ও সিন্ধুসভ্যতা (Mohen-jo-daro and the Indus Civilisation) নামক পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত প্রথম ১০০টি শীলমোহরের মধ্যে অন্যূন ৩৫টিতে রাজকীয় কর্ম্মচারীর উল্লেখ দেখিতে পান। কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম ইহাতে নাই বলিয়া তাঁহার মত। *প্রাচীন মিসরের লেখায়ও প্রথমাবস্থায় এইরূপ বিভাগীয় উপাধিই থাকিত, ব্যক্তিবিশেষের নাম থাকিত না। পঞ্চম বংশের* (5th Dynasty) পর মিসরে জনসাধারণের জন্য রাজার নামের শীলমোহর ব্যবহৃত হইত। তত্রত্য শীলমোহরে সেই সময় পর্য্যন্ত বয়ন ও গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি শিল্পের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ, এই সব তখনও রাজকীয় তত্ত্বাবধানে আসে নাই। মোহেন-জো-দড়োর শীল-মোহরে চক্র-চিহ্নের বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়; পণ্যদ্রব্য ও রসদাদি আদান-প্রদানের জন্য সম্ভবতঃ ঐ সব শীলমোহরের ব্যবহার হইত বলিয়া তিনি অনুমান করেন।

প্রথম শতসংখ্যক শীলমোহরের মধ্যে পদাতি সৈনিকের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর আবাস-ব্যবস্থাপক, বিভাগীয় চক্রযান পরিদর্শক, খাত-বিভাগীয় রাজদূত এবং তৃতীয় শ্রেণীর আবাসেরও জলবিভাগের অধ্যক্ষ রাজপুরুষ (Knight over Hostel of Third Grade and Water Works) প্রভৃতির শীলমোহর আছে বলিয়া স্যর্ ফ্লিণ্ডার্স্ মত প্রকাশ করেন। তাঁহার অনুমান সত্য হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তখনও আধুনিক যুগের মত নানা বিভাগ নানারূপ কর্ম্মচারীর দ্বারা শাসিত হইত। বিভিন্ন জাতীয় শীলমোহর দেখিলে মনে হয়, তখন শাসন-বিভাগ (Administration) ও কার্য্যকরী (Executive) বিভাগ উভয়ই বর্ত্তমান ছিল। বন-বিভাগ, সৈন্য-বিভাগ এবং জনহিতকর কার্য্যের পৃথক্ পৃথক বিভাগ বর্ত্তমান ছিল। সেচ-বিভাগ, বাণিজ্যের আমদানি-রপ্তানির বিভাগ ও ইহার পরিদর্শক, রাজকীয় মৃগয়া বিভাগ এবং সঙ্গীত-বিদ্যালয় প্রভৃতিও বিদ্যমান ছিল বলিয়া তিনি মনে করেন।

হেভেশি

শ্রীযুক্ত হেভেশি (M. G. de Hevesy) প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত পোলিনেশিয়ার অন্তর্গত ইষ্টার আয়ল্যাণ্ডের কাষ্ঠ-ক্ষোদিত অধুনা বিলুপ্ত লিপির সঙ্গে মোহেন্-জো-দড়োর শতাধিক লিপির সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। এই উভয় লিপির আকৃতির মধ্যে কতকগুলি অক্ষরের এত ঘনিষ্ঠ মিল দেখা যায় যে সেরূপ অন্য কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। হেভেশি ঐ লিপির পাঠোদ্ধার করিতে পারেন নাই।[১] হেভেশির এই মতের বিরুদ্ধে কেহ কেহ বলেন এইগুলি লিপি নয়। অন্য কোন উদ্দেশ্যে এই সকল চিহ্ন ব্যবহার করা হইয়াছিল।

বিক্রমখোল লেখ

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সম্বলপুর জেলার বিক্রমখোল নামক স্থানে পর্ব্বতগাত্রে এক শিলালেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়স্‌বালের মতে, এই অক্ষর সিন্ধুলিপি ও ব্রাহ্মী লিপির মধ্য অবস্থার পরিচায়ক। এই বিষয়ে তিনি পণ্ডিত-মণ্ডলীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান্ আন্টিকুয়ারী (Indian Antiquary) পত্রিকায়[২] তিনি যে ফটোগ্রাফ ও লিপি-বিশ্লেষণ দিয়াছেন, তাহাতে অতি সামান্য-সংখ্যক স্থানে সিন্ধুলিপির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ইহার ফলে যে সিন্ধুলিপির সমস্যার সমাধান হইবে সেরূপ আশা পোষণ করা যায় না।

এইরূপ দুই চারিটি চিহ্ন রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানের নিম্ন-শ্রেণীর অধিবাসীদের গায়ের উল্কির (tattoo) সঙ্গেও মিলিয়া যায়। এই উভয়ের মধ্যে অন্তর্নিহিত কোন সম্বন্ধ আছে কিনা ভাবিবার বিষয়। কিন্তু ইহা দ্বারা লিপি-সমস্যা-সমাধানের কোন সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব।

১ Bulletin de la Societe Prehistorique Francaise, 1933, Nos. 7-8, Sur une Ecriture Oceaenienue.

২ Indian Antiquary, Vol, LXII, 1933, pp. 58-63,

রেভারেণ্ড্ হেরাস্

রেভারেণ্ড্ হেরাস্ (Rev. Fr. H. Heras, S. J.) "শীল-মোহরের লেখা হইতে মোহেন্-জো-দড়ো-বাসীদের ধর্ম্ম"-সম্বন্ধে লিখিত এক প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে তিনি ঐ লেখা-সমূহ পাঠ করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে এখানে সকল দেবগণের উপরস্থ প্রধান উপাস্য দেবতাকে "আণ্" (An) বলা হইত। তিনি বলেন, লেখ-সমূহে "আণ্"কে জীবন (life), একত্ব (oneness), মহত্ত্ব (greatness, পালন (protection), সর্ব্বজ্ঞত্ব (omniscience), ঔদার্য্য (benevolence), সংহার (destruction) ও সৃষ্টির (generation) কর্ত্তা বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ দেবতাদের আট প্রকার বিভূতি ছিল। ইঁহাদের মধ্যে "আণ্"ই সর্ব্ব প্রধান। ইঁহাকে সূর্য্য বলিয়াও কল্পনা করা হইয়াছে। ঐ যুগে আটটি রাশি ছিল; এই কথা মোহেন্-জো-দড়ো-লেখে এবং প্রবাদ-বাক্যেও নাকি আছে। এক "আণ্"ই বৎসরের বিভিন্ন আটটি মাসে আট প্রকার রূপ পরিগ্রহ করিতেন। শালমোহরে মেষ (ram) ও মীন (fish) রাশির কথা নাকি বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে। মেষ ও মীন রাশির সম্মিলিত আকৃতি এক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহাকে নণ্ডূর (Nandur)-এর ঈশ্বর (God of Nandur) বলা হইয়াছে। নণ্ডূর অর্থে নাকি কর্কটের দেশ বুঝায়, এবং মোহেন্-জো-দড়োর নাম "নণ্ডূর" ছিল বলিয়া তিনি (হেরাস্) মনে করেন।

তিনি বলেন, এখানকার লেখায় ত্রিনেত্রযুক্ত দেবের পূজার উল্লেখ আছে। বর্ত্তমানে দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত এণ্মৈ (Enmai), বিডুকন্ (Bidukan), পেরাণ্ (Peran), তাণ্ডবন্ (Tandavan) প্রভৃতি শিবের নাম নাকি ঐ যুগে "আণ্"-এরই নাম ছিল।

তিনি আরও বলেন লিঙ্গপূজা এখানে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল না। মোহেন্-জো-দড়োর অধিকাংশ লোক "মে-ই-ন" (Meina) (সংস্কৃত সাহিত্যের মীন বা মৎস্য) সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তাহারা

লিঙ্গপূজায় অবহেলা প্রদর্শন করিত। বিল্লব (Billavas) ও কবল্ (Kavals) নামক জাতির নিকট হইতে মোহেন-জো-দড়োর চুন্নি মীন (Chunni Mina) নামক রাজা সেখানে লিঙ্গপূজা প্রচার করেন, কিন্তু এই প্রচার-কর্ম্মের জন্য তিনি লোকের নিকট অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়া উঠেন। ফলে তাহারা তাঁহাকে বন্দী করিয়া ছিল বলিয়া লেখায় নাকি প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে স্ত্রীদেবতার পূজাও প্রচলিত ছিল। এবং তিনটি প্রধান দেবতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া তিনি বলেন। ইঁহাদের মধ্যে অম্মা (Amma) বা মাতৃকা দেবীর স্থান-দ্বিতীয়।

বৃক্ষের পূজা প্রচলিত ছিল বলিয়াও নাকি তিনি লেখায় প্রমাণ পাইয়াছেন। প্রতি নগর ও পল্লীতে পবিত্র বৃক্ষ থাকিত। ইহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কথারও উল্লেখ আছে। ত্রিশূলের উল্লেখও নাকি তিনি দেখিতে পাইয়াছেন। নরবলি হইত বলিয়াও তিনি মনে করেন। সাতটি কিংবা সাতের গুণক (যথা একুশ প্রভৃতি)-সংখ্যক নরবলির প্রথা ছিল। বৃক্ষের অধোদেশে বলি হইত। যে বৃক্ষের নীচে বলি হইত তাহাকে "মরণ-বৃক্ষ" (Death-tree) বলা হইত। মৃতদেহ গরুর গাড়ীতে করিয়া শ্মশানে লইয়া গিয়া দাহ করা হইত। বেশীর ভাগ সম্পত্তিই মন্দিরের দেবতার পূজার জন্য দেবোত্তর থাকিত। এক সময়ে নাকি মৎস্য-কর (fish-tax) পর্য্যন্ত লিঙ্গপূজায় ব্যয়িত হইত। এই দেশ ভগবানেরই রাজ্য এবং রাজারা তাঁহারই প্রতিনিধি—এই ধারণা লইয়া একাধারে ধর্ম্ম ও রাজ্য এই উভয়ের উপর রাজারা কর্ত্তৃত্ব করিতেন।[১]

হেরাস্ যেরূপ ভাবে শীলমোহর পাঠ করিয়া এত তথ্য আবিষ্কার করিলেন—তাহা এখনও পণ্ডিতসমাজ মানিয়া লন নাই। তাঁহার

১ Journal of the University of Bombay, Vol. V, 1936-37, pp. 1-29.
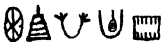
পাঠগুলি বৈজ্ঞানিক কষ্টি-পাথরে পরীক্ষা করিলে তাহা এই পরীক্ষায় কতদূর উত্তীর্ণ হইতে পারিবে সে কথা বলা শক্ত।

রোস্

মিঃ রোস্ এই লিপির সংখ্যা বিষয়ে আলোচনা করিয়া, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এবং ১২ এই কয়েকটি সংখ্যা নির্দ্দেশক চিহ্ন আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে মোহেন্-জো-দড়ো লিপির ভাষার সঙ্গে আদিম মুণ্ডা, আদিম দ্রাবিড়ী অথবা আদিম বুরুষস্কি ভাষার কোন সম্বন্ধ নাই। পক্ষান্তরে আদিম ইন্দোনেশীয়ার ভাষার সঙ্গে এখানকার ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস।[১]

হ্রোজ্নী

চেকোশ্লোভেকিয়া দেশীয় পণ্ডিত হ্রোজ্না (Bedrich Hrozny) মনে করেন যে এই আদি ভারতীয় (Proto-Indian) মোহেন-জো-দড়ো লিপির অধিকাংশেরই হিটাইট (Hittite) জাতির হিরোগ্লিফিক (Hieroglyphic) লেখার সঙ্গে এবং কোন কোন অক্ষরের ঐ জাতিরই কালকচিহ্ন-বিশিষ্ট (cuneiform) লেখার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলিয় প্রতীয়মান হয়। তাঁহার মতে এই লেখায় ভাবব্যঞ্জক (ideographic) এবং ধ্বনিব্যঞ্জক (phonetic) উভয় জাতীয় চিহ্নই ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি একটি সুবৃহৎ ককুদ্বান্ বৃষযুক্ত এক শীলমোহরে ব্যবহৃত [চিহ্ন] এই সকল চিহ্নের মধ্যে সর্ব্ব দক্ষিণে ব্যবহৃত চিহ্নকে একটি বৃহৎ গৃহের নিদর্শন মনে করেন এবং তাহার বাম দিকে ব্যবহৃত তিনটি চিহ্ন ধ্বনিজ্ঞাপক ন-ষ-ষ্ (na-sha-sh) এবং সকলের বামে ব্যবহৃত চিহ্নটি একটি মুদ্রাচিহ্ন বা শীলমোহর-

১ Mem. Arch. Sur. Ind. No. 57. p. 20-21.

জ্ঞাপক। তাঁহার মতে "নষষ্" ("nashash") শব্দটি বসিয়াছে সুবৃহৎ গৃহটি কিংবা অট্টালিকার পরিবর্ত্তে। সমগ্র লেখার অর্থ "সুবৃহৎ গৃহ বা প্রাসাদের শীলমোহর" বলিয়া তিনি মনে করেন।[১]

শ্রীযুক্ত হ্রোজ্‌নী হিটাইট্ লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছিলেন এবং যখন শুনা গেল যে সিন্ধুলিপিরও পাঠোদ্ধার তিনি করিতে পারিয়াছেন, তখন পণ্ডিতসমাজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। কিন্তু তাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়া মনে সন্দেহ হয় তিনি এখনও এই লিপিরহস্য ভেদ করিবার যন্ত্রের সন্ধান লাভ করিতে পারেন নাই। তাই পণ্ডিতসমাজে ইহা বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

কিছুকাল পূর্ব্বে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত কাউয়াই দ্বীপের কালোয়া সহরের "কেলী ন্যাচারেল হিস্টরি মিউজিয়াম" (Natural History Museum)-এর চেয়ারম্যান্ মিসেস্ রুথ্ হ্যানার হাওয়াই দ্বীপের পাহাড়ে পাথরের উপর ক্ষোদিত কতিপয় চিহ্ন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের গোচরীভূত করেন। প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতার কোন কোন অক্ষরের সঙ্গে ঐ সকল চিহ্নের কিছু কিছু সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। অনুসন্ধানের জন্য ঐ বিভাগ হইতে ডাঃ ছাবরা হাওয়াই দ্বীপে গিয়া সিন্ধুলিপিতে ব্যবহৃত প্রায় ৪০টি চিহ্ন উহাদের মধ্যে আবিষ্কার করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ইহাতে সুপ্রাচীন অতীতে ভারতের সঙ্গে হাওয়াই দ্বীপের সভ্যতা ও সংস্কৃতির যোগাযোগের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু লিপিরহস্য উদ্‌ঘাটনের কোন সূত্র এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

বস্তুতঃ শীলমোহরের পাঠোদ্ধার করা এখন পর্য্যন্ত আমাদের দ্বারা

১ Bedrich Hrozny—Ancient History of Western Asia, India and Crete, translated by Jindrich Prochazka, pp 170f.

সম্ভব হয় নাই। যাঁহারা পাঠোদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মতগুলি পণ্ডিত-সমাজে এখনও গ্রাহ্য হয় নাই। তবে সিন্ধু-সভ্যতার পরবর্ত্তী যুগে ভারতবর্ষে এই শীলমোহরের প্রভাব নানাভাবে যে অনুভূত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, এখানকার শীলমোহরের অনেক চিত্র প্রাচীন ভারতের 'লাঞ্ছনময়' (punch-marked) মুদ্রায়ও দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্ব প্রথম গ্যাড্ এবং তৎপরে ফাব্রি এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

ব্যাক্ট্রীয় (Bactrian) ও ইন্দো-গ্রীক্ (Indo-Greek) রাজাদের অনেক মুদ্রায় বৃষ ও গজ-মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। ইন্দো-পার্থীয় (Indo-Parthian) নৃপতিদের মুদ্রায়ও গজ ও বৃষ-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী কালের রাজাদের মুদ্রাতেও এই মুদ্রারই প্রভাব বিস্তার-লাভ করিয়াছিল[১]। গুপ্তযুগের অনেক মুদ্রায়ও বৃষ বা নন্দীর মূর্ত্তি অঙ্কিত হইত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।[২] অন্ধ্রবংশীয় রাজাদের মুদ্রায় মোহেন্-জো-দড়োর শীলমোহরে ব্যবহৃত তীর-ধনুক, গণ্ডার, হস্তী প্রভৃতির প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়।[৩]

ঐতিহাসিক যুগের তাম্র-ফলকে প্রশস্তি বা দান-পত্রাদি লিখিবার যে প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মূলে সিন্ধু-সভ্যতার ক্ষুদ্র তাম্র-ফলকের প্রভাব আছে কিনা ভাবিবার বিষয়। পরবর্ত্তী যুগের, অর্থাৎ

১ V. A. Smith, Catalogue of the Coins in the Indian Museum, Calcutta, দ্রষ্টব্য।

২ Allan's Catalogue, pp. 121-22, Nos. 445-50 ; pp. 151-52, Nos. 615-616 ; প্রাক্-খ্রীষ্টীয় যুগের উজ্জয়িনী মুদ্রায়ও যে বৃষের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

৩ E. J. Rapson, Catalogue of Indin Coins, Andhras, W. Ksatrapas, etc. দ্রষ্টব্য।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ[১] ও সপ্তম[২] শতাব্দীর বলভীরাজ-বংশের কোন কোন তাম্র-ফলকের এবং খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর[৩] কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্কের সময়ের তাম্র-ফলকের শীলমোহরে বৃষের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অনুসন্ধান করিলে ঐতিহাসিক যুগের আরও অনেক রাজার শীলমোহরে মোহেন্-জো-দড়োর শীলমোহরের প্রভাব পরিলক্ষিত হইবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বৈশালীতে (বর্ত্তমান বসাঢ়ে) প্রাপ্ত এক শীলমোহরে খ্রীষ্টীয় ১ম-২য় শতাব্দীর ব্রাহ্মীলেখার পার্শ্বে কতিপয় সিন্ধুলিপির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়[৪]। সম্ভবতঃ ঐ শীলমোহর দ্বিভাষায় লিখিত। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তবে অধিকসংখ্যক এতাদৃশ লেখ আবিষ্কৃত হইলে সৈন্ধব লিপির পাঠোদ্ধারের সূত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে।

১ Ep. Ind , Vol. III. No. 46.

২ Ibid, Vol. I. No. 13.

৩ Ibid, Vol. VI. No. 14.

৪ Arch. Sur. Ind., An. Rep., 1913-14 PL. No. 800

একাদশ পরিচ্ছেদ

ভাষা

ইতিপূর্ব্বে আলোচনা-প্রসঙ্গে মোটামুটি দেখা গিয়াছে যে আহার-বিহার, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, শিল্প-বাণিজ্য ও জীবন-যাত্রার অন্যান্য ক্ষেত্রে সিন্ধু-উপত্যকাবাসী ও বৈদিক আর্য্যদের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল। সুতরাং ভারতীয় আর্য্যদিগকে মোহেন্-জো-দড়ো-সভ্যতার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া ধরিয়া লওয়া সম্ভবপর নয়। পক্ষান্তরে প্রাচীন কালে তাঁহারা যে এ দেশে ছিলেন তাহারও কোন সন্তোষজনক প্রমাণ এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কাজেই মোহেন্-জো-দড়োর শীলমোহরের ভাষা খুব সম্ভব আর্য্যভাষা (সংস্কৃত) নয়। সিন্ধু-উপত্যকায় তখন দ্রাবিড় জাতির বাস ছিল বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কারণ সিন্ধু-প্রদেশ-সংলগ্ন বেলুচিস্তানের ব্রাহুই (Brahui) জাতির ভাষা বর্ত্তমান দক্ষিণভারত-নিবাসী দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর ভাষাসমূহের অন্যতম। ব্রাহুইরাই নাকি বেলুচিস্তানের প্রাচীনতম অধিবাসী, আর্য্যভাষী ইরানী বেলুচিরা পরবর্ত্তী কালে আসে। প্রাচীন বেলুচিস্তান ও সিন্ধু-উপত্যকার চিত্রকলা এবং পুরাবস্তুর মধ্যে যথেষ্ট ঐক্য দেখা যায়। ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চিত্রশিল্প ও সভ্যতার অন্যান্য প্রতীক-পরীক্ষার দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন যে একদিকে ক্রীত্ ও ইজিয়ান্ দ্বীপপুঞ্জ এবং অন্যদিকে হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়ো এই উভয়ের মধ্যে একটা সম্বন্ধের সূত্র বিদ্যমান ছিল। মেসোপটেমিয়া দেশ খ্রীঃ পূ ৩০০০ অব্দে সিন্ধু-ক্রীত্-সভ্যতার সংযোগ-ক্ষেত্র ছিল। দক্ষিণ-ভারতীয় নৌকা-পরীক্ষাদ্বারা শ্রীযুক্ত জেমস্ হর্নেল (James Hornell) স্থির করিয়াছেন[১] যে আদি-দ্রাবিড়-জাতি

১ 'The Origins and Ethnological Significance of Indian Boat Designs,' Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. II. No. 13, 1920, pp. 225-26.

ভূমধ্যসাগরবাসী জাতিবিশেষের অন্তর্ভুক্ত; ইহাদের নৌকার নমুনা মিসর প্রভৃতি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা ভূমধ্যসাগরাঞ্চল হইতে যাযাবররূপে মেসোপটেমিয়ায় প্রবেশ করে। সেখানে কিছু কাল থাকার পর সম্ভবতঃ শেমীয় প্রভৃতি কোন জাতির বিতাড়নে পূর্ব্বমুখে সরিতে সরিতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া কিছুকাল সিন্ধু-উপত্যকায় বাস করে। উভয়ের প্রাচীন আচার, ব্যবহার ও ভাষার সাম্য সূক্ষ্মদর্শীর দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। অতঃপর আদি-দ্রাবিড়রা ক্রমশঃ দক্ষিণ ভারতে গিয়া স্থায়ী বসতি স্থাপন করিয়া বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। মৃৎশিল্প, মৃচ্চিত্র ও অন্যান্য পুরাবস্তুতে সিন্ধু-উপত্যকা ও বেলুচিস্তানের ব্রাহুই-প্রধান স্থান-সমূহের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। পক্ষান্তরে দ্রাবিড়জাতি ও ব্রাহুই জাতি এই উভয়ের ভাষাই সংযোগ-মূলক (agglutinative)। মোহেন্-জো-দড়োর লিপি পরীক্ষা করিয়া কেহ কেহ মনে করেন তত্রত্য ভাষাও সংযোগমূলক (agglutinative) ছিল। এজন্য অনেকের ধারণা যে আদি-দ্রাবিড়দের সঙ্গে মোহেন্-জো-দড়োবাসীর জাতিগত ঐক্য ছিল, কিংবা উভয়েই একজাতিভুক্ত। ভূমধ্যসাগরের ক্রীত্‌দ্বীপ হইতে আরম্ভ করিয়া মেসোপটেমিয়া, এসিয়া মাইনর, সুসা, বেলুচিস্তান, মোহেন-জো-দড়ো, হরপ্পা ও আদিত্তনল্লুর প্রভৃতির ভিতর দিয়া বর্ত্তমান দ্রাবিড় জাতির মধ্যে সমাজ ও কৃষ্টির একটা সামঞ্জস্য বা ঐক্যের ধারা যে প্রবাহিত ইহা পণ্ডিতেরা লক্ষ্য করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার মোহেন্-জো-দড়োর ভাষার সঙ্গে মুণ্ডা ভাষার সামঞ্জস্য থাকিতে পারে বলিয়া অনুমান করেন।[১] ইষ্টার্ আয়্‌-ল্যাণ্ডের (Easter Island) অক্ষরের সঙ্গেও এখানকার শতাধিক অক্ষরের মিল আছে।[২] এই উভয়ের ভাষার মধ্যে ঐক্য থাকার আশা

১ Hunter, "The Script of Harappa and Mohenjodaro," p. 13.

২ হেভেশি-প্রদর্শিত ইষ্টার্ আয়্‌ল্যাণ্ডের লিপির সহিত সৈন্ধব লিপির

করা কি অবান্তর হইবে? কিন্তু কে কখন এই উভয় লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া জগৎকে নূতন বাণী শুনাইবে? কবে আমরা সেই মোহেন্-জো-দড়ো কিংবা ইষ্টার্ আয়্ল্যাণ্ডের প্রিন্সেপ্কে[১] পাইব?

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাই নগরীর এক সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে রেভারেণ্ড্ হেরাস্ বলিয়াছিলেন যে, তিনি মোহেন্-জো-দড়োর শীল-মোহর পাঠ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি কয়েকটি দেবদেবীর নাম ও ঐস্থান-সম্বন্ধে অন্যান্য তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করেন। বর্ত্তমান দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত শিবের কয়েকটি নামের উল্লেখ সিন্ধুলিপিতে আছে বলিয়া তিনি বলেন। দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত আরও অনেক নাম বা শব্দের উল্লেখ তিনি এই লেখায় দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়াও মত প্রকাশ করেন। যদি তাঁহার পাঠ সত্যই নির্ভুল হয় তবে ঐ যুগের মোহেন্-জো-দড়োর ভাষা যে দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠীরই ভাষা ছিল, ইহা বলা যাইতে পারে। মোহেন্-জো-দড়ো-বাসীরা দ্রাবিড়-জাতীয় এবং তাহাদের ভাষাও দ্রাবিড়ীয় অন্য কোন কোন পণ্ডিতও এইরূপ অনুমান করেন। কিন্তু এই সব গবেষণা ও অনুমানকে যে কষ্টিপাথরে কষিয়া সত্যাসত্য প্রমাণ করিতে হইবে, তাহার সন্ধান এখনও পাওয়া যাইতেছে না।

সাদৃশ্যবিষয়ে বর্ত্তমানে কেহ কেহ বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন। Prof. S. K. Chatterji, 'The Study of New Indo-Aryan,' Jour. Dep. Let. (C. U.), Vol. XXIX, pp. 19-20.

১ ব্রাহ্মীলিপির পাঠোদ্ধার-কর্ত্তা। ইজিপ্তীয় লিপির (Hieroglyphics) পাঠোদ্ধার করেন শ্যাম্পোলিওন (Champolion) এবং মেসোপটেমিয়া ও পারস্যের কীলকাক্ষরের (Cuneiform) পাঠোদ্ধার-কর্ত্তা ছিলেন রলিন্সন্ (Rawlinson)।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সিন্ধু-সভ্যতার বিস্তৃতি

। ভারতীয় তাম্র-প্রস্তর যুগের ধ্বংসাবশেষ যে সব স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে সিন্ধুতীরবর্ত্তী মোহেন্-জো-দড়োই সর্ব্বপ্রধান। এখানকার সভ্যতার প্রত্যেক দিক্ বা অঙ্গ সুন্দরভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। নাগরিক এবং সামাজিক জীবনেরও প্রত্যেক অংশ সম্পূর্ণ-রূপে বিকশিত হইয়াছিল। পুরাকালে স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে, স্বাস্থ্য-সংরক্ষণে, পূর্ত্তবিদ্যায়, শিল্প ও ললিত-কলায় এবং নানারূপ জ্ঞান-বিজ্ঞানে মোহেন্-জো-দড়োর জনসাধারণের যে গর্ব্ব করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল, । সেই কাহিনী তাহাদের পরিত্যক্ত পুরাবস্তুই বহন করিয়া আনিয়াছে। এতদিন ইহারা ধ্বংসস্তূপের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া ছিল। মোহেন্-জো-দড়োর প্রত্নসম্পদ্ এখন খনিত্রের আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিয়া পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার ভারতবাসীদের সভ্যতার কথা বিবৃত করিতেছে।

মোহেন্-জো-দড়োর স্থাবর এবং অস্থাবর এই উভয়বিধ পুরাবস্তুতেই সভ্যতার সুনিপুণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। । এখানেই যে এই সভ্যতার পত্তন, বৃদ্ধি ও পতন হইয়াছিল তাহা মনে হয় না। কারণ, মোহেন্-জো দড়োর সর্ব্বনিম্নস্তরে অর্থাৎ নগরের আদি অবস্থার সমস্ত দ্রব্যেই যেন একটা সমৃদ্ধ অবস্থার ভাব প্রতিভাত হয়। । এই বিকশিত অবস্থার পূর্ব্বে ইহার সৃষ্টি অন্য কোথাও হয়ত হইয়াছিল। । কেহ কেহ মনে করেন হরপ্পা ও মোহেন্‌জোদড়োর নাগরিক সভ্যতার সৃষ্টিকারী জাতি তাহাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির নানারূপ উপাদান, আসবাবপত্র, বিবিধ সম্পদ্ ও কারুশিল্পী প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া জলপথে (সমুদ্রপথে) বিদেশ হইতে সিন্ধু-পাঞ্জাব প্রদেশে আগমন করতঃ নাগরিক সভ্যতার পত্তন করেন। । সমুদ্রপথে যাত্রার ফলেই উপনিবেশকারীদের মৌলিক

সভ্যতার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। সেই অপরিবর্ত্তিত পূর্ণাঙ্গ সভ্যতাকে অবলম্বন করিয়াই সম্ভবতঃ বিশাল সিন্ধু-সভ্যতার সূত্রপাত হয়।। এই উক্তি সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত লোথালে আবিষ্কৃত হরপ্পা-যুগের সভ্যতা সম্বন্ধেও খাটে।[১] অধিকন্তু এইরূপ একটা যুগান্তর-সৃষ্টিকারী সভ্যতার গণ্ডী মোহেন্-জো-দড়োর চতুঃসীমার মধ্যে নিশ্চয়ই নিবদ্ধ ছিল না। চারিশত মাইল দূরবর্ত্তী হরপ্পা নগরে অনুরূপ সভ্যতার অস্তিত্ব হইতে ইতিপূর্ব্বেই ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই সভ্যতার আরও বহুদূর-বিস্তৃত যে একটি আবেষ্টনী ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আরও যে বহু প্রাচীন ভগ্নস্তূপ সিন্ধুপ্রদেশে বিদ্যমান আছে, তাহা পূর্ব্ব হইতে কিছু কিছু জানা ছিল।

এইগুলির পরীক্ষা-কল্পে একজন বিশেষজ্ঞকে প্রেরণ করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া ভারত গভর্নমেণ্ট প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের তদানীন্তন সুযোগ্য কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়কে সিন্ধুপ্রদেশের নানাস্থানে পরিত্যক্ত ধ্বংসস্তূপ পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিয়া বিবরণ প্রকাশ করিতে নিযুক্ত করেন। তদনুসারে তিনি ১৯২৭-২৮, ১৯২৯-৩০ এবং ১৯৩০-৩১ সালের শীতকালে সিন্ধুদেশের বিভিন্ন স্থানে ভগ্নস্তূপ পরীক্ষা করিয়া বিবরণ প্রকাশ করেন।[২] তাঁহার বিবরণ দক্ষতার সহিত লিখিত এবং তিনি যে এ কার্য্যে যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ ইহাতে বিদ্যমান। তাঁহার বিবরণ এ দেশে এবং বিদেশে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়া পুরাতত্ত্বে ভারতীয় কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছে।

প্রথম বর্ষে তিনি মোহেন্ জো-দড়ো হইতে ১৬ মাইল দূরবর্ত্তী

১ Arnold Toynbee—A Study of History Vol. II, p. 88.

২ 'Explorations in Sind' by N. G. Majumdar; Arch. Sur. Ind. Memoir No. 48, 1934.

ঝুকর (Jhukar) নামক স্থানে ধ্বংসস্তূপ পরীক্ষা ও খনন করিয়া উপরের স্তরে ইন্দো-সাসানীয় যুগের এবং নীচের স্তরে মোহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত পুরাবস্তুর অনুরূপ দ্রব্য আবিষ্কার করেন অর্থাৎ এখানে তিনি উপরের স্তরে ঐতিহাসিক যুগের এবং নীচে প্রাগৈতিহাসিক বা সিন্ধু-সভ্যতার যুগের বিবিধ পুরাবস্তু আবিষ্কার করেন। ঐগুলির মধ্যে চিত্রিত মৃৎপাত্রই বিশেষভাবে তাম্র-প্রস্তর সভ্যতার সাক্ষ্য বহন করিয়া আনিয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মধ্যে আবার দুই প্রকার মৃৎপাত্র ছিল, কতক অপেক্ষাকৃত অধিক প্রাচীন এবং কতক পরবর্ত্তী কালের। কৃষ্ণাভ লাল রং-এর উপরে কাল রং-এর অঙ্কিত চিত্র অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কালের পরিচায়ক।[১] তৎপরবর্তী কালের মৃৎপাত্রে গাঢ় লাল কিংবা ফ্যাকাশে লালের উপরে কৃষ্ণাভ লালে আংশিকভাবে অঙ্কিত চিত্র দেখা যায়। তাম্রপ্রস্তর যুগের হইলেও ঝুকরের এই উভয় সভ্যতাকেই পিগোট্ ও হুইলার্ হরপ্পা মোহেন্-জো-দড়ো যুগের পরবর্ত্তী কালের বলিয়া মনে করেন।[২]

১৯২৯-৩০ সালে মজুমদার মহাশয় সিন্ধু-সমুদ্র-সঙ্গমের পার্শ্ববর্ত্তী নানা স্থানে প্রায় ২০০ মাইল পথ ভ্রমণ করিয়া আনুমানিক শতাধিক প্রাচীন বসতির পরীক্ষা করেন।

১৯৩০-৩১ সালে তিনি সিন্ধুর ধারার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিকে গিয়া বহু অজ্ঞাত ভগ্নস্তূপের সন্ধান লাভ করেন। ঐগুলি পরীক্ষা করিয়া চিত্র গ্রহণ এবং খনন কার্য্যও পরিচালনা করেন। পর বৎসর পুনরায় সিন্ধুর পূর্ব্ব অঞ্চলস্থিত মরুভূমির নানাস্থানে ঐরূপ পরীক্ষা-কল্পে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু গভর্নমেণ্টের অর্থসঙ্কট-হেতু তাহা সম্ভব হয় নাই।

১ Majumdar—Explorations in Sind, Mem. Arch. Sur. Ind. (1933), Vol 48, pp. 9-10.

২ Wheeler, Indus Civilisation, p. 42.

সিন্ধুর অধোদেশস্থিত আম্‌রি (Amri) এবং অন্যান্য স্থানে লব্ধ পুরাবস্তু পরীক্ষা করিয়া তিনি ঐ সকল স্থানের সভ্যতা মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের বলিয়া মনে করেন। এই সব স্থানের মৃৎ-পাত্র চক্র-নির্ম্মিত, মসৃণ ও পাতলা; এইগুলিতে রক্তাভ কিংবা পীতাভ রংয়ের উপর দুই রংয়ের জ্যামিতিক চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োর লালের উপর কাল চিত্র হইতে ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দক্ষিণ-বেলুচিস্তানে স্যর্ অরেল্ ষ্টাইন্‌ও এইরূপ মৃৎ-পাত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।

আম্‌রি-র সভ্যতা মোহেন্-জো-দড়োর পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে সুরু হইয়াছিল। সেখানে উপরের স্তরে মোহেন্-জো-দড়োর মৃৎ-পাত্রের অনুরূপ লালের উপর কাল চিত্র-যুক্ত পাত্র পাওয়া যায়। তাহার নীচের স্তরে পূর্বোল্লিখিত বিশিষ্ট ধরণের পাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানে কাল মাটির স্তর। ইহাতে উপরের স্তর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এক জাতীয় মৃৎ-শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। এই পাত্রের মাটি, উপাদান, চিত্র এবং রং ইত্যাদি সম্পূর্ণ ভিন্ন। কাজেই বিজ্ঞান-সম্মত স্তরীকরণের (stratification) দ্বারা এই সভ্যতা যে পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ইহাই প্রমাণিত হয়।[১]

উক্ত প্রকার চিত্রিত পাত্র যে-জাতীয় লোকেরা ব্যবহার করিত, তাহাদের প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহের চিহ্নও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই জাতির সভ্যতা যে অতি উচ্চাঙ্গের ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উক্ত জাতির সভ্যতার বিস্তৃত বিবরণ জানিবার সুবিধা হয় নাই। কারণ এখানে সময় ও ব্যয়সাধ্য পরীক্ষা ও গবেষণার সুযোগ মজুমদার মহাশয়ের ছিল না।

কির্‌থার্ পর্ব্বতমালার সন্নিকটে শিলাময় প্রদেশে তিনি দুইটি প্রাচীন বসতির সন্ধান পাইয়াছিলেন। এই স্থানে গৃহগুলি প্রস্তর-নির্ম্মিত

১ Ibid, pp. 24-33.

ছিল। সিন্ধুপ্রদেশের হায়দ্রাবাদ সহর হইতে প্রায় ৪৮ মাইল দূরে পর্ব্বতোপরি কোহ্ট্রাস্ বুথী (Kohtras Buthi) নামক স্থানে নগরের বহিঃস্থিত প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীর এবং গৃহের শিলাময় ভিত্তির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে লব্ধ কয়েক খণ্ড খর্পর ও মৃন্ময় পান-পাত্র দেখিয়া মনে হয়, সেখানকার অধিবাসীরা মোহেন্-জো-দড়ো-বাসীদের একজাতীয় বা সমজাতীয় ছিল। ইহার উত্তর দিকে মোহেন্-জো-দড়ো হইতে প্রায় ৬৫ মাইল দূরে আলী মুরাদ (Ali Murad) নামক স্থানে মোটামুটি ২ × ১ × ১ ফুট মাপের প্রস্তর-খণ্ড-দ্বারা নির্ম্মিত প্রাচীর আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৭০ ফুট পর্য্যন্ত অনুসরণ করা হইয়াছে, এবং স্থানে স্থানে ৫ ফুট পর্য্যন্ত ইহার উচ্চতার চিহ্ন বিদ্যমান আছে। কোহ্ট্রাস্ বুথীতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটি গিরিদুর্গ ছিল, এবং তত্রত্য শিলাময় প্রাচীর নগর রক্ষার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা বোধ হয় সীমান্ত রক্ষার জন্য অন্তপাল দুর্গের মত ছিল। আলী মুরাদ ও কোহ্ট্রাসের রঙ্গীন মৃন্ময়-পাত্র এক যুগের বলিয়াই মনে হয়।

হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োতে এ যাবৎ নগরবেষ্টনকারী প্রাচীরের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কিন্তু একজাতীয় সভ্যতায় উদ্ভাসিত আলী-মুরাদ ও কোহ্ট্রাসের প্রাচীরের অস্তিত্ব দ্বারা মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পায়ও অনুরূপ প্রাচীর হয়ত বিদ্যমান ছিল বলিয়া প্রতীতি জন্মে। আলী-মুরাদ বেলুচিস্তানগামী সার্থবাহ-পথের সন্নিকটে অবস্থিত। বেলুচিস্তানের পার্ব্বত্যজাতির আক্রমণের ভয়ে আলী-মুরাদের অধিবাসীদের সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত। তজ্জন্য বোধ হয সেখানে প্রস্তর-ময় এরূপ সুদৃঢ় প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল।

সাধারণতঃ, সিন্ধুপ্রদেশস্থিত বর্ত্তমান হায়দ্রাবাদ সহরের উত্তর দিকে অসংখ্য প্রাগৈতিহাসিক বসতির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার দক্ষিণ দিকেও মজুমদার মহাশয় তিনটি বসতির সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন। ইহাদের অন্যতম, থাড়ো (Tharro) নামক স্থানে

চকমকি পাথরের অসংখ্য ছুরি দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই স্থানে ঐ যুগের চকমকি পাথরের কারখানা ছিল বলিয়া মনে হয়।

মজুমদার মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত অধিকাংশ স্তূপই সিন্ধুনদ এবং বেলুচিস্তানের মধ্যে প্রায় ১৮০ মাইল ব্যাপিয়া একটি বেষ্টনীর ভিতরে অবস্থিত। সিন্ধুপ্রদেশের পূর্ব্বাঞ্চলস্থিত মরুভূমি অঞ্চলে পরীক্ষা করিলে আরও অধিকসংখ্যক ভগ্নস্তূপ আবিষ্কৃত হইতে পারে। সিন্ধুর পূর্ব্ব তীরে "আম্‌রি"র বিপরীত দিকে মোহেন-জো-দড়ো হইতে প্রায় ৮০ মাইল দক্ষিণে চান্-হু-দড়ো নামক স্থানে অল্প সময়ের পরীক্ষায়ই তিনি মোহেন্-জো-দড়োতে লব্ধ শীলমোহর, রঙ্গীন পাত্র, মাটীর পুতুল ও আকীক পাথরের চিত্রিত মালা প্রভৃতির অনুরূপ পুরাবস্তু আবিষ্কার করেন। ইহাতে তাঁহার ধারণা বদ্ধমূল হয় যে এখানেও মোহেন্-জো-দড়োর সুসভ্য অধিবাসীদেরই কোনও শাখা বা সমজাতীয় লোক বাস করিত। যদিও উভয় স্থানের অধিবাসীরা একজাতীয় সভ্যতারই অন্তর্ভুক্ত তথাপি এখানে অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রণালীর মৃৎশিল্প দেখিয়া তিনি এই স্থান উভয়ের মধ্যে প্রাচীনতর বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ডাঃ ম্যাকেও তাঁহার এই মতের সমর্থন করেন।[১] সামান্য খননের পরেই যে চমৎকার রঙ্গীন জালা আবিষ্কৃত হইয়াছে, এইরূপ উচ্চাঙ্গের বর্ণবিন্যাস-পূর্ণ দ্রব্য আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

এখানে তিনি মোহেন-জো-দড়ো সভ্যতার এবং তৎপরবর্ত্তী সভ্যতার অনেক পুরাবস্তু আবিষ্কার করেন। এখানকার পুরু মৃৎপাত্রে লালের উপর কাল রংএব ময়ূর,[২] শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সজ্জিত হরিণ,

১ Antiquity, March 1935, p. 112.
Mackay—The Indus Civilisation, p. 149.

২ হরপ্পার রঞ্জিত মৃৎপাত্রে লালের উপর কাল রংএ চিত্রিত ময়ূরের উদরে মানুষেব প্রেতাত্মার ছবি দেখিয়া মনে হয়, ময়ূর সেই যুগে পবিত্র জীব বলিয়া গণ্য হইত।

অশ্বত্থ-পত্র ইত্যাদির চিত্র অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৫-৩৬ সালে ডাঃ ম্যাকে ঐখানে আরও বিশেষ ভাবে খনন করিয়া পর পর তিনটি বিভিন্ন জাতীয় মানবের বসতির চিহ্ন দেখিতে পান। যতদূর আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে সর্ব্বপ্রাচীন বসতিতে মোহেন্-জো-দড়ো সভ্যতার লক্ষণযুক্ত অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। তৎপরবর্ত্তী বা মধ্যযুগে সিন্ধুপ্রদেশে ঝুকরের সভ্যতার এবং আরও পরবর্ত্তী বা তৃতীয় যুগে ঝাঙ্গরের কৃষ্টির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন অর্থাৎ মোহেন্-জো-দড়ো সভ্যতার প্রথম যুগের পরিচয় পাওয়া যায় ইটের তিন চারিখানা ছোট বাড়ী এবং একটি জলের কূয়াতে। তারপর স্থানটি কিছু দিনের জন্য পরিত্যক্ত হয়। অতঃপর এখানে আবার বসতি স্থাপন করা হয়। সে সময়ে বন্যানিরোধের উপযোগী কাঁচা ইটের ভিত্তির উপর ২৫ ফুট প্রশস্ত এক রাজপথের পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বাসোপযোগী গৃহনির্ম্মাণ করা হয়। মোহেন্-জো-দড়োর মত রাজপথ হইতে আড়াআড়ি ভাবে গলি ও তৎসঙ্গে নর্দ্দামাও তৈরী করা হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ঐগুলি যে সর্ব্বদা যত্নসহকারে সুরক্ষিত হইত, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে যে একটি কারুশিল্পীর পল্লী ছিল তাহা তাহাদের নানারূপ উপাদান এবং অর্দ্ধনির্ম্মিত ও অসম্পন্ন তামা ও ব্রোঞ্জের যন্ত্রপাতি এবং মালার কাজ, শাঁখের ও হাড়ের কাজ এবং শীলমোহর দেখিয়া বুঝা যায়। মোহেন্-জো-দড়ো সভ্যতার তৃতীয় যুগের প্রমাণ পাওয়া যায় ইটের কয়েকটি ক্ষুদ্রগৃহ এবং তৎসংলগ্ন পয়ঃপ্রণালী হইতে। চানহুদড়োর বিভিন্ন জাতীয় উন্নত শিল্পের মধ্যে নানা প্রকার মালাতৈরীর শিল্প যে অত্যন্ত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল তাহার ভূরিভূরি প্রমাণ এখানে পাওয়া যায়। মজুমদার মহাশয়ের বর্ণনা ছাড়া ডাঃ ম্যাকের বিবরণীতেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি এক জায়গায় বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন এখানকার শিল্পীরা এত দক্ষ ছিল যে এক বর্গ ইঞ্চি স্থানের মধ্যে তাহাদের তৈরী বহুশত সূক্ষ্ম মালার দানা সন্নিবেশিত করা যাইতে পারিত।

মোহেন-জো-দড়োর সভ্যতা-বিদগ্ধ লোকদের অন্তর্দ্ধানের অল্প পরেই চান্হুদড়োতে "ঝুকর" সভ্যতার আলোক-প্রাপ্ত লোকদের আবির্ভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্ববর্ত্তী জাতির পরিত্যক্ত কোন কোন আবাস গৃহের প্রাচীর পুরাতন ইট দিয়া উঁচু করিয়া ঝুকর সংস্কৃতির লোকেরা তাহাতেই বসবাস করিতে আরম্ভ করে। গরীব লোকেরা ছোট ছোট কুটীরে পুরাতন ইট দিয়া মেজে পাকা করিয়া বাস করিত। তাহাদের রান্নাঘর নীচু দেয়াল দিয়া আলাদা ভাবে তৈরী হইত। ইহাদের আদি বাসস্থান যে কোথায় ছিল কেহই বলিতে পারে না। তাহাদের মৃৎপাত্রে কিছু কিছু বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। হরপ্পা-মোহেন-জো-দড়োর পাত্রে লাল প্রলেপের উপর (red slip) শুধু কাল রংএর চিত্র থাকে। কিন্তু এখানে সাধারণতঃ প্রথমে আস্তৃত রংএর (slip) উপর আবার দুই রকম অর্থাৎ লাল ও কাল অথবা রক্তাভ কাল রং লাগান হইত। ঝুকরের পাত্রে প্রায়ই জ্যামিতিক চিত্র, কিন্তু হরপ্পা প্রভৃতি স্থানে প্রাকৃতিক চিত্রই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। হরপ্পা মোহেন্-জো-দড়োর মৃৎপাত্রগুলি পাতলা, কিন্তু ঝুকরে ঐগুলি পুরু ভাবে তৈরী করিয়া তেমন ভাল ভাবে পোড়ান হইত না এবং রং ও পালিস ভাল ভাবে লাগান হইত না। ঝুকরের মৃৎশিল্পের আরও একটি বিশেষত্ব এই যে এখানে সাধারণতঃ লালের পরিবর্ত্তে ঈষৎপীত রং (cream-colour) পুরুভাবে মাখাইয়া ইহার উপর সময় সময় অন্যান্য রং ব্যবহার করা হইত। ঝুকর এবং হরপ্পার পাত্রের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও প্রভেদও আছে। মজুমদার মহাশয়ের মতে ঝুকর ও আম্‌রির মৃৎশিল্প প্রায় একজাতীয়।[১] এইজন্য কেহ কেহ মনে করেন যে হরপ্পা-সভ্যতা যেন একজাতীয় ঝুকর আম্‌রি এই উভয় সভ্যতার মধ্যভাগে এক বিজাতীয় সমাবেশ।[২]

১ Majumdar—Exp. Sind. pp. 26, 81.

২ Wheeler—Ind. Civil. p. 44.

শীলমোহর নির্ম্মাণেও ঝুকর এবং মোহেন্-জো-দড়োর শিল্পীদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। এখানকার শীলমোহর বোতামের মত গোলাকার, মাটী কিংবা ফায়েন্স দিয়া তৈরী। কিন্তু মোহেন্-জো-দড়োর শীলমোহর চতুষ্কোণ এবং ইহাদের অধিকাংশই পাথরের।

চান্হুদড়োর সর্ব্বশেষ বা তৃতীয় যুগের অধিবাসীদের সঙ্গে ঝাঙ্গর সভ্যতার অনেকটা মিল আছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। ইহাদের আবাস-গৃহের কোন চিহ্নই বর্ত্তমান নাই। এক বিশিষ্ট ধরণের মৃৎশিল্পের কতিপয় নিদর্শন ছাড়া সমস্তই কালের কবলে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ইহাদের মৃৎপাত্র সাধারণতঃ ধূসর অথবা কাল রং এর এবং ইহাতে বাণমুখের মত (chevron) অথবা ত্রিভুজাকার ও অন্যান্য নমুনা ক্ষোদিত দেখা যায়। ইহাদের সংস্কৃতির আর কোন তথ্য এ যাবৎ জানা যায় নাই।

মজুমদার মহাশয়ের আবিষ্কৃত স্থান বর্ত্তমানে মনুষ্য-বসতি হইতে বহু দূরে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের পর এই স্থানে পুনরায় কেহ আর বসতি স্থাপন করে নাই। স্যর্ অরেল্ ষ্টাইনের ন্যায় মজুমদার মহাশয়ও মনে করেন, স্থানীয় রুক্ষ আবহাওয়াই এই সকল বসতির অধঃপতনের ও পরিত্যাগের কারণ। তিনি অনুমান করেন, তত্রত্য অধিবাসীরা এই সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব দিকে আর্দ্র আবহাওয়ায় গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল। ডাঃ ম্যাকে আরও মনে করেন যে ইহারা পূর্ব্বাঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে মিশিয়া স্থানীয় দৌর্ব্বল্যকর জলবায়ুর মধ্যে স্বীয় বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে।[১]

প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষেও যে হ্রদের মধ্যে মনুষ্য-বসতি বিদ্যমান ছিল ইহার প্রমাণও মজুমদার মহাশয় সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার পরিদর্শনের ফলে মান্ছর হ্রদের (Lake Manchhar)

১ Antiquity, March 1935, p. 112.

চতুর্দ্দিকে জলমগ্ন সৈকতভূমিতে চকমকি পাথরের ছুরি ও রঙ্গীন পাত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

তিনি বিভিন্ন স্থানে যে সব মৃৎ-শিল্পের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

(ক) সর্ব্বপ্রাচীন মৃৎপাত্র। ইহা পাটলবর্ণের মৃত্তিকানির্ম্মিত ও পাতলা এবং ইহাতে তিন রংয়ের জ্যামিতিক চিত্র থাকিত। পীতাভ ধূসর বা ঈষৎ লাল রংয়ের উপর কাল, কৃষ্ণাভ লাল (chocolate) অথবা রক্তিম বাদামী রং বিন্যস্ত করা হইত। আম্‌রি ও সিন্ধুপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে এইরূপ পাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। বেলুচিস্তানে "নাল" নামক স্থানে প্রাপ্ত মৃন্ময় পাত্রের আকৃতির সঙ্গে ইহার কতক সাদৃশ্য আছে।

(খ) সুদগ্ধ পুরু পাত্র। ইহাতে মসৃণ লালের উপর কাল রংয়ের নানারূপ চিত্র থাকিত। এইরূপ অতি সুন্দর মৃৎপাত্র চাহ্-নু-দড়োতে আবিষ্কৃত হইযাছে। পরবর্ত্তী যুগে ইহার চেয়ে নিকৃষ্ট ধরণের চিত্রহীন পাত্র মোহেন্-জো-দড়োতে ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়।

(গ) হালকা পাত্র। ইহাতে পীতাভ ধূসর রংয়ের প্রলেপের উপর কাল বা কৃষ্ণাভ লাল (chocolate) রংয়ের চিত্র দেখিতে পাওযা যায়। এরূপ কোন কোন পাত্রের গলায় রক্তিম পাটল রং থাকিত। ধারাবদ্ধ প্রণালীর (stylised) বৃক্ষ বা পুষ্পই এই সব দ্রব্যের প্রচলিত চিত্র। তিনি এই সব পাত্র ঝুকর ও মোহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের সমসাময়িক যুগের বলিয়া মনে করেন।

(ঘ) কৃষ্ণবর্ণ পাত্র। ইহাতে নানারূপ জ্যামিতিক চিত্র ক্ষোদিত ছিল। মান্‌ছর হ্রদের পার্শ্ববর্ত্তী ঝাঙ্গর (Jhangar) নামক স্থানে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিনি মাদ্রাজ প্রদেশের লৌহ-যুগের কাল পাত্রের সঙ্গে এইগুলির তুলনা করিয়াছেন। মোহেন্-জো-দড়োতেও এইজাতীয় পাত্র সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায়।

মজুমদার মহাশয় প্রথমোক্ত দুই শ্রেণীর মৃৎ-পাত্রের মধ্যে কোন

পারম্পরিক সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে করেন না। বরং ইহারা যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রণালীর সভ্যতার প্রতীক ইহাই তাঁহার ধারণা। প্রথমোক্ত পাত্রের নির্ম্মাতা জাতি বোধ হয় বেলুচিস্তান ও সিন্ধুদেশে এমন কি অতি প্রাচীন কালে সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও—বাস করিত, কিন্তু পরে দ্বিতীয় প্রণালীর পাত্র-নির্ম্মাতা জাতির নিকট, হয়ত পরাস্ত হইয়া তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। এখন এই উভয়ের স্বতন্ত্র পরিচয় পাওয়ার কোন উপায় নাই। দ্বিতীয়োক্ত জাতির মৃন্ময় পাত্রে বন্য ছাগলের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে তিনি মনে করেন, সিন্ধুপ্রদেশের পশ্চিমাংশে ইহাদের নির্ম্মাতাদের আদিবাস ছিল।

সিন্ধুপ্রদেশের স্থানে স্থানে প্রাগৈতিহাসিক যুগে বহু বসতি ছিল; ইহাদের মধ্যে মোহেন্-জো-দড়োর পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সমসাময়িক যুগের অনেক স্তূপ আছে। আবার ঐগুলির পরীক্ষা দ্বারা দুই প্রকার সভ্যতার ধারা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সব বিবরণ মজুমদার মহাশয়ের পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে মোহেন্-জো-দড়ো সভ্যতার চেয়েও পুরাতন সভ্যতার আংশিক সন্ধান লাভ করা গিয়াছে। সিন্ধুপ্রদেশ বা বেলুচিস্তানের কোন অংশে এই সভ্যতা সৃষ্ট হইয়া পরে অন্যান্য স্থানে প্রসার ও পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল, আপাততঃ আমরা এই ধারণা করিতে পারি।

শ্রীযুক্ত ফ্রাঙ্কফোর্টও (H. Frankfort) তাঁহার পুস্তকে[১] এবং প্রবন্ধে[২] বিভিন্ন দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া বহু গবেষণা-পূর্ব্বক মত প্রকাশ

১ H. Frankfort, Studies in Ancient Oriental Civilisation, Archæology and the Sumerian Problem, No. 4, Chicago, 1932.

২ H. Frankfort, The Indus Civilisation and the Near East, Annual Bibliography of Indian Archæology for 1932, pp. 1-12.

করেন যে মোহেন্-জো-দড়োর তথা ভারতের মৃন্ময় পাত্রের চিত্রের মূল সূত্র খুঁজিতে গেলে দেখা যাইবে যে ইহা বহু পুরাতন কোন মৃৎপাত্র-রঞ্জন-প্রণালীর পাকা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ; কিন্তু সিন্ধু-তীরবাসীরা স্বকীয় নিপুণতা-দ্বারা ইহাকে নিজস্ব সম্পত্তি করিয়া লইয়াছিল।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিভিন্ন সভ্য দেশের সঙ্গে মোহেন্-জো-দড়োর তথা সিন্ধু-সভ্যতার যে জীবন্ত আদান-প্রদানের বা সাদৃশ্যের ভাব বিদ্যমান ছিল তাহা আন্তর্জ্জাতিক পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিলেই বোধগম্য হয়। মেসোপটেমিয়ার বিভিন্ন স্থানে সৈন্ধবলিপিযুক্ত কতিপয় শীলমোহর এবং সিন্ধুতীরে লব্ধ চিত্রিত আকীক পাথরের মালার অনুরূপ মালা প্রভৃতি যে পাওয়া গিযাছে, এই বিষয় আমরা অবগত ছিলাম। অতঃপর শ্রীযুক্ত গ্যাড্ (C. J. Gadd) উর নগরীতে খননের সময় অন্যূন ১৮টি ভারতীয় শীলমোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।[১]

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ান্তর্গত প্রাচ্যবিদ্যা-বিভাগের (Oriental Institute of the University of Chicago) পক্ষ হইতে ফ্রাঙ্কফোর্ট্ পরিচালিত খনন-কার্য্যে বাগদাদের নিকটবর্ত্তী তল্ আস্মের (Tel Asmer) নামক স্থানে ১৯৩১ সালে মোহেন্-জো-দড়োর পুরাবস্তুর অনুরূপ বহু দ্রব্য আবিষ্কৃত হয়। মেসোপটেমিয়ার এই সব দ্রব্য মোটামুটি খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ অব্দের বলিয়া ফ্রাঙ্কফোর্ট্ মনে করেন। সেখানে লব্ধ একটী নলাকৃতি শীলমোহরে বাবিলোনিয়াতে অজ্ঞাত ভারতীয় জীবজন্তুর ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে। অন্যান্য দ্রব্যজাতের সঙ্গে এই শীলমোহরও যে সিন্ধু-উপত্যকা হইতে মেসোপটেমিয়ায় আমদানী হইয়াছিল, এই বিষয়ে ফ্রাঙ্কফোর্টের মনে কোন সন্দেহ নাই। আরও কোন কোন শীলমোহর, আকীক পাথরের চিত্রিত

১ Proceedings of the British Academy, Vol. XVIII, London, 1933.

মালা ও মৃন্ময়পাত্র প্রভৃতি দ্বারা সিন্ধু-উপত্যকা ও তল্-আস্মেরের মধ্যে সমজাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ক আদান-প্রদানের সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হয়।

বিবিধ ও সুনিপুণ স্থাপত্য এবং পূর্ত্তকর্ম্মে মোহেন্-জো-দড়োবাসীরা যে সমসাময়িক মিসর ও মেসোপটেমিয়া অপেক্ষা অধিকতর কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিল সে বিষয়েও উক্ত পণ্ডিতের মনে কোন সন্দেহ নাই। এই সকল শিল্পের চর্চ্চা মোহেন্-জো-দড়ো ও মেসোপটেমিয়ায় সময় সময় সমানভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। সিন্ধু-সভ্যতার সময়ে করণ্ডাকার বা ধাপী (corbelled) খিলান প্রচলিত ছিল। তল্-আস্মেরেও ইহার অস্তিত্ব ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। গোলাকার জলকূপ, রাস্তার বা গৃহের পয়ঃপ্রণালী এবং উপর তলা হইতে জল নিকাশেব মাটীর নল প্রভৃতিও সমানভাবে উভয় স্থানে বিদ্যমান ছিল।

গৃহের প্রাচীর-মধ্যস্থিত কুলুঙ্গীও (niche) উভয় স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। মেসোপটেমিয়াতে ইহা গৃহের বাহিরের দিকে এবং মোহেন্-জো-দড়োতে ভিতরের দিকে থাকিত। কিন্তু এই বৈপরীত্যপূর্ণ শিল্পের মূলসূত্র হয়ত এক স্থানেই ছিল বলিয়া ফ্রাঙ্কফোর্ট্ মনে করেন।

মাতৃকা-পূজার প্রচলন-সম্বন্ধে তিনি বলেন যে মেসোপটেমিয়াতেও সুপ্রাচীন কালে ঐরূপ পূজা প্রচলিত ছিল। সেখানে মহামাতৃকা-দেবীকে (Great Mother) আর একটি অঙ্গ-দেবতা অর্থাৎ তাঁহার পুত্র কিংবা প্রিয়তমের সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। মোহেন্-জো-দড়োর মাতৃকাপূজার পদ্ধতি পৃথক্ হইলেও অতি প্রাচীন কালে উভয়েই এক সাধারণ ধর্ম্ম হইতে উপজাত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

সিন্ধুতীরের ও সুমেরের শীলমোহরে অঙ্কিত কিম্ভূতকিমাকার প্রাণিচিত্র পরীক্ষা করিলেও উভয়ের সাদৃশ্য ও পার্থক্য-দ্বারা মনে হয় যে ইহাদের মূলসূত্র একই। কিন্তু স্থানীয় প্রভাবে বিভিন্ন রূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ওজন, মূর্ত্তি ও অন্যান্য নিদর্শনদ্বারাও তিনি সিন্ধু-উপত্যকা ও মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার মধ্যে যে এক সাধারণ ধর্ম্ম বিদ্যমান ছিল সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই সব গবেষণা-দ্বারা ইহা নিশ্চিতই প্রমাণিত হইয়াছে যে মেসোপটেমিয়া ও সিন্ধু-উপত্যকা এই উভয় স্থানেব সভ্যতার মূলে অতি প্রাচীন একটি উন্নত সভ্যতা ছিল, এবং তাহা হইতে এই উভয় স্থানে উপাদান আহৃত হইয়া দেশ, কাল ও পাত্রের গুণে নানারূপ সদৃশ ও বিসদৃশ আকার ধারণ করিয়াছে। উক্ত সভ্যতা, এই উভয় কিংবা আরও অনেক স্থানের শিক্ষা-দীক্ষায় যবনিকার অন্তরাল হইতে মালমসলা যোগাইয়াছে ; প্রাচ্য দেশের বহু কেন্দ্রেই ঐ সভ্যতার ধারা অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত প্রবাহিত হইতেছে ; স্থানে স্থানে ঐগুলিকে খণ্ড খণ্ড অবস্থায় দেখিয়া ইহাদের ঐক্য-সম্বন্ধে আপাতদৃষ্টিতে আমাদের সন্দেহ হইলেও ইহাদের মূলে যে একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা বর্ত্তমান রহিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ফ্রাঙ্কফোর্ট্ অনুমান করেন, মেসোপটেমিয়ার সর্ব্বপ্রাচীন অধি-বাসীরা ইরানীয় মালভূমি হইতে তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা লইয়া পশ্চিমে গিয়া টাইগ্রাস্-ইউফ্রেটিস্ নদীর তীরে বাস করিতে থাকে। স্যর্ অরেল্ ষ্টাইন্ পূর্ব্ব-বেলুচিস্তান পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে এই অনুমান কতকাংশে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। এই সকল পরীক্ষার উপর নির্ভর করিয়া ফ্রাঙ্কফোর্ট বলেন যে পারস্য দেশের মালভূমিতে রুক্ষ আবহাওয়ার সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তত্রত্য অধিবাসীদের এক শাখা পশ্চিম দিকে মেসোপটেমিযায ও অন্য শাখা পূর্ব্বাভিমুখে সিন্ধু-উপত্যকায় প্রবেশ করিয়া অপেক্ষাকৃত স্নিগ্ধ ও অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে বসতি স্থাপন করে। তিনি পারস্য দেশের সঙ্গে মেসোপটেমিযার একটা অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র দেখিতে পান। কিন্তু সিন্ধু-উপত্যকার ও পারস্যের মধ্যে কোন অব্যাহত ধারা আবিষ্কার করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তবে তাঁহার ধারণা পারস্যই এই প্রাচ্য সভ্যতা-সমূহের আদি জননী ছিল। কিন্তু হুইলার

মনে করেন[১] হিমালয় হইতে হিন্দুকুশের মধ্য দিয়া ইরান ও অ্যানাটোলিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত পর্ব্বতমালার দুই দিকে অর্থাৎ সিন্ধুতীরে ও টাইগ্রীস্-ইউফ্রেটিস্ তীরে যে সমজাতীয় সভ্যতাদ্বয় বিরাজমান আছে ঐগুলির উৎপত্তি বিষয়ে হয়ত ঐ পর্ব্বতমালার কোন যোগসূত্র থাকিতে পারে। খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম সহস্রকে ঐ অঞ্চলের কোন কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্নজাতীয় সভ্যতার উৎপত্তি হয় এবং চতুর্থ সহস্রকে উহাদের কোন কোন উদ্যমশীল সম্প্রদায় গোষ্ঠীবদ্ধভাবে দক্ষিণে এবং দক্ষিণপশ্চিমে নদীমাতৃক দেশের সন্ধান লাভ করিয়া দুইটি সমান্তরাল সভ্যতার সৃষ্টি করে। তাহারই ফলস্বরূপ আমরা মেসোপটেমিয়াতে এবং সিন্ধুতীরে দুই পরাক্রমশালী উন্নত ধরণের সভ্যতা দেখিতে পাই। উল্লিখিত মত যদিও কল্পনামূলক এবং চিত্তাকর্ষক তথাপি ইহা পরীক্ষার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। ভবিষ্যৎ গবেষণা ইহার সত্যতা নির্ণয় করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে পাঞ্জাব, সৌরাষ্ট্র, রাজপুতানা, বোম্বাই এবং উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানেও তাম্রপ্রস্তরযুগের সিন্ধু-সভ্যতার অনুরূপ সভ্যতার বহু চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে।[২]

সোরথ জেলার প্রভাস পাটন (সোমনাথ) নামক স্থানে কয়েকটি

১ Wheeler, Ind. Civil., p. 93.

২ প্রত্নতত্ত্ববিভাগের বর্ত্তমান ডিরেক্টর জেনারেল শ্রীঅমলানন্দ ঘোষ মহাশয়ের নেতৃত্বে সরস্বতী (বর্ত্তমান ঘগ্‌গর) ও দৃশদ্বতী নদীর উপত্যকায় অনুসন্ধানের ফলে মোহেন্‌জোদড়ো সভ্যতার অনুরূপ সভ্যতাসম্পন্ন অনেকগুলি স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে (Bulletin N. I S. I, I 37-42)। অতি সুপ্রাচীনকালে সরস্বতী নদীর মাহাত্ম্যের কথা বেদে বর্ণিত আছে। তখন ইহা সিন্ধুনদের প্রায় সমকক্ষ ছিল বলিয়া মনে হয়। ঐ সময়ে হয়ত সরস্বতী নদীর সমুদ্রের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল এবং সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া উপনিবেশকারীরা জলপথে সরস্বতী-উপত্যকায় প্রবেশ করিয়া স্বকীয় সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল।

স্তূপ খননের ফলে গুজরাটের লোথাল প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত হরপ্পা-সভ্যতার শেষ যুগের মৃৎপাত্র শ্রেণীর সমজাতীয় এবং ঐরূপ চিত্র-সম্বলিত অনেক মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে নৈবেদ্যা-ধার (dish-on-stand), গোল মালসা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মালসাগুলিতে খোপ খোপ করিয়া জ্যামিতিক ও নানারূপ প্রাকৃতিক নক্সা চিত্রিত আছে। তাহাতে তাম্রপ্রস্তর যুগের মধ্য ভারতীয় চিত্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এখানকার মৃৎপাত্রে হরপ্পা মোহেন্-জো-দড়োর মৃৎশিল্পের উপাদান ও আকৃতিগত এবং মধ্যভারতীয় চিত্রমূলক প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে উক্ত উভয় শিল্পের এক সংমিশ্রণ দেখা যায়। রাজপুতানার আহার (Ahar) নামক স্থানেব নিম্নস্তরে আবিষ্কৃত রঙ্গীন পাত্রের সঙ্গেও এখানকার সাদা কিংবা পীতাভ সাদা (Creamy slip) রংয়ের উপর পীতাভলাল বংযের (brown) চিত্রের কিছু কিছু সাদৃশ্য অনুভূত হইয়া থাকে।[১]

পূর্ব্ব খান্দেশ জেলার বহল (Bahal) নামক স্থানেও খননের পর তাম্রপ্রস্তর যুগেব বহু পুবাবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানকাব মৃৎপাত্রেও নানারূপ চিত্র দেখিলে হরপ্পা-সভ্যতার শেষ যুগের কথা স্মরণ হয়। উজ্জ্বল লাল পাত্রগুলির হবপ্পা-সভ্যতার উত্তর-সাধক রংপুরের মৃৎশিল্পের সঙ্গে তুলনা হইতে পাবে।[২]

বোম্বাই বাষ্ট্রের ব্রোচ (Broach) জেলার কিম নদীর তীবে অবস্থিত ভগৎরাব (Bhagatrav) নামক স্থানে খননেব ফলে মোহেন্-জো-দড়ো সভ্যতার প্রথম যুগের পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে।[৩] এখন পর্য্যন্ত যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয় ভগৎরাবই বোধ হয়

১ Indian Archaeology, 1956-57, A Review, page 16, P XVII-XVIII.

২ Ibid, p. 17, PL. XX-XXI.

৩ Ibid, 1957-58, page 15.

হরপ্পা-মোহেন্-জো-দড়ো সভ্যতার দক্ষিণতম কেন্দ্র। ইহা সম্ভবতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল এবং জলপথে সৌরাষ্ট্রের অন্যান্য সভ্যনগরীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিত। নর্ম্মদা নদীর সঙ্গমস্থলে ব্রোচের নিকটবর্ত্তী মেহ্গম্ (Mehgam)[১] নামক স্থানও যে হরপ্পা-সভ্যতার চিহ্ন বহন করিয়া আনিয়াছে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে মাটীর উপহারপাত্র (dish-on-stand), মালসা, থালা ইত্যাদি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মৃৎশিল্পে লালের উপরে কাল রংয়ের ফাঁকা গ্রন্থিচিত্র (loop), বরফি, এক কেন্দ্রীয় বৃত্তনিচয় (Concentric Circles) ইত্যাদির চিত্র দেখিতে পাওযা যায। মেহ্গমের অনতিদূরবর্ত্তী টেলোড্ (Telod) নামক স্থানেও মৃৎশিল্প ও অন্যান্য পুরাবস্তু মেহ্গমে প্রাপ্ত জিনিষের প্রায সমপর্য্যায়ের এবং সমসাময়িক বলিয়া মনে হয়। এই উভয় স্থানের পুরাবস্তু সৌরাষ্ট্র ও ঝালওয়ার জেলার রংপুরের শেষ পর্য্যায়ের জিনিষের সঙ্গে তুলনা কবা যাইতে পারে।

সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত গোহিলওয়াড্ (Gohilwad), হালার (Halar), ঝালওয়ার (Jhalwar), মধ্য সৌরাষ্ট্র (Madhya Saurastra) এবং সোরথ (Sorath) জেলায় মোহেন্-জো দড়ো-হরপ্পা সভ্যতার একত্রিশটি স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐগুলির মধ্যে রাজকোটের নিকটবর্ত্তী রোজদি (Rojdi) নামক স্থানে বড বড় পাথরের তৈরী নগর রক্ষার প্রাচীর দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। এখানে অধুনা আবিষ্কৃত মাটির এক ভগ্ন মালসায় সৈন্ধব লিপিব চারিটি অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়।

এখানকার সভ্যতা দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক ভাগে প্রভাস পাটনের মৃৎশিল্পের মঙ্গে যোগাযোগের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। অন্য ভাগে হরপ্পার মৃৎশিল্পের প্রভাব সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে পানপাত্র (beaker), চওড়া মুখের থালা,

১ Ibid, p. 15.

হাতলওয়ালা মালসা (bowl), ছিদ্রবিশিষ্ট অথবা সরু গলার ভাণ্ড, পাদপীঠযুক্ত থালা (dish-on-stand) ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ঐসকল পাত্র সাধারণতঃ লাল অথবা পীতাভ ধূসর (buff) উপাদানে নির্ম্মিত। লাল, পীতাভ-ধূসর অথবা পোড়া লাল (Chooo-late) রংয়ের আস্তরণের উপর মাছ, লতাপাতা, রেখাবিশিষ্ট ত্রিভুজ, বরফি, তরঙ্গায়িত রেখা, ধাবমান বৃষ প্রভৃতির কাল রংয়ের চিত্র দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে। রাজকোট হইতে প্রায় ৪৪ মাইল দক্ষিণে পীঠ-দিয়া (Pithadia) এবং বলভীপুরের সন্নিকটে মোতিধরই (Moti-dharaı) নামক স্থানেও সিন্ধু-সভ্যতার মৃৎশিল্পের প্রভাবযুক্ত মৃৎপাত্র ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১]

সৌরাষ্ট্রের বিভিন্ন জেলায় সিন্ধু-সভ্যতার পুরাবস্তু, বিশেষতঃ মৃৎ-শিল্পের নানা প্রকার প্রতীক, আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং হইতেছে। কেহ কেহ মনে করেন পাঞ্জাব-সিন্ধু প্রভৃতি দেশ হইতে সিন্ধু-সভ্যতার উন্নত অধিকারিগণ স্বীয় সংস্কৃতি বিস্তারের জন্য কিংবা আক্রমণকারী কোন জাতি-বিশেষের হাতে ধ্বংসের আশঙ্কা হইতে স্বকীয় শিক্ষাদীক্ষা অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে জলপথে যাত্রা করিয়া কচ্ছ উপদ্বীপ ও নর্ম্মদা, কিম্ ও তাপ্তী নদীর মোহনার কাছে কাছে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। তাহাদেরই শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্মৃতি বহন করিয়া গুজরাট্, সৌরাষ্ট্র, বোম্বাই ও মধ্যভারত[২] রাষ্ট্রের কতিপয় ধ্বংসস্তূপ উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহাদের কয়েকটিমাত্র প্রত্নরসিকের খনিত্রের আঘাতে আত্মপরিচয় দিয়াছে এবং এখনও অনেকে সেই কঠোর

১ Ibid, page 2).

২ Ind. Arch., 1957-58, p. 19. মধ্য ভারতের নিমার (Nimar) জেলার মহেশ্বর নামক স্থানেও তাম্র-প্রস্তরযুগের কতিপয় নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। (Indian Archaeology, 1953-54, A Review, p. 8 ; PL. VIII.)

আক্রমণের ভয়ে আত্মগোপন করিয়া আছে। কিন্তু অক্লান্তকর্ম্মী প্রত্নবিশারদের নিকট অদূর ভবিষ্যতেই আশা করি ইহাদের প্রাচীন কাহিনী ব্যক্ত করিতে হইবে।

সৌরাষ্ট্র

সিন্ধু-সভ্যতার স্মৃতিবহনকারী কয়েকটি স্থানেব নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল[১] ঃ—

১।	মোতিধরই —	জেলা গোহিলওয়াড
২।	ভয়খখরিয়া	,, হালার
৩।	চন্দ্রওয়ার	,, ,,
৪।	কালাবাড্	,, ,,
৫।	রণ্পদা	,, ,,
৬।	আদ্কোট	,, মধ্য সৌবাষ্ট্র
৭।	আদ্রোই	,, ,,
৮।	ধুদসিয়া	,, ,,
৯।	গধারিয়া	,, ,,
১০।	হালেন্দা	,, ,,
১১।	জাম্ আম্ববৃদি	,, ,,
১২।	জাম্ কাণ্ডোর্ণা	,, ,,
১৩।	ঝাঞ্জ্মিব	,, ,,
১৪।	যোধ্পুর	,, ,,
১৫।	খণ্ডধর	,, ,,
১৬।	খট্লি	,, ,,
১৭।	কুণ্ড্নি	,, ,,
১৮।	মকন্সর	,, ,,

১ Ind. Arch, 1957-58, p. 19.

১৯।	মণ্ডল	জেলা মধ্য সৌরাষ্ট্র
২০।	মোতি-খিলোরি	„ „
২১।	পরেওয়ালা	„ „
২২।	পীঠদিয়া	„ „
২৩।	রোজ্‌দি	„ „
২৪।	সানথলি	„ „
২৫।	সুলতানপুর	„ „
২৬।	বোরা-কোট্‌রা	„ „
২৭।	কাজ	„ সোরথ্‌
২৮।	খম্‌ভোদর	„ „
২৯।	নবগম্‌	„ „

লোথাল

গুজরাট প্রদেশের আহ্‌মদাবাদ জেলার অন্তর্গত লোথাল নামক স্থানে মোহেন্-জো-দড়ো সভ্যতার এক বিস্তীর্ণ নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। যে স্তূপ হইতে উক্ত সভ্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়, ইহার বর্ত্তমান আয়তন দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৯০০ ফুট, প্রস্থে প্রায় ১০০০ ফুট এবং উচ্চতায় প্রায় ২০ ফুট। এই স্থানে সিন্ধু-সভ্যতার একটি বিশিষ্ট নগর ছিল বলিয়া মনে হয়। এই নগরের পরিধি ইহার সমৃদ্ধির যুগে যে আরও অনেক বিস্তৃত ছিল, সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। কালের আবর্ত্তনে চতুর্দ্দিক্ ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় এখন যে ভগ্নস্তূপ পড়িয়া আছে ইহা শুধু তদানীন্তন সভ্যজগতের এক যৌবনদৃপ্ত কলেবরের সমাধি-ক্ষেত্র; একদিন যেখানে দেশবিদেশের সুসভ্য ও গণ্যমান্য জনমণ্ডলীর মিলনক্ষেত্র ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি ছিল প্রকৃতির অভিশাপে আজ তাহা শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানী। ১৯৫৪-৫৫ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত কয়েক বৎসর খননের ফলে হরপ্পা-মোহেন্-জো-দড়ো সভ্যতার অনেক প্রতীক এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে; এখানে পোড়া

ইটের পয়ঃপ্রণালী (drain) এবং কাঁচা ইটের ঘরবাড়ীর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইহার প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রংপুর নামক স্থানেও এই জাতীয় সভ্যতা বিদ্যমান ছিল। সেখানেও কাঁচা ইটের বাড়ীঘর এবং পোড়া ইটের নর্দ্দমা ছিল। লোথালে ১৬ ফুট প্রস্থ এবং ১০ ফুট উচ্চ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত এক দুর্গপ্রাচীরও আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্থানে স্থানে ভিত্তিনির্ম্মাণ ও শূন্যস্থান পূর্ণ করিবার জন্যও কাঁচা ইট ব্যবহৃত হইত। এইরূপ কাঁচা ইটের তৈরী বিভিন্ন যুগের গৃহের ভগ্নাবশেষ স্তরে স্তরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানে মোহেন-জো-দড়োর লিপিযুক্ত পাথরের শীলমোহর, তামা ও ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্র, শলাকা, বলয়, খেলনা ইত্যাদি, বিভিন্ন পরিমাপের পাথরের ওজন, পাশা খেলার ঘুঁটি, পোড়ামাটীর খেলনা ও পুতুল, চিত্রিত ও চিত্রহীন নানা প্রকার মৃৎপাত্র ইত্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। একস্থানে ১৬৬ ফুট লম্বা পোড়া ইটের এক নর্দ্দামায় পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে আটটি উপপয়ঃ-প্রণালী আসিয়া পড়িয়াছে। এইগুলি গৃহস্থিত আটটি স্নানাগারের অপরিষ্কৃত জল বড় নর্দ্দমাটিতে সরবরাহ করে। নগরের একস্থানে ১১ ফুট প্রস্থ এক রাজপথও আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার উভয় পার্শ্বে রহিয়াছে শ্রেণীবদ্ধভাবে নাগরিকদের আবাসগৃহ।[১] ইহাও যে মোহেন্-জো-দড়ো সভ্যতায় সমৃদ্ধ এক বিশাল নগরী ছিল তাহার প্রমাণ খননের ফলে ক্রমশঃ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এখানে আরও বিশেষ ভাবে খননের দ্বারা অদূর ভবিষ্যতেই তথাকথিত সিন্ধু-সভ্যতার বিস্তৃতি ও পরিণতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

রূপার

পাঞ্জাব প্রদেশের আম্বালা জেলার অন্তর্গত রূপার নামক স্থানেও (আম্বালা হইতে ৬০ মাইল উত্তরে) হরপ্পা-মোহেন্-জো-দড়ো

১ Ibid, 1957-58, pp. 12 13.

সভ্যতার অনেক চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে সিন্ধু-সভ্যতার আয়তন দিগন্তপ্রসারী চক্রবালের মত ক্রমশঃ সুবিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। এখানে আবিষ্কৃত বিশিষ্ট মৃৎপাত্র, মালা, ব্রোঞ্জের কুঠার, চকমকি পাথরের ছুরি, ফায়েন্স-নির্ম্মিত গহনাপত্র, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে দানের নিমিত্ত (?) পোড়ামাটির ত্রিভুজাকার পিষ্টক-(terrarcotta cakes) বিশেষ এবং নরম পাথরে ক্ষোদিত অক্ষরযুক্ত শীলমোহর প্রভৃতি পুরাবস্তু পশ্চিম বেলুচিস্তান হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বে শতদ্রু পর্য্যন্ত সিন্ধু-সভ্যতার আধিপত্যের বাণী ঘোষণা করে। রূপার অঞ্চলে হরপ্পা-সভ্যতা প্রায় পাঁচ শতাব্দী কাল স্থায়ী হইয়াছিল বলিয়া স্তরীকরণ প্রণালীতে প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহার পর কিভাবে উক্ত সভ্যতার বিলোপ-সাধন হয় ঠিক বুঝা যায় না। দীর্ঘকাল পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকিবার পর খ্রীঃ পূঃ দশম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে ঐস্থানে আবার মনুষ্য-বসতির চিহ্ন পাওয়া যায়। এই বারে এক বিজাতীয় কৃষ্টির লোক আসিয়া এই স্থান অধিকার করিয়া বসে। রঙ্গীন ধূসর বর্ণের মৃৎপাত্র ইহাদের বিশিষ্ট সভ্যতার পরিচয় দেয়। প্রায় তিন শতাব্দী ব্যাপিয়া এখানে ইহাদের আধিপত্য বিদ্যমান ছিল বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। ইহাদের বাসগৃহের অস্তিত্বের কোন চিহ্ন বর্ত্তমান নাই। এই বিজাতীয় কৃষ্টি-সম্পন্ন জাতি সম্বন্ধে আর বিশেষ কোন তথ্য এখন পর্য্যন্ত জানা যায় না। তবে ইহাদের সভ্যতা যে রাজপুতানায়, পাঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশের বহু অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।[১] এই জাতীয় লোকেরা যে রূপারের পূর্ব্ববর্ত্তী সভ্যতা ধ্বংস করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় সমাধি-স্থানে তাহাদের হস্তক্ষেপের চিহ্ন হইতে। বিভিন্ন প্রয়োজনে ইহারা প্রাচীনতর জাতির সমাধিস্থ কঙ্কাল স্থানচ্যুত করিয়া ফেলিয়াছিল।[২] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে

১ Indian Archaeology, 1953-54, A Review, p. 6.

২ Ibid, 1954-55, p. 9.

যে পূর্ব্ববর্ত্তীদের সমাধিস্থানের কোন কোনটি দৈর্ঘ্যে প্রায় আট ফুট, প্রস্থে তিন ফুট এবং গভীরতায় দুই ফুট ছিল। শবের মস্তক সাধারণতঃ উত্তর-পশ্চিম মুখে রাখা হইত এবং সঙ্গে মৃৎপাত্র দেওয়া হইত। সময় সময় এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রমও ঘটিত।

মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পার সুপ্রাচীন তাম্র-প্রস্তর যুগের বিশাল সভ্যতার আবিষ্কারের পর পশ্চিম ও উত্তর ভারতের এবং অধুনাগঠিত পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে ঐ যুগের সভ্যতাস্ফীত বহু নগর ও পল্লীর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এই লুপ্তোদ্ধার যজ্ঞের অন্যতম পুরোহিত ছিলেন স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়। তিনি ঐ জাতীয় বহু লুপ্ত নগরী ও পল্লীর অতীত রহস্য উদ্‌ঘাটিত করেন। বেলুচিস্তানের তাম্র-প্রস্তর যুগের কৃষ্টির কতক তথ্য প্রত্নতত্ত্ববিভাগের তদানীন্তন ডিরেক্টার জেনারেল হার্‌গ্রীভ্‌স্ ও স্যর্ অরেল ষ্টাইন্ জগতের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। প্রাগৈতিহাসিক পারস্যের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলেও এই ধরণের বিভিন্নজাতীয় সভ্যতা বিকাশলাভ করে। ঐ সকল স্থানে নিত্য ব্যবহারের মৃৎপাত্রে বিভিন্ন নির্ম্মাণপ্রণালীতে কৃষ্টিপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উত্তর পারস্যের মত উত্তর বেলুচিস্তানেও রক্তিমাভ (Red) এবং দক্ষিণ পারস্যের ন্যায় দক্ষিণ বেলুচিস্তানে স্বল্প পীতাভ বর্ণের (Buff) মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্র প্রচলিত ছিল। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন বেলুচিস্তানের কোয়েটা (Quetta), নাল (Nal) এবং কুল্লি (Kulli) এবং সিন্ধু প্রদেশের আম্‌রি (Amri) প্রভৃতি স্থান পীতাভ পাত্রের গণ্ডির মধ্যে। আবার উত্তর বেলুচিস্তানের ঝোব্ (Zhob) উপত্যকা রক্তিমাভ পাত্রের কৃষ্টির অন্তর্গত ছিল। আম্‌রি ও নালের কৃষ্টি সিন্ধু প্রদেশের আম্‌রি নামক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া কির্‌থার পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া বেলুচিস্তানের “নাল” পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বেলুচিস্তানের নুন্দরের (Nundara) কৃষ্টি আম্‌রি এবং নাল সভ্যতার সংযোগ স্থাপন দ্বারা উভয়ের মধ্যবর্ত্তী অবস্থার সূচনা করে। বেলুচিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাচীন বসতি-

জ্ঞাপক উঁচু ঢিপিকে "তল্" (Tell) বলা হয়। ঐগুলি উচ্চতায় ন্যূনকল্পে ১০ ফুট এবং ঊর্দ্ধে ৪০ ফুট পর্য্যন্ত। ইহাদের পাদ-মূলের পরিমাণের কোন স্থিরতা নাই। কোন কোন তল্ দৈর্ঘ্যে ৫৩০ গজ এবং প্রস্থে ৩৬০ গজ, আবার কোথাও বা তদপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র ও (১৫০ × ১১৫ গজ) দেখা যায়।

মোহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত মৃৎশিল্পের অনুরূপ পুরাবস্তু এই অঞ্চলের যে সকল স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে ইহাদের কতিপয় স্থানের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।[১]

(১) আহ্মদওয়ালা (Bahawalpur State)

(২) আলিমুরাদ

(৩) আল্লাহ্ দীনো (করাচীর নিকট)

(৪) আম্রি

(৫) চব্বুওয়ালা (বহ্ওয়ালপুর স্টেট্)

(৬) চক্ পূর্ব্বনে স্যাল

(৭) চান্হু দড়ো

(৮) চরঈওয়ালা (Charaiwala, Bahawalpur State)

(৯) দাবর্ কোট (বেলুচিস্তান)

(১০) দইওয়ালা (বহ্ওয়ালপুর)

(১১) দম্ব্ বুঠি

(১২) দেরাওয়ার (বহ্ওয়ালপুর)

(১৩) ধল

(১৪) দিজি-জি-টাক্কি

(১৫) গরক্ওয়ালী (২) (বহ্ওয়ালপুর)

(১৬) গাজীশাহ

১। সংক্ষিপ্ত বিবরণের জন্য Wheeler-এর Indus Civilisation (৯৫-৯৬ পৃষ্ঠা) ও শ্রীঅমলানন্দ ঘোষ লিখিত প্রবন্ধ (Bull. N. I. S. I, I. 37-42) দ্রষ্টব্য।

(১৭) গোরন্দি
(১৮) হরপ্পা
(১৯) জল্‌হর (বহ্‌ওয়ালপুর)
(২০) কর্‌চট
(২১) খানপুরী থার (বহওয়ালপুর)
(২২) কোতাসুর
(২৩) কোত্‌লা নিহঙ্গ খাঁ (রূপার)
(২৪) কুড্‌ওয়ালা (বহ্‌ওয়ালপুর)
(২৫) লোহ্‌রি
(২৬) লোহুম্‌-জো-দড়ো
(২৭) মেহী (বেলুচিস্তান)
(২৮) মিথা দেহেনো (সিন্ধু প্রদেশ)
(২৯) মোহেন্‌-জো-দড়ো
(৩০) নোক্‌জো-শাহ্‌-দীন্‌জৈ (বেলুচিস্তান)
(৩১) পাণ্ডীওয়াহী
(৩১) সন্ধনাওয়ালা
(৩৩) শাহ্‌জো কোতিরো
(৩৪) শিখ্‌রি (বহ ওয়ালপুর)
(৩৫) সুক্তাগেন্‌-দোর
(৩৬) থানো বুলি খাঁ
(৩৭) ট্রেকোআ থার (বহ্‌ওয়ালপুর)

(৩৮-৬১) ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল শ্রীঅমলানন্দ ঘোষের নেতৃত্বে সরস্বতী নদীর উপত্যকায় বিকানীর রাজ্যে এবং পাকিস্তান সীমান্তে সুপ্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত প্রায় ২৫টি এবং দৃশদ্বতী উপত্যকায় একটি স্থানের সন্ধান লাভ করা গিয়াছে।[১]

১ উপরের তালিকার মধ্যে (১) (৩) (৫) (৮) (১০) (১২) (১৫) (১৯) (২১)

কিছুদিন পূর্ব্বে পাকিস্তান আর্কিওলজিকেল ডিপার্টমেণ্টের জনৈক কর্ম্মচারী এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে পাকিস্তানের অন্তর্গত খয়েরপুর শহরের ১৫ মাইল দক্ষিণে কোট্ ডিজি (Kot Diji) নামক স্থানে প্রাক্-হরপ্পা যুগের সভ্যতার চিহ্ন ও উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লিখিত কোন বিবরণ এখনও প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তবে সিন্ধু-সভ্যতা এবং প্রাক্-সিন্ধু-সভ্যতার প্রমাণ ও উপাদান-সম্বলিত বহু তথ্য যে ভারত ও পাকিস্তানের নানা অংশে আবিষ্কৃত হইবে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। "কোট্ ডিজির" সম্পূর্ণ বিবরণ জানিবার জন্য আমরা আগ্রহান্বিত।

ভারতীয় তাম্র-প্রস্তর যুগে পাঞ্জাব-সিন্ধু-বেলুচিস্তান অঞ্চলে সাধারণতঃ যে সভ্যতা দৃষ্টিগোচর হয় ইহাকে দুই শাখায় বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শাখাকে নাগরিক সভ্যতা এবং অন্যটিকে জানপদ বা পল্লীসভ্যতা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত পর্য্যায়ে হরপ্পা মোহেন্-জো-দড়ো এবং সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত সম্প্রতি আবিষ্কৃত লোথাল এবং দ্বিতীয় শাখায় বেলুচিস্তানের কুল্লি (Kulli), মেহি (Mehi) প্রভৃতি স্থানের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। কুল্লির মৃৎপাত্রের রং পীতাভ ধূসর (buff); দক্ষিণ বেলুচিস্তানের অনেক পার্ব্বত্য অঞ্চলে এই রং-এর মৃৎপাত্র ব্যবহৃত হইত। কুল্লি-মেহির সভ্যতার স্বরূপ হরপ্পা মোহেন্-জো-দড়ো হইতে কতকটা স্বতন্ত্র ছিল। সিন্ধু-সভ্যতার মত এখানে পোড়া ইটের বাড়ী তৈয়ারি হইত না, কাঁচা ইট অথবা প্রলেপ (plaster) যুক্ত প্রস্তর দিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করা হইত। কিন্তু মৃৎপাত্র-রঞ্জনে হরপ্পার সঙ্গে কতক সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়।

(২৪) (২৮) (৩৪) (৩৭) (৩৮-৬২) সংখ্যক স্থানের বিশেষ বিবরণ অপ্রকাশিত। (২) (৭) (১১) (১৩) (১৬) (১৭) (২০) (২৫) (২৬) (৩১) (৩৩) (৩৬) সংখ্যক স্থানের পুরাতত্ত্ব ননীগোপাল মজুমদার কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত (Mem. Arch. Sur. India, No. 48)

যথা, লালের উপর কাল চিত্র এবং অশ্বত্থ পত্রের এবং পূত অগ্ন্যাধারের (sacred brazier) চিত্রাদি উভয় স্থানেই দেখা যায়। এইজন্য ইহাদের মধ্যে হয়ত কৃষ্টিগত আদান প্রদানের ভাব বিদ্যমান ছিল অথবা কুল্লি-মেহির সভ্যতা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। এই বিষয়ে নিশ্চিত ভাবে এখনও কিছু বলা খুব কঠিন। সিন্ধু-সভ্যতার সঙ্গে বৈসাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয় কুল্লি-মেহির জীবজন্তুর চিত্রে, বিশেষভাবে গোলাকার চক্ষু, লম্বা দেহ ও সারি সারি (vertical) উন্নত রেখা বিশিষ্ট বৃষগুলিতে। মেহিতে চতুষ্কোণ এবং বৃত্তাকার কয়েকটি পাথরের পাত্র পাওয়া গিয়াছে। ঐগুলিতে ত্রিভুজাকার চিত্র খোদিত আছে। এখানে ঐরূপ একটি অসম্পূর্ণ পাত্রও পাওয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া মনে হয় মেহি-ই ছিল ঐ শিল্পের কেন্দ্রস্থান। ঐরূপ পাত্র পারস্যের অন্তর্গত মক্রান (Makran), মেসোপটেমিয়া এবং সিরিয়ার পূর্ব্বাঞ্চলেও আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১] ইহাতে কেহ কেহ মনে করেন ঐসব দেশের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের আদান-প্রদান ছিল। বেলুচিস্তানের ঝোব (Zhob), টোগউ (Togau), কুয়েটা (Quata) নাল, কুল্লি-মেহি এবং সিন্ধু দেশের আম্‌রি প্রভৃতি স্থান সুপ্রাচীন পল্লী সংস্কৃতির প্রতীক বহন করিয়া আনিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটি বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্রভাবে নিজের সংস্কৃতির সৃষ্টি ও পরিপুষ্টি করিয়াছিল এবং কোন কোনটি আবার অধিত্যকা-ভূমির অথবা সমতল প্রদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া আত্মোন্নতি সাধন করিয়াছিল।

পিগোটের মতে[২] ধূসর রং-এর মৃৎশিল্পের পরিধির মধ্যে পড়ে কুয়েটা, আম্‌রি, নাল এবং কুল্লির সংস্কৃতি। আবার লাল পাত্রের গণ্ডীর মধ্যে উত্তর বেলুচিস্তানের ঝোব উপত্যকার সংস্কৃতি।

কুয়েটা প্রভৃতি স্থানে ছোট ছোট অনেক স্তূপ (Tell) আছে।

১ **Wheeler, p. 13-14**

২ **Piggott, p. 72.**

ঐগুলি পল্লী সংস্কৃতির (Village culture) নমুনা বলিয়া পিগোট মনে করেন।[১]

এই সব স্থানের ঘরগুলি কাঁচা ইট অথবা কাদা মাটি দিয়া তৈরি করা হইত। মহাকালের কবলে পড়িয়া ঐগুলির অস্তিত্ব লোপ হইয়া গিয়াছে।

এই সভ্যতার মৃৎপাত্র সাধারণতঃ পীতাভ (purplish brown) ধূসর বর্ণের (buff colour), তাহাতে কৃষ্ণাভ লাল রংয়ের চিত্র করা হইত। বেলুচিস্তানের তৎকালীন প্রচলিত লালের উপর কাল বর্ণ-বিন্যাসের ব্যতিক্রম এখানে পরিলক্ষিত হয়। মৃৎপাত্রের মধ্যে পান-পাত্র, থালা, গোল মালসা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। চিত্রের মধ্যে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ প্রভৃতি জ্যামিতিক নিদর্শনই বেশী, জীবজন্তু ও বৃক্ষাদির চিত্র এখানে বিরল। ধূসর রংএর পাত্রের গায়ে ঐরূপ কাল নক্সা ঝোব্ উপত্যকায় এবং সিস্টান (Sistan) প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়; কিন্তু পীতাভ ধূসরের উপর কাল রংয়ের চিত্র ঐ যুগের ভারতবর্ষে বড় একটা দেখা যায় না। পারস্যের সুসা (১) (Susa I), গিয়ান (৫) (Giyan V) এবং সিয়াল্ক্ (৩) (Sialk III) প্রভৃতি স্থানের মৃৎশিল্পের সঙ্গে কুয়েটার শিল্পের তুলনা হইতে পারে, এবং ইহাও ঐ সকল স্থানের সমসাময়িক বলিয়া পিগোট মনে করেন।[২] এই সকল সিদ্ধান্তের পরিপোষক যথেষ্ট উপাদান এখনও সংগৃহীত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। প্রাগ্-বৈদিকযুগে পারস্য ও ভারত সভ্যতার পরস্পর আদানপ্রদানের ইতিহাস ও এখনও সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কৃত হয় নাই। এইজন্য সিন্ধু-উপত্যকার বিভিন্ন স্থান তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করা আবশ্যক। স্থানে স্থানে পরীক্ষামূলক খাতও খনন করিতে হইবে। পারস্য দেশের প্রাচীন ভগ্নস্তূপগুলি খননের

১ Ibid, p. 73.

২ Piggott, p. 75.

দ্বারাও সিন্ধু-সভ্যতার উপর আলোক-পাত হইতে পারে। কিন্তু ইহা আমাদের শক্তির বাহিরে। তবে সিন্ধু-উপত্যকায় এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্তূপগুলি রীতিমত খনন করিলে প্রাগ্-মোহেন্-জো-দড়ো-যুগের অনেক তথ্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে। ইহা সিন্ধু-পারস্য-সভ্যতার মূল কেন্দ্র নির্ণয়ে সাহায্য করিতে পারে।

আমাদের মনে হয় গঙ্গা-যমুনার উপত্যকায়ও সিন্ধু-উপত্যকার মত যথারীতি পরীক্ষা ও পরীক্ষা-মূলক খাঁত-খননের দ্বারা যথেষ্ট উপাদান সংগৃহীত হইবে। বর্ত্তমান হিন্দু সভ্যতায় নানারূপ কৃষ্টি ও সভ্যতার একটা সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বিশ্লেষণ করিলে কতক বৈদিক ও কতক অবৈদিক উপাদান দৃষ্টিগোচর হয়। সিন্ধু-উপত্যকায় অবৈদিক সভ্যতার চিহ্ন যথেষ্ট পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতীয় হিন্দু সভ্যতায় ইহার প্রভাব নিতান্ত অল্প নহে।[১] গঙ্গা-যমুনার

১ এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে (১৯৩৬ সালে) লিখিত এই উক্তির সমর্থন ১৯৫০ সালে অধ্যাপক স্টুয়ার্ট পিগোট (Prof. Stuart Piggott) কর্ত্তৃক লিখিত Prehistoric India নামক পুস্তকের ২০৩ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত বিবরণেও পাওয়া যায়।

"The links between the Harappa religion and contemporary Hinduism are of course of immense interest, providing as they do some explanation of those many features that cannot be derived from the Aryan traditions brought into India after, or concurrently with, the fall of the Harappa civilization. The old faiths die hard : it is even possible that early historic Hindu Society owed more to Harappa than it did to the Sanskrit speaking invaders."—Prehistoric India, page 203.

Sir Mortimer Wheeler লিখিত Indus Civilization নামক পুস্তকের (১৯৫৩ সালে প্রকাশিত) ৯৫ পৃষ্ঠায়ও এই উক্তির সমর্থন দেখিতে পাওয়া যায়।

উপত্যকায়ও বৈদিক কিংবা অবৈদিক অথবা উভয় সভ্যতার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কোন কোন বৈশিষ্ট্যের মূলসূত্র এখনও সিন্ধু-সভ্যতায় কিংবা বৈদিক সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গঙ্গা-যমুনার তীরবর্ত্তী প্রাচীন স্থানসমূহের পরীক্ষা ও খননের দ্বারা এই লুপ্ত ইতিহাসের পুনরুদ্ধার করা যাইতে পারে। অধিকন্তু ইহা দ্বারা, ভারতীয় আর্য্যপূর্ব্ব সভ্যতা কি পরিমাণে আর্য্যদের আক্রমণের ফলে ও কি পরিমাণে প্রতিকূল আবহাওয়াবশতঃ বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছিল, এই প্রশ্নেরও সুমীমাংসা হওয়া সম্ভব[১]।

১ সম্প্রতি গঙ্গা-যমুনা-উপত্যকায় দিল্লী হইতে ২৮ মাইল উত্তর পূর্ব্বে ও মীরাট হইতে ১৭ মাইল পশ্চিমে আলম্‌গীরপুর নামক স্থানে খননের ফলে হরপ্পা-মোহেন্‌-জো-দড়ো সভ্যতার চিত্রিত ও চিত্রহীন মৃৎপাত্র এবং অন্যান্য উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। (Indian Archaeology 1958-59, A Review, pp. 50-55, Plates LXII—LXV.)

Danish Archaeological Expedition এর পক্ষ হইতে অধ্যাপক গ্লোব্‌ (Professor P. V. Glob) ও শ্রীজিওফ্রি বিবি (Mr. Geoffrey Bibby) ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যোপসাগরের মধ্যস্থিত বহ্‌রাইন্‌ (Bahrein) নামক ক্ষুদ্র মরুদ্বীপে খননের ফলে পাঁচ হাজার বৎসরের পুরাতন সিন্ধুসভ্যতার প্রায় সমসাময়িক এক সভ্যতার অনেক উপাদান অবিষ্কার করিয়াছেন। সিন্ধু ও সুমেরীয় সভ্যতার মধ্যস্থানে বিরাজিত এই দ্বীপের পাথরের শীলমোহর ও অন্য কোন কোন পুরাবস্তুতে সুপ্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শনের সাদৃশ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে বলিয়া কোন কোন বিশেষজ্ঞ মনে করেন (Illustrated London News—4. 1. 58, pp. 14-16 ; 11. 1. 58, pp. 54-55)। তাম্র প্রস্তর যুগের এই উভয় সভ্যতায়ই যুগধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান আছে সত্য ; কিন্তু পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানের ভাব নির্ণয় করিতে হইলে অধিকতর আবিষ্কার ও দৃঢ়তর প্রমাণের প্রয়োজন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সিন্ধু-সভ্যতা ও বর্ত্তমান ভারতীয় সভ্যতা

এতদিন মোটামুটি গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের পর হইতে আমরা ভারতীয় ইতিহাসের সূত্রপাত ধরিয়া আসিতেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে সুপ্রাচীনকালের বিশেষ কোন ঘটনা নির্দ্দিষ্ট ভাবে আমরা জানিতে পারি না। রাজতরঙ্গিণী প্রভৃতির যুধিষ্ঠিরাব্দ ও কল্যব্দ এবং তন্নির্দ্দিষ্ট ঘটনাবলির উপর সকলে নিঃসঙ্কোচে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। বেদ, ব্রাহ্মণ, সূত্র, উপনিষদ্ ও পুরাণ প্রভৃতি হইতে ইতিহাসের উপাদান ও ভারতীয় আর্য্যদের সংস্কৃতির মালমসলা সংগৃহীত হইতেছে বটে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট তারিখ তাহাতে পাওয়া যায় না। আলেক্‌জান্দারের আক্রমণের পূর্ব্বে আমাদের দেশে সন-তারিখ দিয়া ঘটনা সন্নিবেশিত করার নিয়ম ছিল বলিয়া জানা যায় না। মিশর প্রভৃতি দেশে বহু প্রাচীন কাল হইতে তারিখ সহযোগে ঘটনার উল্লেখ থাকিত। আমাদের প্রাচীন হরপ্পা মোহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত অসংখ্য শীলমোহরের মধ্যে সন-তারিখ থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু এই লিপির সন্তোষজনক পাঠোদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত জোর করিয়া কিছু বলা সম্ভব নয়। আমাদের এই অজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও মোহেন্-জো-দড়ো সভ্যতার পত্তন খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ কিংবা তৃতীয় সহস্রকে যে হইয়াছিল, এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন; কারণ সমসাময়িক মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে অনুরূপ পুরাবস্তু পাওয়া গিয়াছে এবং বিজ্ঞান-সম্মত স্তরীকরণ দ্বারাও এ সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে।

পুরাতন সভ্যতার সঙ্গে বর্ত্তমান সভ্যতার যোগাযোগের অনেক কাহিনী আমরা বেদ-পুরাণাদি হইতে জানিতে পাই, কিন্তু বেদ ও পুরাণ প্রভৃতি প্রধানতঃ ধর্ম্মগ্রন্থ ও শাস্ত্র হিসাবেই প্রণীত হইয়াছিল। রাষ্ট্র,

সমাজ কিংবা অন্যান্য সংস্কৃতি বিষয়ক বর্ণনা যদিও তাহাতে আছে সত্য, কিন্তু এই সবের উদ্দেশ্য গৌণ। কাজেই এই সব গ্রন্থে দৈনন্দিন চর্য্যাবিষয়ক উপাদানের ধারাবাহিক ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উল্লেখ না থাকিলেই এদেশবাসী উক্ত উক্ত বিষয়ে অজ্ঞ ছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত। ভারতীয়দের বাস্তব জীবনের এই দিক্‌টা ফাঁকা ছিল বলিয়া এতদিন অনেকের ধারণা ছিল। কিন্তু হরপ্পা, মোহেন্-জো-দড়ো, চান্‌হু দড়ো, রূপার ও লোথাল প্রভৃতি স্থানে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগীয় খননের ফলে আমাদের প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে অজ্ঞতার হিমাচল-সদৃশ প্রাচীর দূর হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

যে স্থানের অনন্যসাধারণ সভ্যতা, শিল্প-বাণিজ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষাদীক্ষার আলোকচ্ছটায় দেশ-বিদেশ উদ্ভাসিত হইত, সভ্যজগতের লোভনীয় সেই মোহেন্-জো-দড়ো কালের কঠোর প্রকোপে এতদিন অসংখ্য ধ্বংসস্তূপের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছিল। যাহার অতুল সমৃদ্ধি পৃথিবীর তদানীন্তন সুসভ্য জাতিদের মনে ঈর্ষার সঞ্চার করিত, সেই মোহেন্-জো-দড়ো এখন প্রকৃতির অভিশাপগ্রস্ত মরুভূমি-তুল্য। সেই বিশাল নগরীর কোলাহলপূর্ণ রাজপথে আজ আর শকটবাহী বৃষের গলার কিঙ্কিণীধ্বনি শোনা যায় না। রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ বিপণিশ্রেণী এখন আর চঞ্চল ক্রেতাদের কলরবে মুখরিত হয় না। পর্য্যায়ক্রমে জল তুলিবার প্রতীক্ষায় কূপের পার্শ্ববর্ত্তী মঞ্চে উপবিষ্ট দূরাগত পল্লীবধূকে স্বীয় সখীজনের সঙ্গে আজ আর পারিবারিক সুখ-দুঃখের গল্প করিতে দেখা যায় না। যোগীরা আর এখানে নাসাগ্রবদ্ধ দৃষ্টিতে ধ্যানে রত থাকেন না। রাজপুরুষ, শ্রেষ্ঠী ও নাগরিকদের শত শত শীলমোহর প্রস্তুতের জন্য যে সব শিল্পাগার অহরহ ব্যস্ত থাকিত—ঐগুলি এখন ভগ্নস্তূপে পর্য্যবসিত হইয়া আছে। পশুপতি শিব ও মাতৃকা দেবী আজ আর এখানে ভক্তদের নিকট বিবিধ উপচারে পূজা পাইয়া থাকেন না। বিলাসীদের আসরে সুসজ্জিত নর্ত্তকীদের নৃত্যগীতির সুমধুর ধ্বনি বহু শতাব্দী যাবৎ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখানে

আর দেশ-বিদেশ হইতে আগত ককেসীয় ও মঙ্গোলীয় প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির লোকের সমাগম হয় না। একদা যাহার জ্ঞান-বিজ্ঞানের গরিমা জগতে বিস্ময় উৎপাদন করিত, সেই মোহেন্-জো-দড়ো এখন নীরব, নিস্তব্ধ, জনহীন, অরণ্যে আচ্ছাদিত। বনচারী জীবজন্তুর আবাস-ভূমিতে পরিণত এই লুপ্ত নগরী স্বীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার গৌরব সঞ্জীবিত রাখিবার ভার কোন্ উপযুক্ত বংশধরের হস্তে ন্যস্ত করিয়া গিয়াছিল এবং তাহার অক্ষত ধারা কোন্ কোন্ শাখা-প্রশাখায় প্রবাহিত হইত সেই ইতিহাস এখনও আমরা জানি না। তবে এই বিধ্বস্ত নগরীর অসাধারণ সভ্যতার অপ্রতিহত স্রোত এখনও ভারতীয় নাগরিক ও পল্লী-জীবনে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত যে প্রবাহিত হইতেছে, এই প্রমাণ নানাস্থানে প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্নভাবে অনুভূত হয়। কতিপয় বৎসর যাবৎ হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োতে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের খননের ফলে সুপ্রাচীন ভারতের লুপ্ত ইতিহাসের অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

প্রাচীন মিশর, পারস্য ও মেসোপটেমিয়ার সভ্যজাতির সংস্কৃতি কিংবা সভ্যতার ধারা ঐসব দেশে এখন আর অক্ষত দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতার বিশেষত্ব এই যে, প্রাগৈতিহাসিক মোহেন্-জো-দড়োবাসীদের রক্তস্রোত এখনও ভারতের কোনও না কোনও জাতির শিরায় শিরায় বহিতেছে, আর সিন্ধু-সভ্যতার মুক্ত প্রবাহ পূতসলিলা মন্দাকিনীর পুণ্যধারার ন্যায় অবিরত ভাবে এখনও ভারতের জনপদ, নগর ও পল্লীগ্রামে বহিয়া চলিয়াছে। মোহেন্-জো-দড়োতে উপাসিত পশুপতি শিব ও তাঁহার প্রতীক লিঙ্গ, শক্তিময়ী মাতৃকা এবং তাঁহার প্রতীক প্রস্তর বলয় (গৌরীপট্ট) এখনও হিন্দুর প্রতিদিনের উপাস্য দেবতা। হয়ত মোহেন-জো-দড়োর চিত্রাক্ষরেরই বংশধরের সাহায্যে আজও ভারতে অসংখ্য নরনারীর জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বলিত হইতেছে।

সিন্ধু-সভ্যতার শিলাফলক ও তাম্রফলকের অবিরল ধারাই বোধ

হয় অশোক, খারবেল, ভাস্করবর্মা, শশাঙ্ক প্রভৃতির মধ্য দিয়া আজও ভারতের রাষ্ট্র, নীতি এবং ধর্ম্মজীবনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত রহিয়াছে। এই সিন্ধু-সভ্যতার শীলমোহরের মূল ধারাই কি শকুন্তলা মুদ্রারাক্ষসের লেখাঙ্কিত অঙ্গুরীয় উপাখ্যানের উপাদান জোগাইয়াছিল? এই সব শীলমোহরে অঙ্কিত চিত্রগুলিই কি ভারতীয় লাঞ্ছনময় (punch-marked) মুদ্রাচিত্র এবং পরবর্ত্তী যুগের তাম্রফলকগুলির শীলমোহরাঙ্কিত বৃষ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মৃগ, চক্র ও স্বস্তিক চিত্রের স্রষ্টা নয়? প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রাসমূহে নানারূপ দেবদেবী, রাজমূর্ত্তি, প্রাণিচিত্র এবং অন্যান্য সাঙ্কেতিক চিত্রগুলির সৃষ্টি মোহেন্-জো-দড়োর ক্রমবিকাশের ফল বলিয়া মনে হয়।

আধুনিক দৈনন্দিন জীবনেও মোহেন্-জো-দড়োর অনুকরণে সূতা-কাটার টেকো, মাটীর পেয়ালা, ডাবর, কলস, গামলা, জালা, ঘট, ভাঁড়, গেলাস ও মটকী চলিতেছে। এখনও বঙ্গ-ললনারা সিন্ধু-উপত্যকায় প্রাপ্ত মৃন্ময় ধুনচি ও দীপের মত দ্রব্যে সন্ধ্যার ধূপদীপ জ্বালাইয়া থাকেন। এখনও হিন্দু গৃহিণীরা আলিপনায় কিংবা মাঘব্রত বা সূর্য্য পূজায় প্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতার অনুরূপ অশেষ চিত্র আঁকিয়া থাকেন। শুভবিবাহের সরা ও ঘটে কিংবা বরকন্যার কাষ্ঠাসনে ময়ূর, মৎস্য, বৃক্ষ, লতা ও অন্যান্য জ্যামিতিক চিত্র এখনও অঙ্কিত হয়। মোহেন্-জো-দড়োর চিত্রকলার অপ্রতিহত প্রবাহই হয়ত অজন্তা-ইলোরার মধ্য দিয়া আজও বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষকে প্রাচ্য ললিতকলার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিতেছে।

স্থাপত্য এবং পূর্ত্ত কর্ম্মেও মোহেন্-জো-দড়োর প্রভাব আধুনিক ভারতবর্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার বড় বড় প্রাসাদ ও তোরণে এবং অন্যান্য সমৃদ্ধিশালী নগরের সুবৃহৎ অট্টালিকা-সমূহের প্রাচীর ও গবাক্ষে সিন্ধু-সভ্যতার পরস্পরচ্ছেদী বৃত্ত ও স্বস্তিক-চিহ্নাদি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ভারুতশিলাপ্রাকারে ক্ষোদিত নর্ত্তকী-মূর্ত্তির

বাজুবন্ধ ও আধুনিক মেয়েদের দুল ও চুলের কাঁটা প্রভৃতিতে সিন্ধু-সভ্যতার স্বস্তিক-চিহ্নের প্রসার দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্রীড়াকৌতুকের দিক দিয়া দেখিতে গেলে এখনও মোহেন-জো-দড়ো হইতে পরম্পরাগত মাটীর বানর, খরগোশ, কাঠবিড়াল, মা ও ছেলে, পাখী, পাখীর খাঁচা, গাড়ি, মার্ব্বেল ও ঝুম্‌ঝুমি প্রভৃতি ভারতীয় শিশুদের চিত্তবিনোদন করিয়া থাকে। এখনও সিন্ধু-উপত্যকার অক্ষনিচয়ের মৃতসঞ্জীবনী শক্তি ভারতবর্ষের নগর ও পল্লীকে মুখরিত করিয়া তুলে।[১] আজও মৎস্য শিকারের জন্য বঁড়শি এবং মৃগয়ার জন্য বর্শা ব্যবহৃত হয়। এখনও পশ্চিম ও উত্তর ভারতে পল্লীবধূরা যবপেষণের জন্য মোহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত শিল-নোড়ার অনুরূপ দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকে।

সিন্ধু-উপত্যকার প্রস্তর-নির্ম্মিত ওজনের প্রভাব এখনও বঙ্গদেশের নগরে ও গ্রামে বর্ত্তমান আছে। গ্রাম্য দোকানীরা লৌহনির্ম্মিত ওজনকে আজও পাথর (বা পাষাণ) বলিয়া থাকে।

এখনও শ্রীহট্টে ও শান্তিনিকেতনে তৈরী বেতের মোড়ায় এবং চানাচুর প্রভৃতির ফেরীওয়ালার পাত্রের পাদপীঠে সিন্ধু-সভ্যতায় ব্যবহৃত ডমরু-চিহ্নের অনুকরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রসাধন ও ললিতকলা প্রভৃতি বিষয়েও তাম্র-প্রস্তর যুগের সঙ্গে আধুনিক ভারতের যেন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ চলিয়া আসিয়াছে। আজও ভারতীয় সুলোচনাদের নয়নাঞ্জনের জন্য ফায়েন্স (Fiance) পাত্রের পরিবর্ত্তে সম-আকৃতি-বিশিষ্ট কাংস্যপাত্র, কেশবিন্যাসের জন্য গজদন্ত বা অস্থিনির্ম্মিত চিরুণী, মুখশোভা নিরীক্ষণের জন্য প্রাচীন তাম্র বা ব্রোঞ্জের দর্পণের অনুরূপ কাচ-নির্ম্মিত দর্পণ ব্যবহৃত হয়। পুরাতন প্রথা অনুসারে বঙ্গদেশে বিবাহের সময় বর-কন্যার হাতে ব্রোঞ্জ বা

১ বাংলাদেশে বিবাহের সময় বরকন্যার মধ্যে পাশা খেলার প্রথা দেখা যায়। বেদেও পাশা খেলার উল্লেখ আছে।

কাংস্য-নির্ম্মিত দর্পণ এখনও প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইহার মূলসূত্রও বোধ হয় মোহেন্-জো-দড়োতেই।

ভারতীয় নৃত্যকলার মধ্যেও সিন্ধু-উপত্যকার নর্ত্তকীমূর্ত্তির হাব-ভাবের জীবন্ত প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই নর্ত্তকীমূর্ত্তির অঙ্গের সাজ, হস্তের ভঙ্গী, কেশের বিন্যাস—সমস্তই যুগে যুগে ভারতীয় আদর্শের মধ্যে সজীব ভাবে বিরাজ করিতেছে। প্রাচীন ভারতের নৃত্যকলার এই আদ্যা শক্তি ভারুতের শিলাদ্বারে ক্ষোদিত নর্ত্তকীমূর্ত্তি ও দক্ষিণ ভারতের নটরাজ মূর্ত্তির মধ্য দিয়া আজও ভারতীয় নৃত্য-কলায় তাহার প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

শব্দ-সূচী

———

প্রাগৈতিহাসিক মোহেন্-জো-দড়ো

মোহেন্-জো-দড়ো ও সিন্ধু সভ্যতার অন্যান্য কেন্দ্র

২
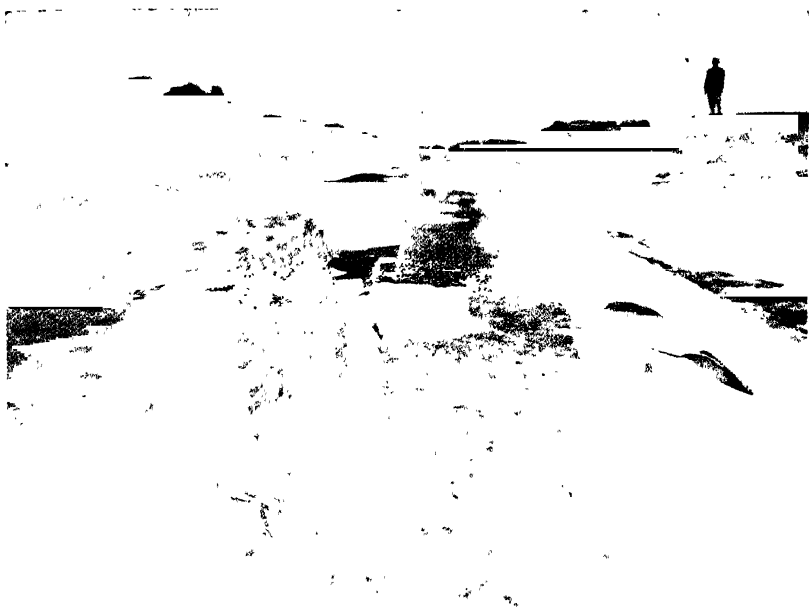
রাজপথ ও উভয় পার্শ্বস্থ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ
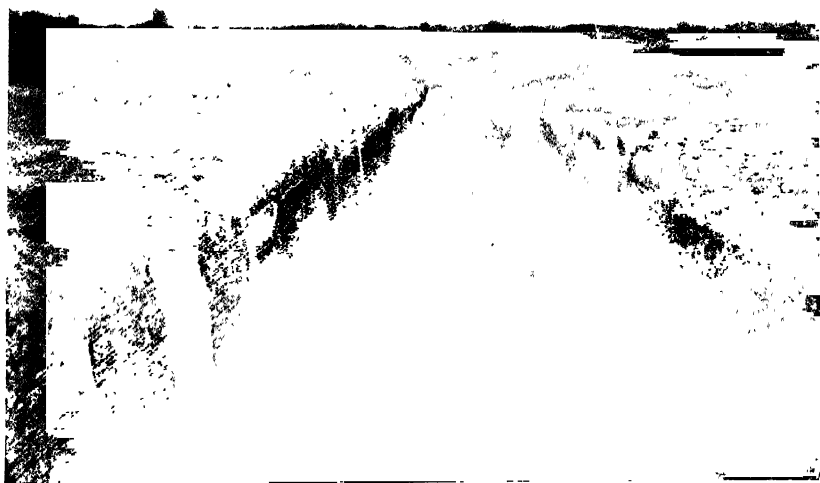
মধ্যযুগের দ্বিতীয় স্তরের (Intermediate II Period ; পথ ও পয়ঃ-প্রণালী।
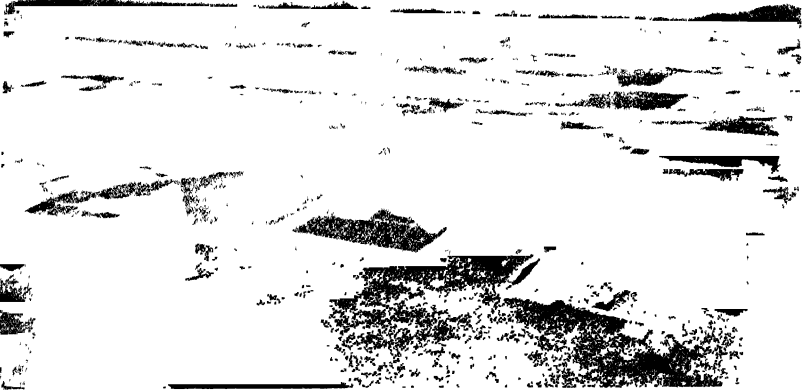
শৌচাগার ও ভগ্ন গৃহাদি

গৃহ ও তৎসমীপস্থ কূপ ও পয়ঃ-প্রণালী
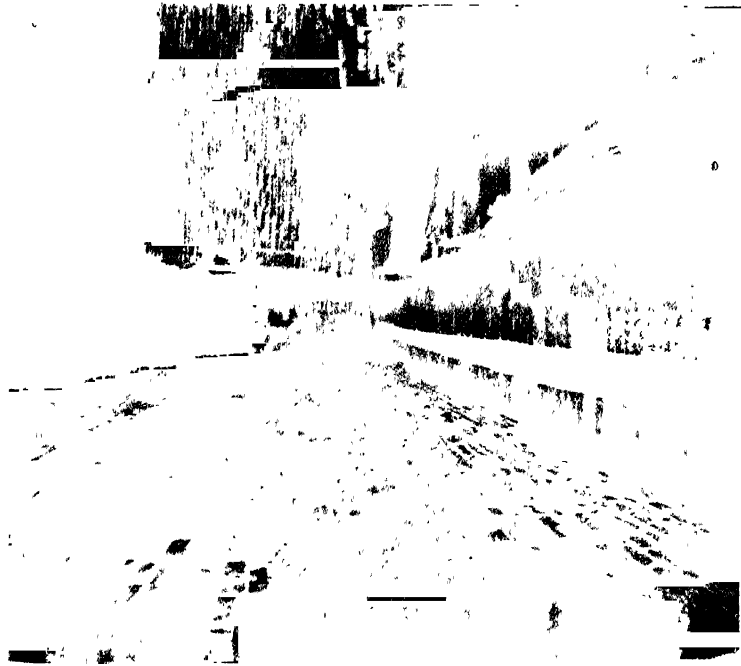
মধ্য যুগের (Intermediate Period) স্থনির্ম্মিত পয়ঃ-প্রণালী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গলি।
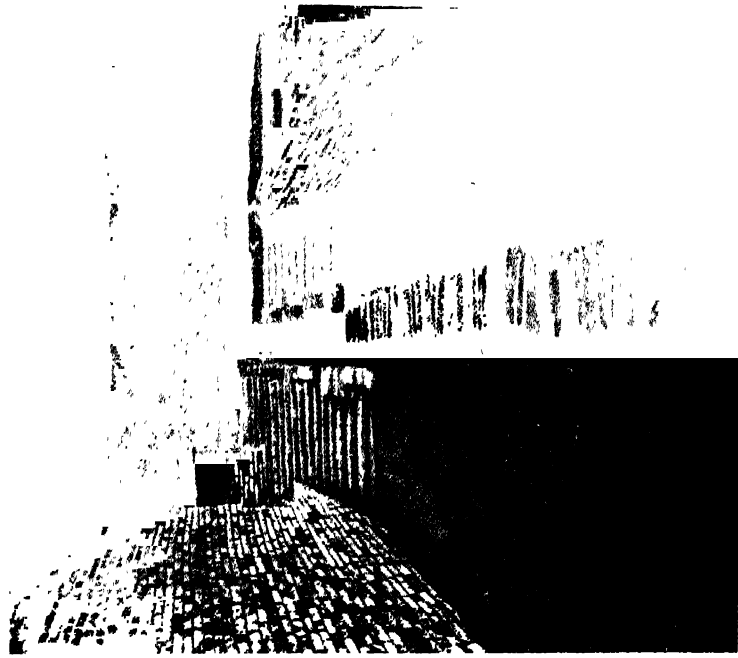
পয়ঃ-প্রণালী ও উভয় পার্শ্বে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ইষ্টকনির্ম্মিত সিঁড়ি।

ইষ্টকনির্ম্মিত স্নান-বাপী

মোহেন্-জো-দড়োর বিশাল শস্যাগার

By Courtesy of Sir Mortimer Wheeler

মোহেন জো-দড়ো দুর্গের দক্ষিণ পূর্বস্থিত উচ্চ মঞ্চাবলী

হরপ্পা দুর্গের পশ্চিমদিকের সদর দরজা : পরবর্ত্তীকালে অবরুদ্ধ

By Courtesy of Sir Mortimer Wheeler

লোথালে আবিষ্কৃত পয়ঃপ্রণালী

হরপ্পার কাঁচা ইটের দুর্গপ্রাচীর

By Courtesy of Sir Mortimer Wheeler

হরপ্পা ঃ কাষ্ঠ-শবাধারে স্থিত নরকঙ্কাল

হরপ্পা ঃ কাষ্ঠের উদ্‌খল স্থাপনের জন্য নির্মিত গর্তবিশিষ্ট ইষ্টকমঞ্চ

By Courtesy of Sir Mortimer Wheeler
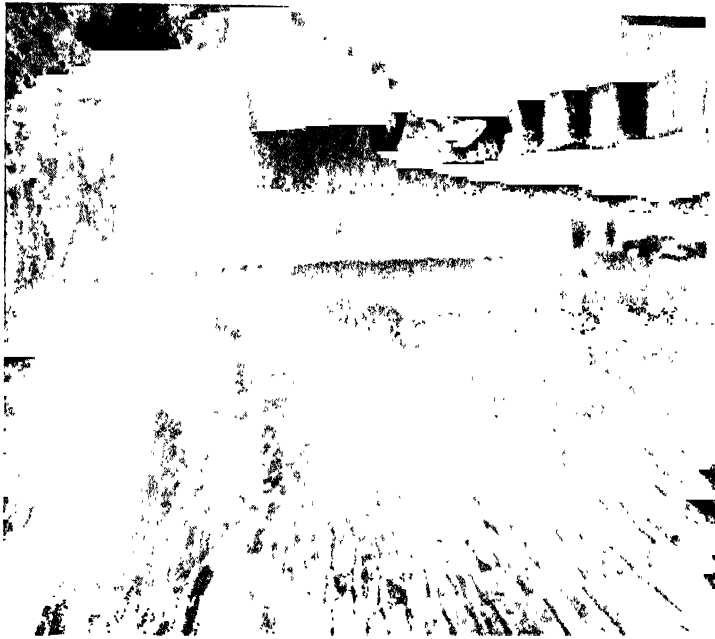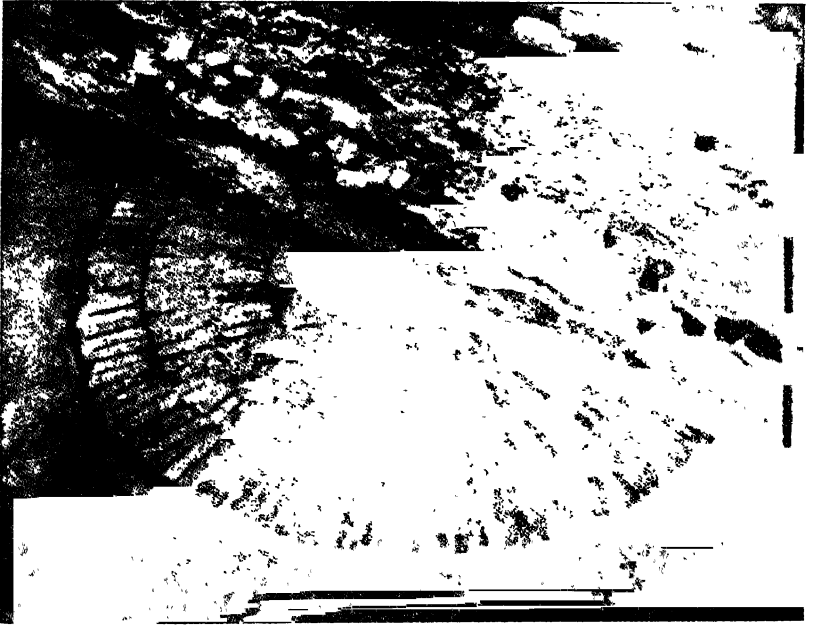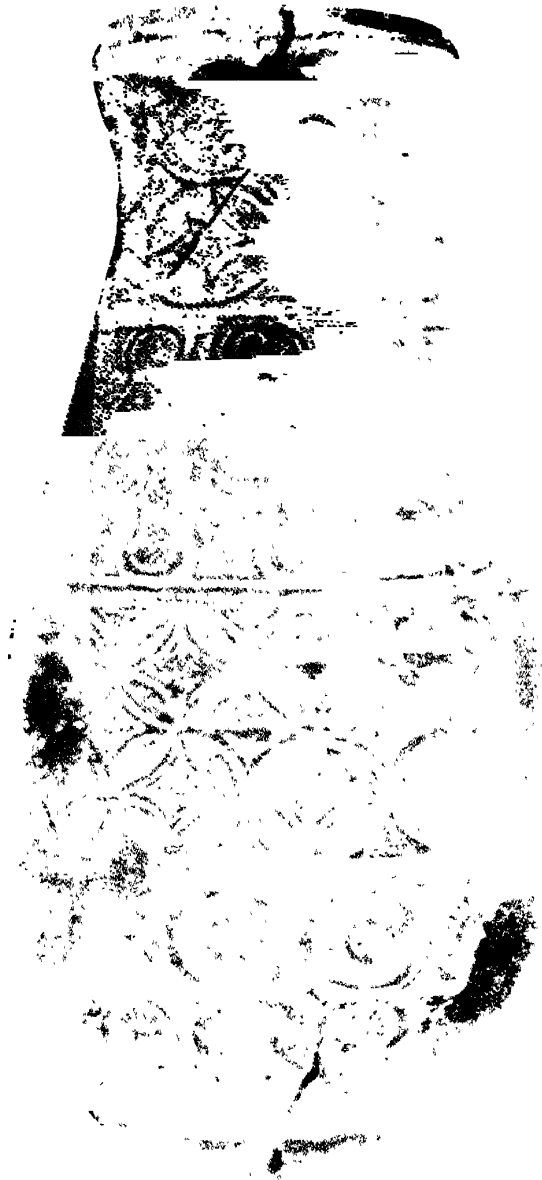
চিত্রিত মৃৎ পাত্র
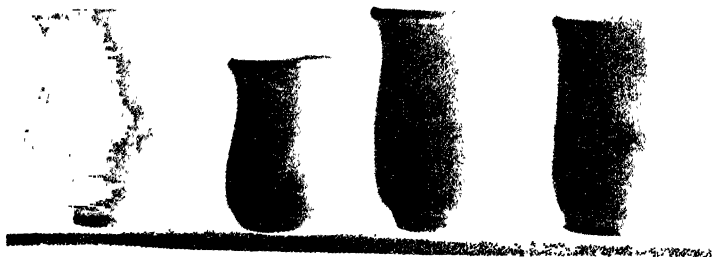
বিবিধ দ্রব্য

বিভিন্নপ্রকারের শীলমোহর

তাম্র ও ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত বিবিধ দ্রব্য

উপরে—বাম হইতে ক্ষুর, মহিষ, দ্বিমুখ কুঠার। নিম্নে—বাম হইতে কুঠার, বর্শার ফলা, বেধনী, দর্পণ।

প্রস্তর ও ধাতুনির্ম্মিত বিবিধ আভরণ

উপরে—(বাম হইতে) ব্রোঞ্জনির্ম্মিত নর্ত্তকীমূর্ত্তি, মস্তকহীন প্রস্তরমূর্ত্তি
নিম্নে— (বাম হইতে) পোড়া মাটার স্ত্রী-মূর্ত্তি, নাসাগ্রবদ্ধদৃষ্টি প্রস্তরমূর্ত্তি

ব্রাহ্মী	মোহেন্-জো-দড়ো	ইষ্টার আয়্‌ল্যাণ্ড	প্রাচীন এলাম	মিশর	সুমের	ক্রীত	চীন

মোহেন্-জো-দড়ো ও বিভিন্ন স্থানের আকৃতিগত সাদৃশ্যপূর্ণ কতিপয়
প্রাচীন অক্ষর